চাঁদের হাট

(একাঙ্ক নাটকের সংকলন)

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

প্রদীপিকা : পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
কলিকাতা

CHANDER HAAT
—A Collection of One-Act Plays
by Somendra Chandra Nandy
Price Rs. 5·00 (Rupees Five Only)

প্রকাশক
এন্ মুখার্জী
প্রদীপিকা
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৬৭
মূল্য : ৫·০০ (পাঁচ টাকা) মাত্র

প্রচ্ছদপট : তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর
শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায়
প্রিণ্টস্মিথ
১১৬ বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

বঙ্গীয় নাট্যসংসদকে এই নাট্যসঞ্চয়ন উৎসর্গ করলাম।

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অন্যান্য নাটক :—

ছায়াবিহীন (পূর্ণাঙ্গ)

সকাল সন্ধ্যার নাটক (একাঙ্কিকা সংকলন)

সমান্তরাল (পূর্ণাঙ্গ)

ছারপোকা (ঐ) (যন্ত্রস্থ)

চাঁদের হাট আমার দ্বিতীয় একাঙ্কিকা সংগ্রহ। সবশুদ্ধ দশটি নানা পর্যায়ের নাটক এই সংস্করণে আছে। সাধারণতঃ আমি নাটকের রূপ নিয়ে অনুশীলন করেছি এবং একাঙ্কিকার রূপারোপে যে নানা বিভিন্নতার সুযোগ আছে, তারই সদ্ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছি।

বিদেশী ভাষায় নাটক পরিচিতির নানা শব্দ আছে যেমন play, drama, comedy, farce, satire, burlesque, ইত্যাদি। আমরা নাটক ও নাটিকা এই দুটি শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে প্রতি নাটকে প্রবেশ করার বিশেষ চাবিটি খুঁজে পাওয়া যায় না এবং satire বা farce নাটক, পাঠক ও প্রয়োগকর্তা ভেদে কেবল বিপদগ্রস্ত এবং বিপর্যস্ত হয় বললে সব বলা হয় না, নাটকগুলির প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়। বলা বাহুল্য, এই রকম ঘটার কারণ যাঁরা নাটক পাঠ করেন এবং প্রয়োগ করেন তাঁরা নাটকের বক্তব্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ না করার জন্য নাটকের প্রতি যথাদায়িত্ব পালন করতে পারেন না। নাটক প্রয়োগ যাঁরা করবেন তাঁদের এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হতে হবে। নাটক বহুল পরিমাণে তার প্রয়োগ কৌশলের ওপর নির্ভর করে। জনৈক খ্যাতনামা অভিনেতাকে বলতে শুনেছি—অভিনয় ভাল হলে বাজে নাটক উৎরে যায় আর অভিনয় খারাপ হলে ভাল নাটক ডুবে গেল কত দেখলাম। নাটকের এবং নাট্যকারের প্রতি সুবিচার করতে হলে নাটকের সুষ্ঠু ও যুক্তিসঙ্গত প্রয়োগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য, নাটকের প্রধান দায়িত্ব নাট্যকারের, কিন্তু অভিনেতা ও প্রয়োগকর্তার দায়িত্ব কম নয়। বরঞ্চ বলা হয়েছে নাটক প্রস্তুতির দায়িত্ব সমানভাবে নাট্যকার এবং প্রয়োগকর্তা ও অভিনেতাদের মধ্যে বিভাজ্য। নাটকের সফলতা বিচারের সময় অবশ্য দর্শকের দায়িত্বও এক-তৃতীয়াংশ বলে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যেক অভিনেতার

যদি সম্পূর্ণ নাট্যবস্তু ভাল জানা থাকে তাহলে তাদের চরিত্রায়ণ আরও সংবেদনশীল হয়ে নাটকের সফলতায় সাহায্য করবে।

নাট্যকার তাঁর নাটকে জীবনের অনুভূতিতে কেবল একটি আত্মাকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু সেই অবস্থায় তার জড়ত্ব যায় না। অভিনয়ের ভেতর দিয়ে যখন রক্তমাংসে পরিপূর্ণ রূপ নেয় সেই আত্মা, তখনই আসে সৃষ্টির সার্থকতা। তাই নাট্যকারকে চিরকাল জীবনশিল্পী হতেই হবে। ধর্মান্ধতা বা রাজনৈতিক মদালসায় যে নাটক লেখা হয়েছে তা চিরদিন ক্ষণের সেবা করেই নিঃশেষ হযে গেছে। নাট্যকারকে তাই গোষ্ঠীধর্মী না হয়ে মনুষ্যধর্মী হতে হবে! সেজন্য নাট্যকারের হওয়া দরকার একাধারে কবি ও শিল্পী, তাঁর প্রকাশ হবে বিভিন্নের কাছে—একাধারে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং বহুদ্বারা গ্রহণীয়। সাধারণ বুদ্ধির মানের সঙ্গে নাট্যকারের জ্ঞানের সামঞ্জস্য তাই অত্যন্ত প্রযোজন। নাট্যকার যদি নিজের ওপর আস্থাবান হন তাহলে দর্শকমানসকে টেনে তুলতে চেষ্টা করবেন, যাঁরা তা নন তাঁরা সাধারণ চিন্তাধারায় নিজেদের নামাতে বাধ্য হবেন। কোন শিল্পই একা দাঁড়াতে পারে না। শিল্পবোধের জন্য সর্বদা চাই আরেকজন। 'একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে, গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে।' Coleridge একই কথা ভিন্নভাবে বলেছেন, 'Stage presentations produce a sort of temporary half-faith, which the spectator encourages in himself, and supports by voluntary contributions on his own part'.

একাঙ্কিকা নাটকের প্রচলন আমাদের দেশে কিছুদিন যাবৎ সুরু হয়েছে। বলা চলতে পারে যে ভারতীয় একাঙ্ক বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে জোর হতে আরম্ভ করে। একাঙ্কিকার অভিনয় অপেশাদার গোষ্ঠীতেই সীমাবদ্ধ। ইংরাজী একাঙ্কিকার

ইতিহাসেও দেখি যে আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিন সহরের বিখ্যাত রিপারেটরী এ্যাবী থিয়েটার দল ১৯০৪-এ প্রথম একাঙ্কিকার অভিনয় করেন এবং আজও পেশাদারদের তুলনায় রিপারেটরী দলগুলি অনেক বেশী একাঙ্কিকা অভিনয় করেন। বলা বাহুল্য, বড় নাটকের মতো একাঙ্কিকাকে কেন্দ্র করে নানা রস ও আঙ্গিক প্রকাশের সুযোগ আছে। নানা রূপের পরীক্ষা করা চলে, নানা গতি ও প্রকৃতির গবেষণা চলে। বিপদও কম নাই। কোন বড় নাটক সুরুতে খারাপ হলে পরে শেষরক্ষা করার সুযোগ পাওয়া যায়। একাঙ্কিকা প্রথম থেকেই মুক্তধারা না হলে অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তবে একথা বলা অন্যায় হবে না যে, অত্যন্ত ভালভাবে প্রযোজিত একাঙ্কিকা যেভাবে দর্শকের মনে গেঁথে যেতে পারে, বড় নাটক কখনও তা পারে না। ভাল বড় নাটক মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রাখতে পারে, কিন্তু মনের মণিকোঠায় মাণিকের মত থাকতে পারে কেবল একাঙ্কিকাই।

এই সংকলনের নাটকগুলির কালানুক্রমিক পরিচয়।

১। একটি সভা॥ রচনা ১৪ই আষাঢ়, ১৩৬৩। এ নাটকটি Odets-এর Waiting for Lefty অবলম্বনে রচিত হয়েছে। চরিত্রগুলি সম্পূর্ণভাবে বদল করা হয়েছে। বিশেষ প্রযোগ পদ্ধতিতে অভিনীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। বার্ণাড শ'র দুটি চরিত্র॥ রচনা ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩। সম্পূর্ণ বার্ণাড শ' অনুসরণে এই সাংকেতিক আলোচনাধর্মী নাটকটি রচিত হয়েছে। ছায়াদৃশ্য পরিকল্পনা করা হয়েছে নাটকের গতিকে অব্যাহত রাখবার জন্য। শ্রুতি নাটক হিসেবেও এটির অভিনয় চলতে পারে।

৩। চাঁদের হাট॥ রচনা ২১শে বৈশাখ, ১৩৬৪। একটি satire। আধুনিকতা কি, না জেনে যাঁরা আধুনিক হতে চেষ্টা করেন তাঁদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে। একালের শিল্প বা নাটক দেখতে অনেক সময় বিসদৃশ হলেও তার মধ্যে বস্তু থাকে। আমরা যেমন সহজে তা বুঝে ফেলি তেমনি সহজে তাকে নস্যাৎ করতেও বাধে না। কিন্তু যাঁরা শুধু ফ্যাশান বজায় রাখার

জন্যে আধুনিক হতে চান তাঁরা কিছুই হতে পারেন না। এই নাটটিকর অভিনয়ে মনে রাখা দরকার যে কার্টুন ছবিতে যেমন বড় নাককে বিরাট বড় করে দেখান হয় তেমনি এই নাটকের চাঁদগুলিকে "বিশেষ" করে দেখাতে হবে। প্রথম অভিনয়ের দিনে প্রবীণ নাট্যকারদ্বয় শ্রদ্ধাস্পদ শচীন সেনগুপ্ত ও তুলসী লাহিড়ীর এই নাটকটি ভাল লেগেছিল।

৪। নৃযজ্ঞ॥ রচনা ২০শে মাঘ, ১৩৬৪। এ নাটকটি পরীক্ষামূলক। Grotesqueness in matter প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে। বলা বাহুল্য, গল্পটি নতুন নয়। টলস্টয় থেকে ক্যাম্যু পর্যন্ত বহু দেশের বহু সাহিত্যিক এই একই গল্পের বিভিন্ন রূপারোপ করেছেন। ভারতীয় ভাষায় এই ঘটনা অবলম্বন করে সম্ভবতঃ প্রথম নাটক এটা। বিদেশী সাহিত্যিকগণ পুরুষ চরিত্রের ওপর জোর দিয়েছেন—আমি সেজন্য নারী চরিত্রগুলিকে প্রধান করেছি।

৫। চেয়ার॥ রচনা ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৬৪। এটি আগের নাটকটির বিকল্প। Grotesqueness in form প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে। এটি আধুনিক সাংকেতিক নাটক। চেয়ারের চাপে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কিভাবে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এইটাই প্রতিপাদ্য। অল্পশিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভাগ্যকে মেনে নিতে শিখেছে, তাই তাদের বুকে হাঁটতে আপত্তি নাই। শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা কলঙ্কিত সহাবস্থানে বিমুখ, তাই তাদের লুপ্তি স্বাভাবিক।

৬। কেবলি ছবি—পটে লিখা॥ রচনা ১৫ই চৈত্র, ১৩৬৪। একটি farce. শিল্প জগতের ফাঁকি এই নাটিকার বিষয়বস্তু। ফাঁকিবাজ মেকীর দল যারা আসল সেজে আসর জমাতে চায় তাদেরকেই ঠাট্টা করা হয়েছে—কোন শিল্পরুচি বা শিল্পগোষ্ঠীকে ব্যঙ্গ করা হয় নাই। Noel Coward এর Nude with a violin নাটকটি পড়তে পড়তে এই নাটক রচনার চিন্তা মনে আসে সুতরাং এই নাটিকা Nude with a violin দ্বারা প্রভাবিত। তবে Coward শিল্পরুচি, বিশেষ আধুনিক অঙ্কনশিল্পকে ব্যঙ্গ

করেছেন—আমি কেবল মেকী ব্যবসায়ীদের নিয়ে টানাটানি করেছি। এই দুটি নাটকের মধ্যে মিল ও অমিল দুইই আছে। মিলের থেকে অমিলই বেশী চোখে পড়বে। অভিনয়ে অত্যন্ত দ্রুত গতির comedy-tempo দিলে দর্শকরা বেশী উপভোগ করবেন বলে মনে করি। অহেতুক হাসি সৃষ্টির প্রয়াস না করে নাটকীয় বস্তুকে প্রকাশমান করলেই নাটকের প্রতি সুবিচার করা হবে।

৭। টেবিল॥ রচনা ২৩শে চৈত্র ১৩৬৪। নক্সা। একটি স্ট্রিনবার্গধর্মী হাসির নাটিকা। Monolgue.

৮। জোর॥ রচনা ২৩শে চৈত্র, ১৩৬৭। স্ট্রিনবার্গের বিখ্যাত Monologue "The Stronger" এর অনুবাদ।

৯। জৈবিক॥ রচনা ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫। সম্পূর্ণ সাংকেতিক নাটক। আমাদের কাম্য আকাঙ্ক্ষা ও আশার বস্তু সব সময়ে মদনমোহনরূপে আসে না। তার বাইরের অক্ষমতা ও কদর্যতায় তার অন্তরের দিকে তাকাতে আমাদের ইচ্ছা করে না। আমরা তাই চাওয়ার বস্তু পেয়েও হারাই।

১০। পিরানদেল্লোর মতো॥ রচনা ৮ই চৈত্র, ১৩৬৫। এটি সম্পূর্ণভাবে পিরানদেল্লীয় রীতিতে রচিত হয়েছে। পিরানদেল্লীয় রীতি সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতিই নাটকটি বিশ্লেষণের পক্ষে যথেষ্ট মনে করি। "The philosophy that Pirandello most strongly expressed in his plays is the illusion of life, and hopelessness of man's attempt to create a reality for himself and for others—a bitter and destructive creed .....There can be no truth, he says, since truth varies with different individuals, and with each individual in different circumstances; there can be no communication with others, since words

interpret what seems to be and not what is ; and in the last resort there can be no sanity, since sanity demands a stable foundation and for Pirandello there is nothing but flux and uncertainty."

—THE OXFORD Companion to THEATRE.

অবশেষে যাঁরা আমার লেখা পছন্দ করেন এবং নানা আলোচনা ও উপদেশ দিয়ে আমার জ্ঞানবৃদ্ধির সুযোগ দিয়েছেন, সেই সব বন্ধুদের ও শ্রদ্ধাস্পদ পূর্বসূরীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বঙ্গীয় নাট্যসংসদ আমার অনেকগুলি নাটক একাধিকবার সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তাঁদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। নাট্যকার সংঘ নাট্যকারদের অধিকার রক্ষার যে গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তার জন্য প্রত্যেক নাট্যকারের ধন্যবাদার্হ। শ্রদ্ধেয় অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছাপাখানার ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে তুলে নিয়ে আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। ইতি শ্রীপঞ্চমী, ৭ই মাঘ, ১৩৬৭

কাশিমবাজার ভবন
৩০২, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৯

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

সূচী

চাঁদের হাট

বঙ্গীয় নাট্যসংসদ কর্তৃক 'চাঁদের হাট' প্রথম অভিনীত হয় ২১শে বৈশাখ ১৩৬৫ (৪ঠা মে ১৯৫৮)। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীষোড়শী মজুমদার ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়।

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন :

শশীবাবু	..	শ্রীগোবিন্দভূষণ ঘোষ
চন্দ্রা (শশীবাবুর দ্বিতীয় পক্ষ)	...	শ্রীমতী উমা দাসগুপ্ত
ইন্দু (,, প্রথম পক্ষের বড মেয়ে)	,,	মীরা মল্লিক
সুধা (,, ,, মেজ মেয়ে)	,,	আরতি গুপ্ত
জ্যোৎস্না (,, ,, ছোট মেয়ে)	,,	মিনতি গুপ্ত
বিধুমাসী	... ,,	ইন্দু চট্টোপাধ্যায়
হিমাংশু হোম (প্রখ্যাত গাইয়ে)	...	শ্রীচিন্নু গোস্বামী
শশধর (বড় জামাই)	... ,,	রমেন লাহিড়ী
মৃগাঙ্ক (মেজ জামাই)	... ,,	সোমেন নন্দী
ভাস্কর		

চাঁদের হাট

প্রথম ভাগ

(শশীবাবু অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। যুদ্ধে, শেয়ার মার্কেটে ও লোহার ব্যবসায়ে ব্যাংকের অবস্থা বেশ স্ফীত। নতুন বাড়ি নিউ আলিপুরে আধুনিকতম সাজে সাজানো। সাহেবী কায়দায় বসবার ঘর—পেছনে খাবার ঘরের একাংশ দেখা যাচ্ছে। বাঁদিক দিয়ে সিঁড়ি উঠে দোতলায় চলে গেছে। চৌদ্দ বছর আগে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করার পর থেকেই অবস্থার উন্নতি। তাই স্ত্রীর নাম অনুসারে বাড়ির নাম—চন্দ্রালয়।…সময় সকাল সাড়ে এগারোটা।)

শশীবাবুর অবিবাহিত ছোট মেয়ে জ্যোৎস্না ফোন করছে

—হ্যালো। হ্যালো! বউবাজার হোটেল? আমি নিউ থিয়েটার্সের দিলীপ সরকারের সেক্রেটারি কথা বলছি। হিমাংশু বাবু আছেন?—সেকি! আপনি হিমাংশু হোমকে চেনেন না?—বিখ্যাত গাইয়ে, রেডিওতে, ফিল্মে গান করেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আপনারা যাকে বলেন হিমু হোম। আমি ধরে আছি। কি বললেন—স্নান করতে গেছেন? ওঃ আচ্ছা। উনি বাইরে এলে দয়া করে নিউ আলিপুর ৪৫৭২এ ফোন করতে বলবেন। ধন্যবাদ। নিউ আলিপুর ৪৫৭২… আপনি বরঞ্চ লিখে রাখুন। বিশেষ জরুরী। বি-শেষ। নমস্কার।

(জ্যোৎস্না হেসে রিসিভার রেখে দিল। শ্রীমতী বিধুমুখী বাড়ির ভেতর থেকে এল। শশীবাবু যখন কম্বুলীটোলার

গলিতে থাকতেন, বিধুমুখী সেই আমলের লোক। শশীবাবুর উন্নতির সংগে সংগে তারও পদোন্নতি হয়েছে। এবং সেই সংগে দেহের স্ফীতিও পূর্ণমাত্রায় বেড়ে গেছে। রংটি কালো, সামনের দুটি দাঁত সঙ্গীন উঁচিয়েই আছে। হঠাৎ রাতের অন্ধকারে দেখা হলে ভীত হয়ে পড়া বিচিত্র নয়। শশীবাবুর তিন কন্যাই এর হাতে মানুষ হয়েছে এবং দ্বিতীয় পক্ষও একে খুব পছন্দ করেন।)

জ্যোৎস্না—কি গো বিধুমাসী! রান্নাঘর ছেড়ে এখন এখানে কি মনে করে?

বিধু—সূর্যি বললো—ভাস্কর বাবুকে পাচ্ছে না। আমিও তো তাকে দেখছি না কোথাও।

জ্যোৎস্না—(একটা সোফার উপর ধপাস করে বসে পড়ে) ভাস্কর আমার শোবার ঘরে।

বিধু—ওমা—সেকি কথা! সারা রাত্রি সেখানে ছিল না তো?

জ্যোৎস্না—ছিলই তো। আমার যে একা লাগে।

বিধু—ও মাগো! কি কাণ্ড তোমার! দেখ—যেন তোমার বাপ আবার না জানতে পারে। সে যা ভাস্কর বাবুকে অপছন্দ করে।

জ্যোৎস্না—সত্যি বাবাটা এমন হয়েছে! আমার সময় সময় ভা—রী দুঃখ হয় বাবার জন্যে। কি রকম যে খিটখিটে হয়েছে আজকাল! যত দিন যাচ্ছে—ততই যেন বুড়োটে হয়ে যাচ্ছে।

বিধু—ছিঃ অমন কথা বলো না। এই তো সবে তোমার বাবার মাথার দু' একটি চুল পাকতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু দেখো তো—কি শক্ত! কোনও জোয়ান ছেলে এখনও ওর সংগে হেঁটে পারবে?

জ্যোৎস্না—জানো মাসী—বাবাকে দেখলেই আমার শীত কালের গাছের কথা মনে পড়ে। একটা একটা করে সব পাতা ঝরে যায়—তারপর গাছটা নুয়ে পড়ে—

বিধু—চুপ। চুপ। তোমার বাবার আসার সময় হয়েছে। এই সব কথা সে শুনতে পেলে তোমাকেই বেশ করে নুইয়ে দেবে!

জ্যোৎস্না—(হেসে) যাঃ। আমি কি এখনও ছেলে মানুষ আছি নাকি? আমার আঠারো বছর বয়স হল। আমি এখন রীতিমত একজন মহিলা।

বিধু—(কোমরে হাত দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে) —হুঁ। তাই তো দেখছি। তোমার সংগে ছেলেমানুষী করলে তো আর আমার চলবে না—যাই ভাস্বর বাবুকে নিয়ে আসি। (সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেল।)

(টেলিফোন বেজে উঠল।)

জ্যোৎস্না—(তাড়াতাড়ি উঠে টেলিফোন তুলে নিল) হ্যালো? হ্যাঁ—এটা নিউ আলিপুর ১৫৭২। হ্যাঁ—আপনি হিমাংশু বাবুকে দিন। আমি সরকার সাহেবকে লাইনটা দিচ্ছি। (সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে) হ্যালো—কে? হিমাংশু হোম? হিমাংশু বাবু, আমি জ্যোৎস্না। নিউ থিয়েটার্স থেকে। শুনুন, শুনুন আমি। শুনুন—ছেড়ে দেবেন না। আমি আপনাকে ভালবাসি সত্যি, ভীষণ ভালবাসি সেদিন—হ্যালো—হ্যালো—ছেড়ে দিলেন নাকি? হ্যালো—(বিমর্ষভাবে ফোন রেখে দিল।)

বিধু—(ভাস্বর বাবুকে কোলে করে নেমে এল)—

জ্যোৎস্না—দাও, ভাস্বর বাবুকে আমার কাছে দাও।

বিধু—এই সোফায় ভাস্বর বাবুকে দেখলে তোমার বাবা যা চটবেন।

জ্যোৎস্না—চটুন গে।

বিধু—কিন্তু একে যে এখন চান করাতে হবে।

জ্যোৎস্না—(কুকুরটিকে বিধুর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে) —ও এখন আমার কাছেই থাকবে। এমনই আমার ওকে ভাল লাগে।

বিধু—বাবা, বাবা। কি মেয়েই যে হয়েছো!

(বাড়ির ভেতরে প্রস্থান)

জ্যোৎস্না—ভাস্কর, জানিস—সে আমার সংগে কথা বলেছে। এইমাত্র তার গলা আমার কানের ঠিক পাশে গুর গুর করছিলো! কিন্তু কি বললো জানিস? (গলা মোটা ক'রে) "কে হে অসময়ে চেঁচামেচি করছো?" যেই বললাম, 'আমি'—অমনি বিড বিড করে কি বলতে বলতে দুম করে ফোন রেখে দিল।

(টেলিফোন আবার বেজে উঠল)

—হ্যালো? (বিরক্ত হয়ে)—না এটা শেয়ালদা' স্টেশন নয়। নিউ আলিপুরে শেয়ালদা স্টেশন কোথা থেকে আসবে!

(ফোন নামিয়ে রাখল)

(বিধুমুখী দৌড়ে প্রবেশ করল)

বিধু—বলো দেখি কি হয়েছে?

জ্যোৎস্না—(বিরস ভাবে) তুমি হাঁপাচ্ছ।

বিধু—তাতো হাঁপাচ্ছি। কিন্তু কেন বল দেখি?

জ্যোৎস্না—(সোফায় বসে একটা ইংরেজি মাসিক পত্রে মুখ আড়াল করে)—বোধ হয় খুব খেয়েছ।

বিধু—না গো না। পারলে না। কই, আবার মুখ আড়াল করলে কেন?—তোমার দিদি এসেছে যে।

জ্যোৎস্না—(উৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে) কোন জন? দিল্লীওয়ালী? না বোম্বেওয়ালা?

বিধু—দেখ, দেখ। মেয়ের কথা বলার ধরন দেখ। আমার সুধা মা এসেছে। মাত্র দু'মাস আগে যেদিন বিয়ে করে চলে গেল—উঃ কি দুঃখই যে লেগেছিল! মনে হয়নি—এত তাড়াতাড়ি আবার দেখতে পাব।

(শশীবাবুর বিবাহিতা দ্বিতীয়া কন্যা সুধা বাইরের দিকের দরজা দিয়ে ভেতরে এল। ইনি দিল্লীতে বাস করেন। পরনে অদ্ভুত সাজ। নীল রংএর ছাতার কাপড়ের পাজামা—হাঁটুর তলাতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। ঢোলা কামিজটিও একই রংএর—তবে কাপড়টি কিছু ভাল। বিছানার চাদরের মত পুরু ওড়না পিন দিয়ে উর্ধ্বাঙ্গে জড়ানো। কামিজের গলা উঁচু এবং হাতা কনুইএর তলাতে শেষ হয়েছে। চুল টেনে পেছনে ঝুঁটী করে বাঁধা। হঠাৎ দেখলে—পুরুষ কি মেয়ে চেনা শক্ত। এঁর স্বামী শিল্পী ও নাট্যকার। স্বামীর চরিত্র স্ত্রীর পোষাকেই প্রকাশমান।)

সুধা—বাব্বাঃ দিল্লী থেকে কোলকাতা লাগে সাড়ে তিন ঘণ্টা আর দমদম থেকে নিউ আলিপুর দু'ঘণ্টা! (জ্যোৎস্নাকে) কেমন আছিস রে? ছোট মা কোথায় মাসী?

বিধু—তোমার ছোট মা'র কোন ভাই-এর নাকি ছেলেপিলে হবে। তাই দেখতে গেছেন।

জ্যোৎস্না—সত্যি বলছ মাসী? ভাই-এর ছেলে হবে! সত্যি বলছ? বাঃ, এতো খবরের কাগজে বেরুবার মত খবর!

বিধু—আরে, ভাই এর ছেলে হবে বলে কি আর ভাই-এরই ছেলে হবে! কি মেয়ে বাবা—কথায় কথায় ভুল ধরবে। ছেলে হবে ভাই-এর বৌ-এর। বুড়ো হয়েছি—এখন অত মানিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারি না বাপু।

সুধা—বাবা এখনও ফেরেন নি নিশ্চয় ?

বিধু—না। এত তাড়াতাড়ি তোমার বাবা ফিরবে? তাহলেই হয়েছে আব কি। কইরে সুর্যি—সুধামার জিনিসগুলো ওপরে নিয়ে এলি ? এ লোকগুলোও হয়েছে সেই রকম। সুর্যি—

সুধা—ব্যস্ত হচ্ছো কেন মাসী ? ও নিয়ে যাবে'খন। আমি তো আর এখুনি চলে যাচ্ছি না।

বিধু—বালাই ষাট ! যেতে যাবে কেন ? তোমাদের কি আমি যেতে বলতে পারি ?

জ্যোৎস্না—কেমন আছিস রে দিদি ?

সুধা—কেন, দেখতে পাচ্ছিস না ?

জ্যোৎস্না—তফাৎ খুব বুঝছি না। এক পোষাকটা। আমার ধারণা ছিল বিয়ে করলেই মুটোতে আরম্ভ করে। ছোটমাকে দেখলি না ?

বিধু—ছিঃ, গুরুজনদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে নেই। তোমরা বাবার বিয়ে দেখতে পারো কিন্তু তোমাদের ছোটমাও গুরুজন।

জ্যোৎস্না—ভারী গুরুজন ! বড়দির থেকে তো মাত্র ৭।৮ বছরের বড় !

সুধা—তুই থাম ছোট্‌কা। তুই কতটুকু ছিলিরে বাবার বিয়ের সময় ? তুই আর কথা বলিস না। তার ওপর ছোটমা'র আদর সব থেকে বেশী তুই-ই পেয়েছিস। উনি তোর কাছে গুরুজনই তো।

বিধু—নাও, নাও। দুই বোনে আর ঝগড়া করতে হবে না আগেকার মতো। এখন যে সুধামার বিয়ে হ'য়েছে—সেও এখন গুরুজন হয়েছে।

জ্যোৎস্না—ভারি !

বিধু—হ্যাঁ গো আব তোমাব যেদিন বর আসবে সেদিন তুমিও আমার গুরুজন হবে।

জ্যোৎস্না—কি আমাব বাজে ঠাট্টা ভাল লাগে না।

বিধু—একি সুধা মা—তোমার কপালে সিঁদুর নেই কেন ?—একি হাতে শাঁখা কই ! লোহাও যে নেই !

সুধা—তোমার জামাই ওসব পছন্দ করে না মাসী !

বিধু—হ্যাঁ এর আবার পছন্দ অপছন্দ কি ? জানি না বাবা। কইরে সুর্যি। উঃ ও লোকটার যদি কোনও কাজে হুস থাকে। (প্রস্থান)

জ্যোৎস্না—আচ্ছা মেজদি দিল্লীতে মৃগাঙ্কদাকে সবাই চেনে—না ?

সুধা—হ্যাঁ—সবাই খুব ভাল চেনে।

জ্যোৎস্না—অতবড় একজন শিল্পী—আর কি-ই বা বয়েস হবে ? ৩০ হবে নাকে ? উঃ সেদিন তুই বাবাকে বললি ওকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবি না, আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিলাম। গায়ে একেবারে কাটা দিয়ে উঠছিল। আমার এখনও মনে আছে—'ওর সংগে পরশু বিয়ে না দিলে আমি আত্মহত্যা করব। তুমি বাবা সে পাপের ভাগী হবে।' আমি সেদিনই ডায়েরীতে লিখে রেখেছি।

সুধা—যা যা।

জ্যোৎস্না—যা যা কেবে ?

সুধা—তুই এখনও ছেলে মানুষ আছিস।

জ্যোৎস্না—আর দু'মাস বিয়ে করে তুই ভারী বড়ী হয়েছিস। কি হয়েছে রে দিদি ? তুই এমন মুখটা গোবদা করে আছিস কেন ?

সুধা—কই ? এই তো দেখ না কেমন হাসছি ! হ্যাঁরে, বাবার কাজকর্ম কি রকম চলছে রে ?

জ্যোৎস্না—কি জানি।

(জ্যোৎস্না সুধার দিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তাকে বেশ করে নিরীক্ষণ করে)

—তোকে কিন্তু এই পোষাকটায় মোটেই মানাচ্ছে না।

সুধা—কেন ?

জ্যোৎস্না—কি রকম অদ্ভুত বিদেশী লাগে। তুই যদি কথা না বলতিস, আর তোর সঙ্গে যদি রাস্তায় দেখা হত—আমি চিনতে পারতাম না। (ভাল করে দেখে)—তোর চোখে কালশিটে পড়ল কি করে ? দেখি। ইস, বেশ অনেকখানি জায়গায় পড়েছে।

সুধা—ধাক্কা লেগেছিল।

জ্যোৎস্না—সেকি ! কোথায় ? (বিধুমুখী চিৎকার করতে করতে এল)

বিধু—মৃগাঙ্কবাবুকে দেখছি না কোথাও। গেল কোথায় ?

সুধা—ও দিল্লীতেই আছে। আমি একাই এসেছি।

বিধু—সেকি ! তোমাদের বিয়ের এখনও দু'মাস হয়নি—এর মধ্যে ছাড়াছাড়ি ! কিছু গণ্ডগোল হয়নি তো ?

সুধা—তোমাদের কি হয়েছে বল তো ? খালি কেন কেন। কতকগুলো জামা কাপড় কিনতে এসেছি—তা করছে দেখ।

(পেছনে খোলা জানালার কাছে গেল। জানালার বাইরে ফুলগাছ থেকে ঝুঁকে পড়ে একটা সূর্যমুখী তুলে আনল। পুরুষালী ভঙ্গীতে সূর্যমুখীটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল।)

জ্যোৎস্না—বাবাঃ। কাপড় কিনতে দিল্লী থেকে কোলকাতা !

বিধু—(ভাস্করকে জ্যোৎস্নার কোল থেকে নিল)—সুধামাকে মোটেই খুশি দেখাচ্ছে না। হুঁ—আমি দেখেই বুঝতে পারি। তোমার বাবা যখন তোমাদের মাকে বিয়ে করেছিল—তখনই আমার মনে হয়েছিল ওরা সারা জীবন ঝগড়া করবে। আর ঠিক কি তাই হোল ! শেষে বেচারা মরে শান্তি পেল !

সুধা—বিধুমাসী—

বিধু—কি হল ?

সুধা—তোমাকে তো কেউ পাকামী করতে ডাকেনি। এখন যাও দেখি নিজের কাজে।

বিধু—হুঁঃ। (ভাস্করকে নিয়ে ভেতরের দরজা পর্যন্ত যায়) ওরে সুর্যি,—মেজদিদির বাক্সটা ঘরে দিয়ে আয়। (প্রস্থান)

(সুধা আর জ্যোৎস্না দু'জনে সোফায় বসল।)

সুধা—বড়দির কোনও খবর জানিস নাকি ?

জ্যোৎস্না—বোম্বাই যাবার পর কিছু না।

সুধা—বেশ মজা না ? ছ'মাসের মধ্যে আমরা দুই বোনে কেমন হুড়ুম দুড়ুম করে বিয়ে করে ফেললাম ? দিদি চলে গেল বোম্বাই, আমি চলে গেলাম দিল্লী।

জ্যোৎস্না—আমি তো তার মধ্যে মজার কিছু দেখি না। বিয়ে করা জীব ধর্মের একটা অঙ্গ।

সুধা—(হেসে) ওরে বাবা। তুই দেখি একজন মস্ত তাত্ত্বিক হ'য়ে উঠলি ? তা এত বেলা পর্যন্ত এই লাট হয়ে যাওয়া কাপড়টা পরে বসে আছিস কেন ? ঘুমোচ্ছিলি ?—না শুতে যাচ্ছিস ?

জ্যোৎস্না—একটু গড়াগড়ি দিচ্ছিলাম। বাবার ধারণা আমি অসুস্থ।

সুধা—কেন ? কি হয়েছে ?

জ্যোৎস্না—খিদে নেই। গা ম্যাজ ম্যাজ করছে।

সুধা—সেকি ! প্রেমে পড়িস নি তো ?

জ্যোৎস্না—যাঃ !

সুধা—সত্যি কথা বল্‌তো ? বাবা জানে ?

জ্যোৎস্না—কেউ জানে না.

সুধা—যাই করিস ছোট্‌কী। ভেবে চিন্তে আস্তে আস্তে করবি। হঠাৎ হড়বড় করে কিছু করিস না।

জ্যোৎস্না—কেন তোর আবার কি হল? নিজেরা যখন প্রেম করলেন বিয়ে করে দেশ ছেড়ে দৌড় মারলেন—তখন ভাবনা চিন্তা কোথায় ছিল?

সুধা—মাথাতেই ছিল।

জ্যোৎস্না—সত্যি মেজদি তোর যেন কি হয়েছে! আগে তো কখনও এরকম পাঞ্জাবী মেছুনীর মতো পোষাক পরতিস না?

সুধা—আমার স্বামী আমার পাঞ্জাবী মেছুনী হওয়াই পছন্দ করে। জানিস তো—ও একজন আধুনিক শিল্পী!

জ্যোৎস্না—আর তোর চোখের ঐ কালশিটেটা?

সুধা—ওটা হোল—শিল্পী গোষ্ঠীর আমাদের flat এ অধিবেশনের চিহ্ন।

জ্যোৎস্না—সেকি রে?

সুধা—অধিবেশন মানেই মারামারি। বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি।

জ্যোৎস্না—তাঁকে মাতালদের সংগে হরদম মিশতে হয় নাকি রে?

সুধা—হরদম না হলেও প্রায়ই হয়। আর এরা সবাই যে অল্পবয়সী তাও না। সব বুড়ো বুড়ো লোকও আছে।

জ্যোৎস্না—ওর নাটকের সঙ্গীগুলিও তাই নাকি?

সুধা—প্রায়। তবে কিছু ভাল। এক—যেদিন প্রধানা অভিনেত্রী আসেন—সেদিনই কাণ্ড! তিনি জাতে আবার ইহুদী!

জ্যোৎস্না—সেকি রে? জামাইবাবু কোন্ ভাষায় নাটক লেখেন?

সুধা—হিন্দীতে। ওটাই তো রাজভাষা কি না এখন।

জ্যোৎস্না—তোদের ঐ ইহুদী মহিলা হিন্দী বলতে পারে?

সুধা—নাট্যকারের থেকে ভাল পারে।

জ্যোৎস্না—সেকি রে!

সুধা—Sur-realism কাকে বলে জানিস ?

জ্যোৎস্না—না তো।

সুধা—তবে বুঝবি না। হিন্দী নাটক লেখা হয় ইংরাজি হরফে—দৃশ্যপট গ্রীক। লিখিত নাটক কখনও ১২ পাতার বেশী হয় না। বাকীটা মুখে মুখে তৈরী হয়।

জ্যোৎস্না—কেউ পার্ট ভুলে যায় না ?

সুধা—ভুলবে কি ? পার্ট থাকলে তবে তো ভুলবে !

জ্যোৎস্না—তুই দেখেছিস কখনও ওদের নাটক ?

সুধা—হ্যাঁ। কিচ্ছু বুঝতে পারি নি।

জ্যোৎস্না—হ্যাঁ, হ্যাঁ—কাগজে খুব প্রশংসা বেরিয়েছিল। বাবা সবাইকে পড়ে শোনালেন।

সুধা—অত্যানুভূতি বুঝিস ? কিংবা আত্মিক আলোড়ন ? ওর নাটক সেই সব ভাব নিয়ে লেখা।

জ্যোৎস্না—দেখে কারা ? তারা বোঝে ?

সুধা—দিল্লী হল ভারতের রাজধানী। আর ভারত হলো কৃষ্টির একটা মস্ত কারখানা। দিল্লীর লোকেরা বোঝে না এমন জিনিস পৃথিবীতে আছে। হাঁ—অবশ্য বিজ্ঞাপনটা ভালভাবে হওয়া চাই !

জ্যোৎস্না—নাটক নিয়ে পড়ে থাকলে মৃগাঙ্কদা মূর্তি তৈরি করে কখন ? ওরই ফাঁকে ফাঁকে ?

সুধা—ও বলে ওর একটা হলো ওর নেশা অন্যটা পেশা। কোনটা কি বোঝবার সাধ্য আমার নাই।

জ্যোৎস্না—কি মূর্তি বানায় ?

সুধা—সেখানেও Sur-realism। Picasso হচ্ছে ওদের ভগবান। আর James Joyce ওদের গীতা কোরাণ !...জানিস ও একটা নাটক

লিখেছে—তার নায়ক হচ্ছে এক ভদ্রলোকের দাড়ি, আর নায়িকা হল একটা গাছের পাতা। সেটা আবার উড়ে এসে দাড়িতে পড়বে!

জ্যোৎস্না—সে আবার কি?

সুধা—ওই তো আধুনিকতা। আমি যখন নাট্যকারের বউ, আমাকেও সেই মতো পোষাক পরতে হবে।

(বাইরে বিধুর গলা শোনা গেল—আমাদের সুধামা এসেছে।)

জ্যোৎস্না—ওই ছোটমা এসে গেছে।

সুধা—কে জানতো বাড়ি ফিরে কেবল ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে!

জ্যোৎস্না—ছোটমার ওপর রাগ করিস না ভাই মেজদি। এমন ভালো সংমা কজনের ভাগ্যেই বা জোটে। তোদের বিয়েতে কত সাহায্য করেছিল বল?

সুধা—এমন জানলে কে আসত?

(চন্দ্রা এলেন। শশীবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। চেহারাটা খুব কাঁচা, চেহারা দেখে বয়স আন্দাজ করা সোজা নয়। এক সময় অভিনেত্রী ছিলেন—মাঝে মাঝে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। পাকা গৃহিণীর আদর কায়দা বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে।)

চন্দ্রা—এই যে জ্যোৎস্না—এখনো চান করনি? তোমার দিদি এসেছে শুনলাম। কোথায় গেল?

(জ্যোৎস্না নিঃশব্দে পাশে বসা সুধাকে দেখিয়ে দিল।)

—ওমা। তাই তো। পোড়া চোখের মাথা খেয়েছি! তোমায় চিনতেই পারিনি। তোমার বাবাকে এত করে বলি একটা

চশমা নেব তা কিছুতে শুনবে না।—কেমন আছ সুধা? মৃগাঙ্ক ভাল আছে তো? তা খবর না দিয়েই চলে এলে যে বড়ো? প্রথমে তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল আর কেউ, যা চীনেম্যান সেজেছ!

জ্যোৎস্না—জান ছোটমা—মৃগাঙ্কদারা সব মদ খেয়ে মারামারি করে। দিদির চোখে কতবড একটা কালশিটে পড়েছে দেখ।

চন্দ্রা—তাই তো? সত্যি নাকি রে?

সুধা—না মারামারি নয়। বন্ধু বান্ধব মিলে একটু আলোচনা করছিল। দিল্লীতে তো উঁচু জায়গায় মদ না হলে চলে না।

চন্দ্রা—আমি বুঝেছি। আমায় আর বলতে হবে না। তোমাদের বাবা আমাকে বিয়ে করবার আগে—কমদিন তো আর স্টেজে ছিলাম না। ও সব নাট্যকার শিল্পীদের দেখেই বুঝে ফেলি। তাদের আলোচনা একটু জোরেই হয়।

জ্যোৎস্না—নাটক যারা লেখে—সবাই মাতাল হয়!

চন্দ্রা—না, না—সবাই মাতাল হবে কেন? তবে যারা ভালো নাটক লেখে তারা একটু পাগলাটে হয়। কেননা তাদের মাথার মধ্যে সব সময় নায়ক নায়িকাদের দুঃখ কষ্ট একেবারে গজ গজ করে কিনা!

জ্যোৎস্না—পাগল হয়!!

চন্দ্রা—তুই ছেলে মানুষ। তুই ঠিক বুঝবি না। কি বল সুধা?

সুধা—সত্যি ছোটমা—সময় সময় মনে হয় সব কটা বদ্ধ পাগল।

চন্দ্রা—তার মানেই জামাই হল একজন স্রষ্টা। ও যে মস্ত বড়, সে বিষয়ে ভুল নেই।

সুধা—কেবল ভুল রোজগারের বেলায়!

চন্দ্রা—(যেন সত্যি শুনতে পায়নি)—কি বললি?

সুধা—কেবল ভুল রোজগারের বেলায় !

চন্দ্রা—যাঃ অমন কথা বলিস না। কত বড় বড় শিল্পীরা না খেয়ে মরেছে জানিস ? আমি তাদের সব জীবনী পড়েছি। শেষে একদিন তার হাতের একটুখানি জিনিসের জন্যে কাড়াকাড়ি। এক একটা হাঁচি কাশির দাম তখন লাখ টাকা ! সুধা মা, তোর কি ভাগ্য !

জ্যোৎস্না—মৃগাঙ্কদা এখনও নাটক লিখছে ?

সুধা—বেস্পতিবারে একটা লিখেছে। ব্যবসার শোকে একটা ক্যালেণ্ডার দেওয়ালের গায়ে ছটফট করছে। দরজার কোণ থেকে ধুলো-গুলো মাটিতে পড়ছে আর কথা বলছে। এমন সময় হাত থেকে পড়ে পেয়ালাটা ভেঙ্গে গেল !

জ্যোৎস্না—তার মানে ?

চন্দ্রা—(আকাশের দিকে চোখ করে) ওফ্, কি সুন্দর ! কি অপূর্ব ! চায়ের পেয়ালাটা ভেঙ্গে গেল ! আহা-হা ! জান, তোমাদের বাবার জন্যে আমাকে স্টেজ ছাড়তে হয়েছে, কিন্তু শিল্পী মনটা এখনও নষ্ট হয় নি। ওই গদ্যময় লোকটার সংগে বাস করেছি—কিন্তু মনটাকে তোমাদের মনে ছেড়ে দিয়েছি। আহা—আজ তুমি বিয়ে করেছ একজন শিল্পী-নাট্যকারকে আর আমাদের ইন্দু বিয়ে করেছে একজন অভিনেতা-উপমন্ত্রীকে। উঃ আমার যে কি আনন্দ ! তোমরাই আমার মনের সব সাধ আহ্লাদ পূর্ণ করেছ।

(টেলিফোন বেজে উঠল)

সুধা—(টেলিফোনে)—না, না, এটা শেয়ালদা স্টেশন নয়। না, এটা কোনও স্টেশনই নয়। এটা এক ভদ্রলোকের বাড়ি

(নেপথ্যে বিধু—মা দাদামশায় এসেছেন)

চন্দ্রা—সুধা, তোমার বাবা আসছেন। তাঁকে হঠাৎ চমকে দেওয়া উচিত হবে না। একেই তো ওঁর শরীর ভাল না। তোমরা ওপরে যাও। হ্যাঁ, হ্যাঁ দেরী কোর না।

(দুজনে ওপরে চলে গেল)

বিধু—(হাতে এক প্লেট স্যাণ্ডউইচ নিয়ে ঢুকল।) কই, সুধা মা কোথায় গেল? ওর জন্যে স্যাণ্ডউইচ করে নিয়ে এলাম। শশার স্যাণ্ডউইচ—যা ও পছন্দ করে।

চন্দ্রা—চুপ। চুপ।

(শশীবাবু এলেন। পাকা আমের মত গায়ের রঙ রোদে পুড়েছে। দেখলেই বোঝা যায় ইনি শেয়ার মার্কেটের ঘুঘু।)

শশী—এই যে। ভাল।

(স্ত্রীকে দেখে খুশি হলেন। তারপর যন্ত্রের মত ছাতা রাখলেন। জুতো খুলে চটি পরলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। শেষে একটা Robinson-এর Lemon Barley বার করে গ্লাসে ঢেলে, জল ঢেলে সেটাকে আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন।

শশীবাবু একজন কর্মঠ লোক। পঞ্চাশের ওপর বয়স হলেও অত্যন্ত হিসেব করে চলেন বলে শরীরটা খুব ভাল। সাধারণত অল্পভাষী। অফিস থেকে ফিরে ওঁর কাজকর্ম দেখলে ওঁর সুষ্ঠু ও পরিষ্কার কাজকর্ম সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। Barley'র গ্লাসটি নিয়ে ইনি সোফায় বসে চুমুক দিয়ে, বললেন—আঃ।

শশী—আঃ !—একি তুমি স্যাণ্ডউইচ খেতে ধরলে নাকি? আমার তো ধারণা ছিল তুমি স্যাণ্ডউইচ অপছন্দ কর।

(ঘড়ি দেখলেন। মাথায় হাত দিয়ে দেখলেন ঘরের শীতলতায় রোদের প্রতিক্রিয়া আছে নাকি। নেই দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। উঠে Bag থেকে Commerce কাগজটি বার করে এনে পড়তে আরম্ভ করলেন। বিধুমুখীর উত্তর দিতে যাওয়া মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে চন্দ্রা তাকে ওপরে যেতে নির্দেশ দিলেন। তারপর বিধুমুখী সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যেতে থাকল দেখে বললেন—)

চন্দ্রা—ও জ্যোৎস্না খেতে চেয়েছিল সেই জন্যে।

শশী—জ্যোৎস্না? সে তো মুরগীর স্যাণ্ডউইচ পছন্দ করে। শশার স্যাণ্ডউইচ তো সে খায় না।

চন্দ্রা—তাহলে বিধু বোধ হয় ভুল করেছে।

শশী—বিধু তো এসব ব্যাপারে ভুল করে না।

চন্দ্রা—(খুব বিরক্ত) আরে ধ্যাৎ! একদিন শশার স্যাণ্ডউইচ খেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! খায় না—করে না।

(শশীবাবু নিস্তব্ধ। চন্দ্রা ভেবে পান না সুধার আসার খবরটা কি ভাবে বলবেন।)

শশী—জ্যোৎস্না কেমন আছে?

চন্দ্রা—ভাল। মানে খুব ভাল নয়। ওর সেই গা ম্যাজ ম্যাজ আজও আছে। আমি বলি কি একজন বিলিতি ডাক্তার দেখাও। দেশী ডাক্তার ওর রোগ ধরতে পারবে না।

(পড়া বন্ধ করে হঠাৎ আকাশে নাক তুলে গন্ধ শুঁকতে লাগলেন।)

শশী—হুঁ।

চন্দ্রা—কি হল? শরীর খারাপ লাগছে? আর একটু Lemon Barley দেব? কোন নতুন খবর আছে?

শশী—পর পর জবাব দি। না। দাও। হ্যাঁ। (চন্দ্রা আর এক গ্লাস Lemon Barley দিলেন) তোমাদের রামচন্দ্র ট্রাঙ্ক কল করেছিল—ইন্দু নাকি আমার কাছে আসছে।

চন্দ্রা—তা ওকে রামচন্দ্র বল কেন?—ও না হয় বোম্বাইয়ের প্রত্যেক ছবিতে রামচন্দ্রই সাজে—তাতে তো আর ওর নাম রামচন্দ্র হবে না। আর কি বললে শশধর?

শশী—ওই এক কথা। পরশু যা ইন্দু বলেছে। এবার ভোটে হেরেছে। কাজেই উপমন্ত্রী হতে পারেনি। ভোটাভুটি করতে গিয়ে মার খেয়েছে—কাজেই রামচন্দ্র সাজতে পারছে না। সুতরাং ৫০০০৲ টাকা এক্ষুণি না পাঠালে না খেয়ে মরবে।

চন্দ্রা—তুমি কি বললে?

শশী—বললাম, আইন আছে। তুমি মরলে মেয়ের আবার বিয়ে দেব।

চন্দ্রা—কি যে তুমি বল? ছিঃ ওকি কথা!

শশী—ওকি কথা কি? বিয়ে করবার সময় মনে ছিল না? স্ত্রীকে খেতে দেবার সামর্থ্য যার নাই, সে বিয়ে করতে যায় কেন? তারপর, যে জামাইদের আমি দেখিনি—তাদের সম্বন্ধে আমার কোনও মমতা নাই।

চন্দ্রা—সে দোষ তো তোমার। শশধরের বিয়ের সময় তুমি রাগ করে বোম্বাই গেলে না। একা আমার ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিলে। সে তখন একে উপমন্ত্রী—তায় অভিনেতা—আসে কি করে বল?

শশী—ইন্দুর সংগে কোথায় এক Diplomatic Service-এর ছেলের বিয়ে স্থির করেছিলাম। আজ সে Australia-র High

Commissioner-এর অফিসে Trade Adviser। আর শ্রীমান রামচন্দ্র খেতে পাচ্ছেন না!

চন্দ্রা—তা শশধরই বা খারাপ ছেলে কিসে? অমন চেহারা কটা ভারত-বাসীর আছে! সেইজন্যেই তো বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট ওকে ডেকে উপমন্ত্রী করল। কাগজে তো দেখেছ লোকেরা ওকে পেয়ে কি রকম উল্লাস করেছিল। চালপট্টিতে তো দাঙ্গাই হয়ে গেল!

শশী—মেজ মেয়েটার বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল। কোথায় ভাবলাম সে একটা রিসার্চ করবে, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। ও বাবা—সে বিয়ে করল একটা বদমায়েস বাউণ্ডুলেকে! তোমার রামচন্দ্রকে যদি বা সহ্য করি ওই দেড়েল ভণ্ডটার জ্যেঠামো অসহ্য! তোমার রামচন্দ্রের তবু ফিল্ম কণ্ট্রাক্ট আছে। কিন্তু এ ছোঁড়ার কোনও গুণ নেই।

চন্দ্রা—কি বললে? গুণ নেই? কেন, ক'দিন আগে তুমিই তো পড়ে শোনাচ্ছিলে কাগজওয়ালারা কি রকম ওর নাটকের আর শিল্প সৃষ্টির প্রশংসা করেছে!

শশী—কাগজওয়ালারা তো প্রশংসা করেনি। তারা লিখেছে যারা বুঝেছে তারা খুব প্রশংসা করছিল। ওরা নিজেরা কিছু বোঝে নি।

চন্দ্রা—অথচ ওদের বিয়ে তো কলকাতাতেই হল। তুমি একটিবারও গেলে না।

শশী—বিয়ে হল? ওটাকে কি তুমি বিয়ে হওয়া বল?

চন্দ্রা—কেন, Registry বিয়ে তো আজকাল হরদম হচ্ছে?

শশী—থাম, থাম—আর রাগিয়ো না। (হঠাৎ) সুধা এসেছে কেন?

চন্দ্রা—(থতমত)—কে বললে সুধা এসেছে? যাঃ বাজে কথা। আমি তো দেখিনি! তুমি কি যে বল? হয়ত এসেছে—আমি কি করে

জানব? আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, নাকি? (অবশেষে) কেন এসেছে আমি কি করে জানব?

শশী—বলে দিও—টাকাফাকা কিছু পাবে না আমার কাছ থেকে।

চন্দ্রা—তুমি যা ব্যবহার করো মেয়ে জামাইদের সঙ্গে। যেন তারা চোর ছ্যাঁচোড়।

শশী—জেলে যে দিইনি এই তাদের ভাগ্যি ভাল। যত সব বেকার। পাকামো করবার আর জায়গা পায়নি।

চন্দ্রা—(পুরানো অভিনয় মনে পড়ে গেল। একটা চেয়ার টেনে এনে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন)

—উঃ তুমি কি কঠোর। তোমার মনটা কি কঠিন।

(ধপ করে চেয়ারে বসে মাপ মতো ঘাড়টা ঘোরালেন। আড় চোখে দেখলেন, ফল কিছুই হল না। তখন—)

—তুমি নিজে কিছু কম যাও নাকি? আমাকে বিয়ে করার সময় তখন কেমন ঘুর ঘুর করতে। তোমার জন্যে আমাকে অভিনয় ছাড়তে হল। সে আজ চোদ্দ বছর আগেকার কথা। তারপর প্রতিদিন তোমার মতো দৈনন্দিন লোকের কাছে থেকে থেকে, নিজের যা কিছু গুণ, যা কিছু—

(খালি প্লেট হাতে বিধুমুখী নেমে এল। টেলিফোন বেজে উঠল।)

শশী—বিধু টেলিফোন ধর।

(বিধু তাই করল। চন্দ্রা বুঝলেন Effect নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একটু পেছন থেকে সুরু করলেন।)

চন্দ্রা—তোমার মতো দৈনন্দিন লোকের কাছে থেকে থেকে নিজের যা কিছু গুণ, যা কিছু সূক্ষ্ম মনোভাব সব নষ্ট করেছি—

(বিধু ফোন রেখে দেওয়া পর্যন্ত তিনজন একসঙ্গে কথা বলতে থাকবে)

চন্দ্রা—কত আশা ছিল পৃথিবীর লোক আমাকে চিনবে—

শশী—আঃ চুপ কর। আঃ—

বিধু—এঁ্যা—কি বলছেন? শুনতে পাচ্ছি না। জোরে বলুন।

শশী—কে কথা বলছে?

বিধু—শুনতে পাচ্ছি না। (ফোনে) এঁ্যা? হ্যা—ন্-আ-া-া-া-া হ্যা?—ন্-আ-া-া-া-া। হ্যা - - - ন্-আ-া-া-া-া! (ফোন রেখে দিল)

শশী—কে কথা বলছিল?

বিধু—জানি না।

শশী—তবে এক ঘণ্টা ধরে কি 'হ্যা-না' করছিলে?

বিধু—কে একজন জানতে চাইছিল এটা শেয়ালদা স্টেশন কিনা।

চন্দ্রা—বিধুদি, আজ একজন ভদ্রলোক আমাদের সংগে খাবেন। ব্যবস্থা ঠিক থাকে যেন।

বিধু—রাতে?

চন্দ্রা—না এখুনি।

বিধু—তা আমাকে একটু আগে বললে কি হয়? (দ্রুত প্রস্থান)

শশী—কে খেতে আসবে আবার?

চন্দ্রা—আমার পুরোনো দিনের একজন বন্ধু—হিমু হোম।

শশী—কি কি বললে?

চন্দ্রা—হিমাংশু হোম। সবাই তাকে হিমু হোম বলে। আমি যখন স্টেজে ছিলাম—তখন ছিল আমাদের সংগে। এখন সে একজন মস্ত গাইয়ে। সারা ভারতজোড়া নাম। কাল পথে দেখা হল। আমি তাকে আজ খেতে বলেছি।

শশী—আবার তুমি আরম্ভ করেছ? বিয়ের পর যত থিয়েটারের লোকে বাড়ি ভর্তি করে রাখত। তাদের যখন তাড়ালাম—তুমি

তখন আমার দুই মেয়ের মধ্যে তোমার ঐ সর্বনেশে থিয়েটারে প্রীতি ঢোকালে! তার ফলে তারা দুজনে দুটো অভিনয় জগতের জাম্বুবানকে ধরে বিয়ে করল। কি অপরাধ আমি করেছি বলতে পার?

চন্দ্রা—না, তুমি কোনও অপরাধ কর নাই। সব অপরাধ আমার। আমায় দাঁতে কুটো কেটে হেঁট হয়ে বলতে হবে—"যো হুকুম।" তুমি তোমার সাধারণ পৃথিবী থেকে কোনও দিন বাইরে দেখেছ? শেয়ার, লোহা আর টাকা ছাড়া আর কিছুর দিকে তাকিয়েছ? আমাকে একদিনের জন্যেও বিদেশে নিয়ে গিয়েছ, বেড়াতে নিয়ে গিয়েছ? তোমার মেয়েরা আমার জন্যে অমনি ঝকঝকে ছেলেগুলোকে বিয়ে করেনি—করেছে তোমার হৃদয়হীন, একঘেয়েমি জীবনযাত্রার জন্যে। তোমার প্রথম স্ত্রী তোমাদের কম্বুলীটোলার এঁদো বাড়িতে থেকে থেকে আলো হাওয়া রোদ না পেয়ে মরে গেছে। গেছ নিয়ে তাকে কোনও দিন বাড়ির বাইরে? আমি বলে তাই বেঁচে আছি। আমি বলে তাই মুখ বুঁজে অত্যাচার সহ্য করছি!

শশী—আমার একঘেয়েমি জীবনযাত্রার জন্যেই এই বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে, তোমাদের ফ্যাশান হয়েছে, শাড়ি হয়েছে। আর তোমার ঝকঝকে ছেলে দুটোর টাকা চাইবার সুযোগ হয়েছে। তুমি যার জায়গায় এসেছ তার সংগে তুলনা কোর না নিজেকে। সে দেবী ছিল।

চন্দ্রা—তাই বুঝি প্রতিদিন তার সংগে ঝগড়া করতে!

শশী—আমি কখনও ঝগড়া করতাম না। সেই তার অভাব নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরত!

(টেলিফোন বাজল। চন্দ্রা ধরল। খুব মিষ্টি করে বলল)

চন্দ্রা—না, না, শেয়ালদা স্টেশন নয়। (পরক্ষণেই রণরঙ্গিণী)—তুমি তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছ। কতদিন সে আত্মহত্যার কথা বলেছে ?

শশী—কে বলল ? কে বলল, তোমায় এসব কথা ?

চন্দ্রা—সত্যি করে তাই করেছে কিনা কে জানে ?

(আড় চোখে দেখল কাজ হয়েছে। শশীবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।)

শশী—তোমার এই বন্ধুটি কি উদ্দেশ্যে আসছেন ?

(সিঁড়ি দিয়ে সুধা নেমে এল। তাকে দেখে)

—কে হে বাপু তুমি বলা নাই কওয়া নাই—সুধা !! হায় ভগবান, এও দেখতে হল! এমন জামাকাপড় পরেছিস কেন ? উঃ !

সুধা—বাবা, আমি জানতে এসেছি, তোমার কোনও মেয়ে যদি বিপদে পড়ে তুমি সাহায্য করবে ?

শশী—নিশ্চয়ই করব। দেড়েলটা বুঝি তোকে ত্যাগ করে পালিয়েছে ?

সুধা—কেউ আমাকে ত্যাগ করেনি। আমি নিজের দরকারে এসেছি। বাবা, আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে কিনা ?

শশী—(চন্দ্রাকে)—ওদের বিয়ের সময় তুমি বলেছিলে নাটক লিখে ও প্রচুর রোজগার করবে। এই পোষাকটা কি তার মাথা থেকে বেরিয়েছে—না তোমার ?

সুধা—আমার কথার উত্তর দাও।

শশী—যদি বলি, একটা নয়া পয়সা পর্যন্ত দেব না ?

সুধা—তাহলে এই মুহূর্তে তোমার বাড়ি থেকে চলে যাব !

চন্দ্রা—আঃ, সুধা কি করছিস ? তোমার কি ভীমরতি ধরেছে ? মেয়ে বাড়ি এলো বিয়ের পর—করছে দেখ। এই জন্যেই তো মেয়েরা তোমাকে পছন্দ করে না।

শশী—মেয়েদের পছন্দের থোড়াই কেয়ার করি আমি। দু দুটো মেয়ে একেবারে জলে পড়ল! এখন ছোট মেয়েটার তাড়াতাড়ি একটা ভালো পাত্র জোটাতে পারলে হয়। তার বয়েস বাড়বার আগেই বিয়ে দিতে হবে। নইলে যে দৃষ্টান্ত চোখের সামনে দেখছে—

(চন্দ্রা ও সুধা পরস্পরের দিকে তাকালেন)

—কি, মুখ তাকাতাকি করছো কেন? কি হয়েছে?

সুধা—বলে দাও না ছোট মা—অত লুকোচুরির কি আছে?

শশী—হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি শুনব।

চন্দ্রা—তোমার ছোট মেয়ে প্রেমে পড়েছে।

শশী—জ্যোৎস্না!!

চন্দ্রা—হ্যাঁ।

শশী—সে যে একেবারে ছেলেমানুষ! ইস্কুলে পড়ছে!

চন্দ্রা—তাতে কি?

শশী—মাত্র আঠারো বছর বয়স!

চন্দ্রা—তোমার প্রথম স্ত্রীর ওই বয়সে সুধাও জন্মেছে।

শশী—উঃ কি ভয়ানক! ছেলেটির বয়স কত?

চন্দ্রা—একচল্লিশ।

শশী—কি—কি বললে? কে সে? তার নাম কি? তাকে আমি পুলিশে দেব। বদমাস কোথাকার। বালিকা হরণে বড় কঠিন সাজা হয়। শুয়ার কোথাকার।

সুধা—বাবা, তুমি নামটা না শুনেই চেঁচাচ্ছ। নামটা শোন।

শশী—নাম? বেশ নামটাই শুনি। কি তার নাম? জহরলাল নেহরু, বিধানচন্দ্র রায়, না জি. ডি. বিড়লা?

চন্দ্রা—তার নাম হিমু হোম।

শশী—সে কে ?

সুধা—বাবা, তুমি হিমু হোমের নাম শোন নি ? অতবড় একজন লোক ! ছোটকীর কি ভাগ্য !

শশী—ও, যাকে আজ তুমি নেমন্তন্ন করেছ সেই হতভাগা ?

সুধা—ছোট মা—হিমু হোম আজ খেতে আসবে ? কই—বল নি তো এতক্ষণ। বিধু মাসী, ও বিধু মাসী—

শশী—আসুক একবার হারামজাদা। ওরই একদিন কি, আমারই একদিন !

চন্দ্রা—শোন। পাগলের মত একটা কাণ্ড করে ফেল না। জ্যোৎস্নাকে জান তো হয়ত ছাত থেকেই লাফিয়ে পড়বে।

শশী—উঃ ভগবান ! (বিধুর প্রবেশ।)

বিধু—কি গো ডাকছ কেন ?

সুধা—বিধু মাসী, হিমু হোম এখানে ভাত খাবে।

বিধু—হিমু হোম ? সত্যি ! ওঃ আমার কি ভাগ্যি ! দেখ তো, আগে বলতে হয়। দেখি পোলাও করতে পারি কিনা।

(প্রস্থান)

সুধা—আমি যাই তৈরি হয়ে নিই গে। ছোট মা কি রঙ পছন্দ করে হিমু হোম ?

চন্দ্রা—নীল।

সুধা—বেশ হবে। জ্যোৎস্নাকে কেবল বলব—ছোট মা বলেছে নীল কাপড় পরে খেতে যেতে। ভারী মজা হবে। (প্রস্থান)

শশী—ইন্দুর চাই পাঁচ হাজার টাকা। সুধার চাই পাঁচ হাজার টাকা। আর জ্যোৎস্নার হবু স্বামীটির ক' হাজার চাই ?

চন্দ্রা—সে তোমার টাকার তোয়াক্কা করে যেন। তার ওপর জ্যোৎস্না তাকে ভালবাসে সত্যি—কিন্তু ও জ্যোৎস্নাকে মোটেই

ভালবাসে না। এমন কি জ্যোৎস্না যে ওকে ভালবাসে তা ও জানেই না।

শশী—তবে ওকে নিয়ে আসছ কেন ?

চন্দ্রা—জ্যোৎস্না ওকে একবার দেখলে আর ভালবাসবে না। ভারী কুৎসিত দেখতে। আচ্ছা, তুমি আমার ওপর একটু নির্ভর কর না, তোমার অমত থাকলে বিয়ে হতে দেব না।

শশী—প্রত্যেকবার তুমি ওই কথা বলেছ।

চন্দ্রা—ত' অন্যায় অমতই বা তুমি করবে কেন ?

শশী—অন্যায় অমত। মোট কথা, এইবার আমি সমস্ত ব্যাপারটাতে নিজের ওপর নির্ভর করব। (টেলিফোনে)—হ্যালো—হ্যালো কে ? মধুসূদন, হরি আছে ? নিত্যানন্দ ? একটা জরুরী কাজ করতে হবে।

(টেলিফোন রেখে দেন)

চন্দ্রা—তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, আমি বুঝতে পারছি না।

শশী—ব্যস্ত হচ্ছি কেন ? মানুষ ব্যস্ত হয় কখন ? যখন সে জলে ডোবে, যখন তার ঘরে আগুন লাগে। আমার কপালে—আর আমার ঘরে আগুন লেগেছে। আমিও জলে ডুবছি। তিন তিনটে মেয়ে প্রত্যেকটাকে তুমি নষ্ট করেছ। বড় দুটো তো আমার হাতের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু ছোটটাকে আমি যেমন করে হোক বাঁচাব। তার জন্যে খুন করতে হয়—করব। ফাঁসী যেতে হয়—যাব।

চন্দ্রা—কি পাগলের মত বকছ ?

শশী—পাগলের মতই তো শোনাবে। আমার বাড়ীতে ডাকাতদল আসছে মেয়ে চুরি করতে—আর আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে

থাকব ? তুমি আর তোমার বন্ধুর দল সকলকে তাড়াব, তারপর খালি বাড়িতে আমি একা শান্তিতে থাকব।

(চীৎকার করে যেতে লাগলেন। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।)

(সমানে চেঁচাতে চেঁচাতে)—এটা লণ্ডন, এটা আন্দামান দ্বীপ, এটা লঙ্কা। আজ্ঞে না, শেয়ালদা স্টেশন নয়।

(দরজায় হিমাংশু হোম। বেঁটে মোটা কুৎসিত চেহারা। মুখময় বসন্তের দাগ আর বিরাট একজোড়া গোঁফ। গলাটি খুব মিষ্টি—আর ব্যবহারটি খুব ভাল।)

হিমাংশু—ভেতরে আসতে পারি ?

চন্দ্রা— } এস, এস—
শশী— } না, খবরদার—

হিমাংশু—ভেতরে আসব ?

চন্দ্রা—নিশ্চয়ই

শশী—কক্ষণো।

(হিমাংশুর এক পা ভেতরে এক পা বাইরে।)

হিমাংশু—ভেতরে যাব ?

(চন্দ্রা বা শশী উত্তর দেবার আগেই আওয়াজ হল —ওফ্। দুজনে তাকালেন—বিধুমুখী বিগলিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবার আওয়াজ হল—'উফ্'। সকলে তাকালেন। সিঁড়ির ওপরে সুধা বিগলিত হয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর জ্যোৎস্না কাঁপতে কাঁপতে নেমে এল। সকলের পরণে নীল রঙের কাপড়।)

বিধুমুখী—(প্রবেশ করে) ওফ্ !!

সুধা—(সিঁড়ির ওপর থেকে) উফ্ !—ফ্ !!

জ্যোৎস্না—(নামতে নামতে)—

এ কি রূপে দিলে দরশন !
কবিনি অভ্যর্থনার আয়োজন।

(জ্যোৎস্না এসে দাঁড়াল হিমু হোম আর শশীবাবুর মাঝে। শশীবাবুর দিকে পেছন করে। হিমু হোমের চোখে জিজ্ঞাসা। জ্যোৎস্না কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল হিমাংশুর দিকে। হিমাংশু খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।)

জ্যোৎস্না—ছোট মা—আমার কি ভাগ্য ! (অজ্ঞান হয়ে শশীবাবুর গায়ে ঢলে পড়ল। শশীবাবু তাড়াতাড়ি ধরলেন। আর সকলে তাকিয়ে আছে হিমাংশুর দিকে। ১০ সেকেণ্ড সব একভাবে থাকল, তারপর হিমাংশু বাইরে থাকা পা-টাকে ভেতরে নিয়ে এল। সব আলো নিভে গেল। 'চাঁদের হাট'-এর সকাল বেলার আসর শেষ হল।)

দ্বিতীয় ভাগ

(সবে সন্ধ্যা হয়েছে। আলোগুলো জ্বলছে। ঘরে কেউ নেই। কেবল শশীবাবু সোফায় বসে আছেন। তাঁর পাশে Lemon Barleyর খালি বোতল আর গ্লাস। দুটো খালি কাপ। আর অসংখ্য সিগারেটের কুচি। শশীবাবু সিগারেট খান না। মনের জ্বালায় খেয়েছেন। তাঁর সমস্ত পরিপাটি চুল এবং বেশ অবিন্যস্ত। প্রাণপণে পায়চারি করছেন। ওপর থেকে কাঁদুনে সুরে হিমু হোমের গান ভেসে আসছে।)

হিমাংশু—(নেপথ্যে)—সেদিন যখন দেখা হল গোলাপ গাছের ধারে।
বুঝেছিলাম হারিয়ে তোমায় ফেলব চুপি সাড়ে ॥
চাঁদের আলোয় শিউলি ফুলের বনে।
মিলিয়ে গেলে দখিন হাওয়ার সনে ॥
তখন থেকে কেঁদে মরি বিরহের বালুচরে,
(হায়) কোথায় তুমি, কোথায় গেলে, আমায় আকুল করে!

শশী—উঃ ভগবান! উঃ ভগবান!

(গান শেষ হয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে জ্যোৎস্না তরতর করে নেমে এল। তার দু'চোখে জলের ধারা।)

জ্যোৎস্না বাবা। বাবা। তোমার বিচার করতে হবে। ছোট মা আর মেজদি কেন সব সময় ওর পাশে থাকবে?

শশী—তা—তা তুই কাঁদছিস কেন সেজন্যে মা?

জ্যোৎস্না—কাঁদছি? ওর গান শুনে। দেখলে না কেমন করে গাইল—'হায় কোথায় তুমি, কোথায় গেলে' আমার বলতে ইচ্ছে

কমল—এই যে আমি। কিন্তু ছোট মা এমন করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল যে বলতে লজ্জা করল।

শশী—ছোট মা, হিমু হোমের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল বুঝি?

জ্যোৎস্না—কেবল ছোট মা? বিধুমাসী পর্যন্ত। সেই যে তখন থেকে পোষা কুকুরের মত পেছন পেছন চলেছে থামেনি পর্য্যন্ত। এক ভাস্করবাবু খালি চীৎকার করছিল।

শশী—এঁ্যা? ভাস্কর চেঁচাচ্ছিল! বাঃ কুকুরটা তবে তো ভালো বলতে হবে। খুব বুদ্ধি আছে দেখি কুকুরটার!

জ্যোৎস্না—বাবা জান, ছোট মা আর ও দুজনকে 'তুমি' 'তুমি' করে কথা বলে।

শশী—হিমুর সংগে তোমার ছোট মার ছেলেবেলা থেকে আলাপ আছে কিনা সেজন্যে—

জ্যোৎস্না—আমি একবার 'তুমি' বলে ফেলেছিলাম। তা ছোট মা এমন করে উঠল। আচ্ছা বাবা, দুদিন পরে আমিই তো ওকে 'তুমি' বলব?

শশী—(দাঁত কিড়মিড় করে)—বলাচ্ছি।

জ্যোৎস্না—কি বললে বাবা?

শশী—কিছু না মা। তোমার শরীর ভাল নাই—তুমি একটু এই সোফাটায় শোও।

জ্যোৎস্না—বাবা, আমি যদি এখন মরে যাই বেশ হয় না?

শশী—সেকি কথা! ছি, ছি, ও কথা বলে না।

জ্যোৎস্না—বেশ হবে বাবা। ও এল আর আমি মরলাম। ও কেঁদে কেঁদে গান গাইবে। কি ফাইন হবে! ঠিক লয়লা মজনুর মতো। বাবা, আমাকে কবর দিও।

শশী—কি—কি বললি?

জ্যোৎস্না—ও সেখানে আসবে, বসে বসে কাঁদবে, আর রোজ ফুল দেবে।

শশী—কপালে আরও কত আছে!

জ্যোৎস্না—দেখ বাবা—ও আমার টানে এ বাড়িতে এল। তা ছোট মা আর মেজদি ওকে আগলে রেখেছে। উঃ কতক্ষণ নীচে এসেছি। এতক্ষণে হয়ত ওরা আমার নামে কত কি লাগাচ্ছে!

(হঠাৎ উঠে এক দৌড়ে ওপরে চলে গেল। শশীবাবু কিছুক্ষণ মাথা টিপে বসে থাকলেন। তারপর দরজার পাশে গিয়ে ডাকলেন।)

শশী—এই সুর্যি—সুর্যি। এবার পাঁচ প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয়। না, দু'টিন সিগারেট নিয়ে আয়, আর—আর—আচ্ছা যা।

(দরজার কাছে দেখা গেল খুব ভালো স্বাস্থ্যের একজন লোক। চেহারা একমুখ দাড়ি গোঁফে সমাচ্ছন্ন। গায়ে একটা মোটা মিলিটারী গেঞ্জি। পরণে একটা পুরানো প্যাণ্ট। জায়গায় জায়গায় তালি দেওয়া। নানা রং লেগে আসল রং ঢাকা পড়েছে। পিঠে মস্ত ঝোলা, হাতে মস্ত ব্যাগ, পায়ে মস্ত বুট জুতো। ইনি Sur-realist নাট্যকার মৃগাঙ্ক।)

মৃগাঙ্ক—Will you please hold the pose, sir? —Modern civilisation-এর torment-এর এমন প্রকাশ আর দেখিনি। এক মিনিট।

(ঝোলা ব্যাগ রেখে তার মধ্য থেকে একটা কাঠের বোর্ড আর খানিকটা মাটির তাল বার করল। Boardটা টেবিলে রেখে মাটির তালটাকে তার ওপরে ফেলে মূর্তি বানাতে লাগল।)

শশী—আপনি কে জানতে পারি ?

মৃগাঙ্ক—Most certainly ! আমি হলাম একটি Homo mapiens sapiens.

শশী—সেটা কি ?

মৃগাঙ্ক—আপনারা সহজ ভাষায় যাকে বলেন human being অর্থাৎ চতুষ্পদ নই।

শশী—প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু ক্রমেই সন্দেহ জাগছে।

মৃগাঙ্ক—আপনি নিশ্চয়ই শশীবাবু ? সুধা আপনার যা description দিয়েছিল তার থেকে অবশ্য আপনি slightly less normal. তা সেটা কিছু না। মেয়েরা বাপকে সাধারণতঃ একটু ভাল চোখে দেখে।

শশী—তুমি সুধাকে বিয়ে করেছ ?

মৃগাঙ্ক—বাহ্যত।

শশী—কি বললে—বাহ্যত ?

মৃগাঙ্ক—হাঁ। কারণ স্ত্রী পুরুষের একত্রে ঘর করার বাসনাকে আপনাদের অতি সভ্য-সমাজ সহ্য করতে পারে না। তারা চায় একটা sanction, একটা জনমতের প্রকাশ। বিয়ে আর ইলেকশানে তফাৎ নাই। তাই একটা অনুষ্ঠানকে আমায় মেনে নিতে হয়েছে যেটার কোনও দাগই আমার মনে পড়েনি !

শশী—তুমি বিবাহ স্বীকার কর না ? সুধাকে ত্যাগ করবে ? আমি তোমায় খরচ পত্র দেব।

মৃগাঙ্ক—আজ্ঞে না। আপনারা যেমন সহজে বিবাহ ত্যাগ এইসব কথাগুলো বলতে পারেন, আমরা তা পারি না। আমাদের বিশ্বাস আত্মিক সম্পর্কে। Freud যেটাকে বলেছেন Ego সেটা ঠিক তা নয়। সেই জন্যে আমরা এই মনোভাবটার

নাম দিয়েছি super-ego. অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় আমিত্ব। নিজত্বও বলতে পারেন।

শশী—আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না!

মৃগাঙ্ক—সহজ ভাষায় বলি। আমি আবার প্রায়ই ভুলে যাই যে, আমাব চার পাশে sea of mediocrity বা বেশী বুদ্ধি নাই যাদের তাদের সমুদ্র। যাক। সুধা এবং আমি আমরা পরস্পরকে স্বীকার করে নিয়েছি—সুতরাং যতক্ষণ আমাদের মধ্যে সেই ইচ্ছা থাকবে ততক্ষণ আমরা আপনাদের স্থূলভাষায় যাকে বলে—স্বামী স্ত্রী।

শশী—তা তোমাদের ভাষায় তার কি নাম?

মৃগাঙ্ক—Companion. সঙ্গিনী। যেমন বাঘের থাকে।

শশী—তোমার এটা কোন্ ধর্ম জানতে পারি?

মৃগাঙ্ক—Sur-realism.

শশী—কি? কি বললে?

মৃগাঙ্ক—Sur-realism.

(হাতের কাজ ঠিক হয়ে যাচ্ছিল এবার শেষ হল—একটা সরু লম্বা ব্যাপার।)

দেখুন দেখি পছন্দ হয় কিনা?

শশী—পছন্দ? এতো এখনও শেষ হয় নাই। না। এতো এখনও আরম্ভই কর নাই। এর আর কি বলব?

মৃগাঙ্ক—ওটা শেষ হয়ে গেছে। এইবার দেখুন এটা আপনার মতো হয়েছে কি না।

শশী—আমার মতো! দেখ বাপু—নিজেকে অবশ্য আমি খুব সুপুরুষ ভাবি না। তবে ওই রকম ধ্যাবড়া আমি—এটা কিন্তু স্বীকার করতে পারব না।

মৃগাঙ্ক—আরে কি মুশকিল! আমি সব সময় ভুলে যাই আপনারা হলেন mediocre intellect-এর লোক! আপনাদের চিন্তাধারা বেঁটে, ক্ষয়িষ্ণু! এখানে 'আপনি' বলতে আমি কিন্তু আপনার কথা বলছি না। বলছি আপনার আত্মার কথা!

শশী—কি বললে—আমার আত্মা ওই রকম দেখতে! দেখ বাপু—এতদিন তবু আত্মায় বিশ্বাস করতাম—কিন্তু তোমার সংগে কথা বলে এখন মনে হচ্ছে—আমার আত্মা নাই।

মৃগাঙ্ক—এইবার আপনাকে বোঝাব আপনার mediocre intellect চক্ষু ...দের কত কাছাকাছি!

শশী—(চটে) কি? কি? তোমার বেযাডামো সহ্য করেছি বলে ভেবেছ—তোমার গালাগালও সহ্য করব!

মৃগাঙ্ক—না, আপনি তো চটবেনই। এটা একটা pure intellectual demonstration. আপনার ভাল লাগার কথা নয়।

শশী—(স্তিমিত)—আচ্ছা দেখাও দেখি—কি দেখাবে।

মৃগাঙ্ক—এই দেখুন, আপনার আত্মার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নিলাম। তারপর সেটাকে এইটার সামনে জুড়ে দিলাম—

(কথা বলতে বলতে লম্বা মাটির তালের ওপর দিকটা ছিঁড়ে নিয়ে যেখানে সেটার পেট থাকা উচিত সেখানে জুড়ে দিল। তারপর কুকুর থাবড়ানর মত পিটটা থাবড়ে দিল। শশীবাবু নিজের গলায় হাত বোলালেন।)

বলুন দেখি কি হল?

শশী—কি হল?

মৃগাঙ্ক—আপনি বলুন।

শশী—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

মৃগাঙ্ক—ওটা একটা ঘোড়া হয়ে গেল।

শশী—ঘোড়া ?—কই, ঘোড়ার মতো তো কোনখানটা হয় নি। (চারপাশে ঘুরে দেখলেন।)

মৃগাঙ্ক—আহা দেখারও তো চোখ দরকার। আর Sur-realism তো কেবল চোখ নয় বুদ্ধি দিয়েও দেখতে হয়।

শশী—বুদ্ধি দিয়ে দেখতে হয় !

মৃগাঙ্ক—হ্যাঁ—বুদ্ধি দিয়ে দেখতে হয়।

শশী—(হঠাৎ এসে মূর্তিটাকে দুইদিকে দুই চাপড় মারলেন)—এইবার কি হল ?

মৃগাঙ্ক—আহা-হা—করেন কি ? করেন কি ? ওটা যে হাতী হয়ে গেল !

শশী—(মাটির তালটাকে নিদারুণ-ভাবে পেটালেন) এবার ?

মৃগাঙ্ক—কিছুই না—আপনি ছাড়ুন।

শশী—এবার এটা ভালুক হল।

মৃগাঙ্ক—কি করছেন মশাই। সারা সকালের পরিশ্রমটাই নষ্ট করলেন !

(মৃগাঙ্ক শশীবাবুর হাত থেকে মাটির তালটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। শশীবাবু সেটাকে নানা ভাবে পেটাতে লাগলেন আর বলে যেতে লাগলেন—)

শশী—এবার এটা একটা বাঁদর। এবার শুয়োর। এবার উল্লুক। এবার ছাগল—এবার গরু—এবার জলহস্তী। এবার—

মৃগাঙ্ক—ছাড়ুন। আপনি কিছুই জানেন না।

শশী—জানি না মানে ? এত সহজে যখন আর্ট সৃষ্টি হয়—তখন আমিও একজন artist এতদিনে মনের মতন কাজ পাওয়া গেল !

মৃগাঙ্ক—দেখুন, আপনাকে প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল insipid, এখন দেখছি আপনি moron. কোন রকম বুদ্ধির প্রাখর্য আপনি দাবী করতে পারেন না।

শশী—(মারমুখো) বদমায়েস, আমার বাড়ীতে বসে আমায় গালাগাল সুরু করেছ !

মৃগাঙ্ক—আপনাকে analyse করছি।

শশী—দাঁড়াও, তোমায় analyse করছি। আমিও তোমায় analyse করব।

(ঘরের প্রান্ত থেকে Lemon Barley'র খালি বোতলটা তুলে নিলেন, মৃগাঙ্ক একটা চেয়ার তুলে নিল।)

মৃগাঙ্ক—আত্মরক্ষা জীবের শ্রেষ্ঠ কাজ।

(এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে হিমু হোম ছুটে এলেন। পেছনে চন্দ্রা, জ্যোৎস্না, সুধা—সকলেই নীল শাড়ী পরিহিতা। বিধুমুখীর নীল শাড়ী নাই। সে একটা নীল গরম চাদর জড়িয়েছে এবং গল গল করে ঘামছে।)

হিমাংশু—মশাই, এটা তো আপনার বাড়ী ?

শশী—হ্যাঁ—তাই কি ?

হিমাংশু—এটাকে একটা পাগলা গারদ বানিয়ে রেখেছেন মশাই !

চন্দ্রা—ছিঃ হিমু—অমন করে বোল না। কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা।

সুধা—ছোটমা আপনাকে মাত্র কয়েকখানা গান গাইতে বলেছে।

বিধু—উঃ, উঃ কি গান !

হিমাংশু—কয়েকখানা ? গুনে গুনে ন' খানা গান গেয়েছি। সেকালে যখন আমায় কেউ চিনত না চেহারা দেখে পালাত—সেই সময় চন্দ্রা লোক ডেকে আমার গান শুনিয়েছিল। তাই বলে আমি কি গ্রামোফোন না আজকালকার ঐ থামতে না জানা Hifi যন্ত্র !

চন্দ্রা—হিমু, তুমি কয়েকটা মাত্র গান গেয়ে যে এমনি করে পালিয়ে আসবে আমরা ভাবি নি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

বিধু—উঃ উঃ কি গান !

হিমাংশু—উঃ—দয়া করে থামুন। দুপুর দুটো থেকে আপনার মুখে ঐ এক কথা শুনে আসছি—উঃ উঃ কি গান !

সুধা—আপনার লক্ষ লক্ষ অনুগ্রাহীর মধ্যে আমরা মাত্র কয়েকজন। আমাদের আপনি সহ্য করতে পারছেন না এক বেলায় জন্যে।

হিমাংশু—দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আমার অনুগ্রাহীদের সঙ্গে যদি বসবাস করতে হয়—গান গাওয়া ভুলে যাব। আর তাঁরা যদি আমাকে এই রকম অনুগৃহীত করতে আরম্ভ করেন তাহলে গান গাওয়া ছেড়ে দেব।

জ্যোৎস্না—(হঠাৎ সামনে এসে) আমি জানি—ওরা আপনাকে সারা দুপুর কষ্ট দিয়েছে।

(মৃগাঙ্ক পাইপ বার করে ধরাল)

হিমাংশু—সত্যি কথা বলব মশাই—এই ভদ্রমহিলার তবু নিজের ওপর দখল আছে। বয়স কম হলে কি হবে—উনি সব থেকে স্বাভাবিক।

বিধু—উঃ— (বাকিটা প্রাণপণে খেয়ে ফেলল।)

জ্যোৎস্না— (আকাশে উঠে গেছে) বাবা শুনলে ! হিমাংশুবাবু—আমি জ্যোৎস্না। আমি আজ সকালে আপনার সংগে কথা বলেছি নিউ থিয়েটার্স ডাকছে বলে !

হিমাংশু—এ্যাঁ !

শশী—কি বললি ?

জ্যোৎস্না—(ততক্ষণে চাঁদ হয়ে গেছে) হিমাংশুবাবু—আমি—আমি আপনাকে—

সুধা—
চন্দ্রা— } —ভালবাসি !

শশী—
মৃগাঙ্ক— } —কি ? কি বললে ?

বিধু—(আটকাতে পারে না) উঃ উঃ কি গান !

হিমাংশু—(জ্যোৎস্না দিকে তাকিয়ে বলে) না !

জ্যোৎস্না—হ্যাঁ। (হিমাংশু চার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দৌড় মারল দরজার দিকে। শশীবাবু আর মৃগাঙ্ক তাকে ঘ্যাঁক ধরে ফেলল)

মৃগাঙ্ক—দেখুন মশাই, আমি শুধু আপনার স্পর্ধা দেখছিলাম। মেয়েদের অপমান করে আপনি চলে যাবেন আমার সামনে থেকে ? মাপ চান বলছি—মাপ চান।

শশী—ছোট লোক, ইতর ! আমার বাড়ীতে এসে আমার মেয়েকে চুরি করে পালাবে ? বেরোও বলছি। বেরিয়ে যাও।

মৃগাঙ্ক—সুধার Sur-realist পোষাক কেন আপনি বদল করিয়েছেন ? লজ্জা করেনা আপনার মেয়েদের পোষাক সম্পর্কে আলোচনা করতে ?

শশী—আমার ঘর ভাঙ্গবার মতলব করেছ ? শুয়ার। আমার বউকে ফুসলাচ্ছ !

সুধা—ছিঃ বাবা—তুমি কি অসভ্য !

চন্দ্রা—তুমি না শিল্পী মৃগাঙ্ক ! ছিঃ।

বিধু—উঃ উঃ !

জ্যোৎস্না—বাবা মারবে যদি তো আমাকে মার। আমার দেহে আঘাত লাগলে তা আমার সহ্য হবে। মনের জ্বালার তুলনায় সে কিছুই নয়।

(হঠাৎ মনে পড়ে গেল সুধার সংগে শশীবাবুর ড্রমাসের আগের কথোপকথন। সম্পূর্ণ ভঙ্গী পাল্টে)

ওর সংগে পরশু বিয়ে না দিলে আমি আত্মহত্যা কোরব—তুমি বাবা সে পাপের ভাগী হবে।

(মৃগাঙ্ক subject পেয়েছে। হিমাংশুকে ছেড়ে দিল।)

শশী—উঃ ভগবান!

মৃগাঙ্ক—Brilliant, এই তো চাই!

সুধা—কি বললে? এই তো চাই!

হিমাংশু—মশাই, জোড়হাত করছি। আমায় যেতে দিন। আমার স্ত্রী আছে। ছেলেপুলে আছে!

জ্যোৎস্না—তাদের খুন করুন। আমি আপনাকে সাহায্য করব।

মৃগাঙ্ক—Classical! এই হল খাঁটি গ্রীক মনোভাব।

সুধা—খাঁটি মনোভাব—না?

চন্দ্রা—দেখ জ্যোৎস্না, হিমাংশু কি কুৎসিৎ!

শশী—হ্যাঁ, কি কুৎসিৎ।

জ্যোৎস্না—কোয়াসিমোদো কুৎসিৎ ছিল। শুধু কুৎসিত নয় তার পিঠে কুঁজ ছিল। তবু এসমেরাল্ডা তাকে চেয়েছিল। Othello কাফ্রী ছিল। তবু Desdemona তাকে চেয়েছিল। পিয়ের সুন্দর ছিল না—তবু Natasha তাকে ভালোবেসেছিল!

মৃগাঙ্ক—আঃ এটা টুকে রাখবার মতো! (কাগজ পেনসিল বার করে লিখতে লাগল।)

সুধা—মনে রেখ আমিও তোমার লক্ষ্য করছি।

চন্দ্রা—ওর বয়স অনেক বেশী।

শশী—হ্যাঁ। আমার থেকে সামান্যই ছোট।

হিমাংশু—(প্রাণের দায়ে) আজ্ঞে না।—আমি আপনার সমবয়সী।

জ্যোৎস্না—(মস্ত ভণিতা করে আরম্ভ করল) বাবা—

(বিধুমুখীকে সকলে ভুলে ছিল। সে হঠাৎ সকলকে ঠেলেঠুলে হিমাংশুর ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল।)

বিধু—আমাকেও দেখতে কুৎসিৎ। আমারও বয়েস অনেক।

(ঘরটা হঠাৎ নিস্তব্ধ হল। হিমাংশুর একটু সময় লাগল কথাটার মানে বুঝতে। বুঝতে পেরেই সামনে যে পড়ল তাকে ঠেলে ফেলে প্রাণের দায়ে ছুটে পালাল।)

হিমাংশু—ও রে-বা-বা-রে। (দ্রুত প্রস্থান)

মৃগাঙ্ক—বাঃ, This is a real masterpiece। আমি আপনার মূর্তি বানাব। (বিধুর মূর্তি গড়তে লাগলো।)

শশী—বিধু!

চন্দ্রা—বিধুদি !!

সুধা—বিধু মাসী !!!

জ্যোৎস্না—মাসী—(কাঁদতে লাগল) (বিধুও কেঁদে ফেলল)

মৃগাঙ্ক—(বিধুকে) আহা, কাঁদবেন না, কাঁদবেন না। এমনি করে দাঁড়ান দেখি। (দাঁড় করিয়ে দিল।)

শশী—ওই হিমু তোমকে দেখে মনে হয়েছিল—ওই বুঝি সবারই সেরা। কিন্তু তোমার তুলনা কিছুতে হয় না। ওকে যদি বা সহ্য করি—তোমায় এক মুহূর্ত সহ্য করব না। ছাগল কোথাকার!

মৃগাঙ্ক—আপনার complex কি জানেন ? আপনি একটি polimorpho-perverse.

চন্দ্রা—আমি যাব টিমুকে ফিরিয়ে আনতে ?

সুধা—চল না ছোটমা।

জ্যোৎস্না—তবে আমিও যাব।

শশী—খবরদার !

চন্দ্রা—(জ্যোৎস্নাকে) তুই কোথায় যাবি ?

জ্যোৎস্না—(বিধুর ব্যাপারে অবিশ্বাস ঘনিয়েছে) আমি তোমাকেও বিশ্বাস করি না।

সুধা—ছিঃ ছোটকী !

জ্যোৎস্না—শুধু ছোটমাকে নয়—আমি তোমাকেও বিশ্বাস করি না।

শশী—আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। (হঠাৎ সমস্ত রাগ পড়ল বিধুর ওপর) ঢং করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে ? রাতে কি খাওয়া দাওয়া হবে না নাকি ? বিধু যাও। বেরোও। রান্নাঘরে যাও।

মৃগাঙ্ক—তাই চলুন। সেখানে পরিবেশটা অনেক স্বাভাবিক হবে।

(বিধুর পিছনে মৃগাঙ্কর প্রস্থান)

জ্যোৎস্না—তোমরা ষড়যন্ত্র করেছ আমার পেছনে লাগবে বলে। আমার জীবনে কেবল বিষ ঢেলে দেবে বলে !

চন্দ্রা—বলিস না অমন করে। ছিঃ মা—লক্ষ্মী মা আমার।

সুধা—তোকে সাহায্য করতে গিয়ে যদি এমনি গালাগাল খেতে হয়—

জ্যোৎস্না—বেশ, আমি মরব। আমি ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে মরব। আমি যখন তোমাদের গলগ্রহ তখন বেঁচে থেকে লাভ কি ?

সুধা—একি ও কোথায় গেল ?

শশী—রান্নাঘরে।

সুধা—সে কি? (দ্রুত প্রস্থান করে সেই দিকে।)

জ্যোৎস্না—আমি মরব। হ্যা আমি মরবই।

(সোফায় শুয়ে কাঁদতে লাগল)

চন্দ্রা—কি করি বল তো? মেয়েটা কেঁদে কেঁদেই মরে যাবে।

শশী—বল, কি বলতে চাইছ? সকাল থেকে যা এ বাড়ীতে ঘটছে তাতে আমার মাথার ঠিক আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না।

চন্দ্রা—আমি বলি কি হিমুর সঙ্গেই ওর বিয়ে দাও।

শশী—দাও, দাও। আমার কিছুতে আপত্তি নেই। হিমুকে রাজী করাও। তার বউ ছেলে মেয়েগুলোকে খুন কর। তারপর মহা ধুমধাম করে বিয়ে দাও।

(যেন সে কথার প্রতিধ্বনিতে বাইরে প্রথমে সানাই বেজে উঠল। তারপর জগঝম্প। এবং তারপর বহু লোকের গলার গান ভেসে এল—রঘুপতি রাঘব রাজারাম ইত্যাদি)

কিসের আওয়াজ?

চন্দ্রা—দেখি। (দৌড়ে জানালায় গেলেন) ওগো কতো লোক আসছে। একটা গাড়ীকে ঘিরে আসছে।

(সুধা ছুটে এল। টেনে আনল মৃগাঙ্ককে। সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এল। শশীবাবু জানালার কাছে গেলেন।)

শশী—কি—কি ব্যাপার? ওরা আমার বাড়ী লুঠ করতে আসছে নাকি? সূর্য, আমার বন্দুকটা কই?

সুধা—বাবা, দিদি আসছে। ঐ দেখ, গাড়ী থেকে নামল।

শশী—ইন্দু আসছে? অত লোক নিয়ে কেন?

জ্যোৎস্না—বড়দি কোথায় ?

চন্দ্রা—(চট করে পাকা গৃহিণী) কই ইন্দু এস। এস। শশধর আসেনি ? সে কই ?

(শশীবাবুর বড় মেয়ে ইন্দু এল। film starএর বউ। গিল্‌টি গয়নায়, রঙ, লিপষ্টিকে নিজেই প্রায় তারকা পর্যায়ে উঠে গেছে। গায়ের রঙ খুব ফরসা। ইদানিং বেজায় মোটা হয়ে গেছে। মনটা অতি আধুনিক।)

ইন্দু—আসছে। ওকে চিনে ফেলা মাত্র লোকে এমন ছেঁকে ধরল যে কি বলব। সেই থেকে সঙ্গে সঙ্গে আসছে।

শশী—(আর্তনাদ) গেল, গেল—আমার বাগানটা গেল। হতভাগার আর বসবার জায়গা পেল না !

মৃগাঙ্ক—(ইন্দুকে দেখে মুগ্ধ) আঃ বাঃ।

ইন্দু—আরে ! সুধা ! তুই কবে এলি ?

সুধা—আজই।

ইন্দু—ইনি নিশ্চয় মৃগাঙ্কবাবু। ওঁকে দেখেই বুঝতে পেরেছি।

জ্যোৎস্না—বড়দি, কেমন আছ ?

ইন্দু—ভালো। তুই এত রোগা হলি কি করে ? জান ছোটমা আমরা কদিন এখানে থাকব। বাবা অমন করছে কেন ?

চন্দ্রা—ওর কথা ছেড়ে দাও। ও কোনদিন এই সমস্ত artistic মনোভাব বুঝতে পেরেছে ? তোমাদের ইলেকশানের কি হল বল ? শশধর হ'বল কি করে ?

ইন্দু—আর বল কেন ছোটমা। ওকে যেখান থেকে দাঁড় করান হল সেখানকার লোকেরা হিন্দি ছবি বেশী দেখে না। অবশ্য মেয়েরা ভোট দিয়েছিল। তাতে ছেলেরা খেপে গিয়ে উল্টো দিকে ভোট দিল। একজন তো মারামারিই করল !

সুধা—তোরা এখানে কতদিন থাকবি ?

ইন্দু—ওর একটা কণ্ট্রাক্ট হবার কথা আছে সামনের মাসে—সেটা হলেই চলে যাব।

শশী—সামনের মাসে ! উঃ ভগবান !

(এমন সময় রামচন্দ্র-শশধর ঢুকলেন। খুব সুন্দর নাদুস নুদুস চেহারা। আপাততঃ অনুরাগীদের মনোরঞ্জন করার জন্যে রামচন্দ্রের সাজ করেছেন। কেবল নাকে ষ্টিকিংপ্লাষ্টার আর মাথায় পট্টি। বড় বড় চুল কাঁধ পর্যন্ত। ঢুকেই তীর ধনুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।)

শশধর—চন্দ্রাদি। আপনাদের দেশের লোকগুলো কিন্তু বড়ো নাছোড়বান্দা। আমাকে পোষাক পাল্টান করাল—তবে ছাড়ল। ইনিই বুঝি রাজর্ষি জনক। নমস্তে।

শশী—(দাঁত কিড়মিড় করে) আর কত সহ্যশক্তি আমার !

শশধর—কি হল, উনি বোবা নাকি ?

জ্যোৎস্না—দেখো মেজদি, কি সুন্দর দেখতে !

সুধা—যাই বাবা বলুন—অদ্ভুত দেখতে !

জ্যোৎস্না—কতো লোক শুধু ওঁকে দেখবার জন্যে এতদূর এসেছে। (শশধরের কাছে গিয়ে) আপনাকে কি সুন্দর দেখতে ! আপনার চুলে একটু হাত দেব ?

সুধা—আপনার নাক, মাথা এখনও ফুলে আছে ! ব্যাণ্ডেজটা ঠিক করে দেব।

(দুজনে শশধরের পরিচর্যা করতে লেগে গেল।)

শশী—উঃ আর কতক্ষণ !

মৃগাঙ্ক—(ইন্দুকে) দেখুন আপনাকে একটা কথা বলি। Rembrandtকে আমরা মস্ত বড়ো শিল্পী বলে মনে করি না। কিন্তু একটা বিষয়ে সে genius, তার থেকে সেরা কেউ নেই।

ইন্দু—কি সুন্দর তুমি কথা বল ভাই।

মৃগাঙ্ক—কি বিষয়ে বলব? Rembrandt যত nude এর ছবি এঁকেছেন তারা সকলেই খুব স্বাস্থ্যবতী। আমাদের কালের মেয়েরা বলবেন—মোটা। আমি তাই ঠিক করেছিলাম—যদি কখনো nude থেকে মূর্তি গড়ি তাহলে অমনি স্বাস্থ্যবতী নারীর মূর্তি গড়ব। আপনি হলেন প্রথম যাকে দেখে আমার nude মূর্তি করার ইচ্ছা প্রবলভাবে জেগেছে।

ইন্দু—আমার কি সৌভাগ্য। আমি এখুনি রাজী। এখানেই?

মৃগাঙ্ক—চলুন ঐ জানালাটার পাশে যাই। ওখানে আলোটা ভাল।

(মৃগাঙ্ক তার সরঞ্জাম জানালার পাশে নিয়ে গেল। ইন্দু কাপড় খোলবার জন্যে প্রস্তুত।)

শশী—(মাথা ধরে) সূর্যি, আমার বন্দুক। ওরে ভাস্কর বাবুকে দিয়ে যা।

চন্দ্রা—(ঝাঁঝিয়ে উঠল) কি গোলমাল করছ? এতদিনে তোমার বাড়ী সত্যিকারের সংস্কৃতির, কৃষ্টির, কাব্যের, শিল্পের কেন্দ্রভূমি হয়ে দাঁড়াল।

(বিধুমুখী ঢুকে রামচন্দ্রকে দেখে মুগ্ধ)

বিধু—জয় রাম। (প্রণাম করতে লাগল।)

চন্দ্রা—(আগেকার রেশেই বলে চলল) আজ এখানে কেবল art—কেবল সূক্ষ্ম অনুভূতি! কেবল রসের জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ—

শশী—(মৃগী রোগীর মত মাথা নাড়তে লাগলেন) উঃ ভগবান, আল্লা, god! ওই আমাদের ভবিষ্যৎ। তবে বর্তমান—!

(গোঁ গোঁ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।)

নৃযজ্ঞ

চরিত্রলিপি

মা * মেয়ে * বউ

আর

সদানন্দ

---

* চলন্তিকায় নৃযজ্ঞ কথাটার মানে—'অতিথি সংকাররূপ যজ্ঞ।'

নৃযজ্ঞ

এক সহর থেকে অন্য সহরে যাবার মাঝে বড রাস্তার ধারে একটি চায়ের দোকান। একখানা ঘর আছে ভাড়া দেবার জন্যে। দরকার হলে পথিকরা রাতটা কাটিয়ে যেতে পারে। শীতকালের বাদলা রাত্রি। ঝোড়ো বাতাস বইছে।

চায়ের দোকানের পাশের ঘরটাতে মা ও মেয়ে থাকে। দোকানের দিকের টিনের দরজা খোলা—সেই দিক থেকে ধাবমান লরীর আওয়াজ আর হেড্‌লাইটের আলো মাঝে মাঝে আসছে। পেছনের দিকে ভাড়া দেবার ঘরের বন্ধ দরজা দেখা যায়। একটি বছর চোদ্দ বয়সের ছেলের ছবিতে মালা ঝোলানো আছে। মা তাকিয়ে আছে ছবিটার দিকে। মেয়ে হাতের সোনার হাতঘড়িটা নাড়াচাড়া করছে লোভীর মত।

মেয়ে—ঘড়িটা সোনারই। লোকটার টাকা আছে।

মা—তোর দাদাকে মনে পড়ে খুকী ?

মেয়ে—না না না। কতবার বলব। সন্ধ্যেবেলা থেকে সেই এক কথা। 'আজ তোর দাদার জন্মদিন।' উঃ।

মা—সে থাকলে আমাদের আজ কোন দুঃখ থাকত না।

মেয়ে—না তা কি আর থাকত। পাটরাণীর মতো থাকতে !

মা—তোর মুখে কি মিষ্টি কথা আসেনা ?

মেয়ে—কেমন করে আসবে ? পুরুষ মানুষ হয়ে সে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল, লজ্জা করল না !

মা—আজ হোল ঠিক আঠারো বছর আগেকার কথা। তোর বয়স তখন কতো ? সাত আট বছর হবে না ?

মেয়ে—সাত আট কেন বিশবছর হবে। আশ্চর্য মা, যে তোমাদের ফেলে পালিয়ে গেল, যার শোকে একবছরের মধ্যে বাবা মারা গেলেন—তার জীবনের প্রতিটি ক্ষণের হিসেবে তোমার আছে। আর আমি সুখে-দুঃখে তোমার সর্বদার সাথী আমার বয়েসটাও মনে রাখনা!

মা—আরও কম ছিল তোর বয়েস? কি জানি মনে পড়ছে না।

মেয়ে—মনে রাখার দরকার কি। বাবা মারা যাবার পর থেকেই আমি ন' তোমার সমবয়সী।

মা—খোকা তোকে খুব ভালবাসত।

মেয়ে—তাই চার বছরের বোনকে ফেলে পালাতে বাধল না।

(মা উঠে গিয়ে ফোটোটার গায়ে হাত রাখল।)

মা—খোকা হয়তো বেঁচে আছে।

মেয়ে—তাই আঠারো বছরের মধ্যে খবর দেবার সময় হলনা।

মা—হয়তো তার বৌ আছে—ছেলে হয়েছে।

মেয়ে—এই রাত বারটার সময় বসে তুমি সেই ভাবনা ভাব।

মা—তোর ভাবতে ইচ্ছে করেনা?

মেয়ে—কাজ হাতে থাকলে করেনা।

(কাজের কথায় মা সচকিত হয়ে ওঠে)

মা—উঃ কি শীত করছে। (দরজাটা বন্ধ করে দিল)

মেয়ে—(ঘড়িটা দেখায়) দেখেছ? (মায়ের চোখে লোভ ঘনায়)

মা—সোনার না কি রে?

মেয়ে—সবটা। (ব্যাগটা দেখিয়ে) এটাও।

মা—বড়লোক।

মেয়ে—বড়লোক হলে কি আর এখানে উঠত? তবে পয়সা আছে।

মা—একটু পাগলও আছে। কি যেন বিড় বিড় করছিল।

মেয়ে—আমি শুনেছি। 'কেউ চিনতে পারে না—কেউ না'।

মা—আমার মনে হয় লোকটা চোর। কেমন চুপি চুপি এল দেখলিনা।

মেয়ে—যা খুসী হোক। পয়সা থাকলেই হল।

মা—হুঁ।......(কিছুক্ষণ চুপচাপ) ঘুমিয়েছে ?

মেয়ে—ঘুমের ওষুধ দিয়েছি না চায়ের সঙ্গে।

মা—আমি ওর মুখের দিকে তাকাই নি।

মেয়ে—আমি দেখেছি। কেমন যেন আফিংখোরের মত ঝিমুনো দৃষ্টি।

মা—আফিং খেলে তো ভাল। তার ওপর ঘুমের ওষুধ খেলেই কাজ হয়ে যাবে। আমাদের আর কিছু করতে হবেনা।

মেয়ে—চা দিতে গিয়ে দেখি জানালাটা খুলে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে। হাওয়াতে চুলগুলো উড়ছে, চোখ দুটো মরা মানুষের মত। আমাকে দেখে কি যেন বলতে চাইল। বোধ হয় গায়ে হাত দিতে ইচ্ছে ছিল। কি অসভ্য। শেষে বললে—চা এনেছ দাও।

মা—লোকটা তা হলে একেবারে বদমায়েস। ও মরলে কারু ক্ষতি হবে না।

(দমকা হাওয়ায় টিনের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। ভেতর ঘরে কাঠের জানালা খুলে যাবার আওয়াজ হল।)

মেয়ে—(টিনের দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিতে দিতে) ও ঘরের জানালাটা বন্ধ করে এস মা—বোধ হয় খুলে গেল।

(মা দরজা পর্যন্ত গেল। তারপর থমকে দাঁড়াল।)

মা—তুই-ই যা। আমি ততক্ষণে দেখে আসি পাহারাওয়ালাটা কত দূরে।

(একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে টিনের দরজা খুলে চলে গেল। মেয়ে পেছনের দরজা খুলে ভেতরে গেল। দমকা বাতাসে ছেলের

ছবিটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। একটা লরীর হেড্‌লাইটের আলোতে ছবিটা ভৌতিক হযে উঠল। সেই আলোতেই মেয়ে এসে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল।

তারপর নিজের গলা থেকে নীচের দিকে ধীরে ধীরে হাত-দুটোকে বুলাতে লাগল। স্তনের ওপর আর জানুর ওপর হাত দুটো শুধু মুহূর্তকাল থাকল।)

মেয়ে—লোকটা দেখতে বেশ। আমি যদি সব কথা বলি, আমাকে বিয়ে করবে?

(একটা আয়না তুলে মুখ দেখতে লাগল)

এমন কিছু খারাপ দেখতে নয় আমাকে। তার ওপর আমি আজও কুমারী।......সেই বাস ড্রাইভারটার মত হেসে উঠবে, বলবে, বিয়ে কেন, এমনি এস। হতভাগা।

(টিনের দরজা খুলে মা এসে ঢুকল।)

মা—পাহারাওয়ালাটা কোনখানে নাই। বোধহয় বৃষ্টিতে বেরোয় নাই।

মেয়ে—লোকটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

মা—ও।

মেয়ে—সেই যে বুড়োটা রাত্রে মরেছিল, অনেকটা তার মত দেখতে।

মা—তার কেউ নয় তো?

মেয়ে—হলে জিজ্ঞেস করত।

মা—যদি চুপি চুপি এসে থাকে।

মেয়ে—সে বুড়োটা যে এখানে মরেছে জানবে কি করে?

মা—কেউ বলেছে।

মেয়ে—কে বলবে? জান শুধু তুমি আর আমি। সকালে দেখলাম বুড়ো মরে পড়ে রয়েছে, সঙ্গে অনেক টাকা—আমরা তাকে উঠোনে পুঁতলাম, টাকাগুলো নিয়ে নিলাম।

মা—(চারিদিকে তাকিয়ে) আঃ চুপ কর। কে শুনে ফেলবে।

মেয়ে—ভারি কেয়ার করি আমি।

মা—লোকটা যদি জেগে ওঠে?

মেয়ে—ও জাগবে একেবারে স্বর্গে গিয়ে।

মা—তোর মুখের কোন রাখ-ঢাক নেই। কোন্‌দিন বিপদে ফেলবি।

মেয়ে—তুমি সেকথা বলবে না? চিরকাল তোমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে আসছি না।

মা—বাঁচিয়ে আসছ! ভালো করে বিপদের মধ্যে জড়িয়েছ। এই সব মানুষ খুন করা······। (কথাটা কানে যাওয়া মাত্র চারিদিকে তাকিয়ে চুপ করে যায়।)

মেয়ে—(স্বৈরিণী আত্মম্ভরিতায়) চুপ করলে কেন? শেষ কর। কি হল? শেষ কর। এই সব মানুষ খুন করবার জন্যে আমি দায়ী। কিন্তু তাদের টাকাগুলো তুমি নাওনি? তাদের পয়সায় কেনা খাবার খেয়ে বেঁচে আছ না?

মা—পয়সা-পয়সা। টাকা পয়সা নেই বলেই না আমাকে দিয়ে তুই জোর করে এই সব করিয়েছিস।

মেয়ে—জোর করে!

মা—জোর করেই তো। বুড়োটা নিজে থেকে মরেছিল। তার পরের-টাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে তুই তো পিটিয়ে পিটিয়ে মারলি। তারপর আবার একটাকে।

মেয়ে—পিটিয়ে আমি একা মেরেছি? মুগুর দিয়ে মাথায় বাড়ি তুমি দাওনি?

আজ ভারি সাধু সাজা হচ্ছে। যখনই টাকার দরকার হয়েছে তুমি খুঁচিয়েছ আমাকে। তবে!

মা—তোর মত মেয়েকে আঁতুড়ে নুন দিয়ে মেরে ফেলা উচিৎ ছিল।

মেয়ে—ফেললেই ভালো ছিল। আমিও বাঁচতাম, তুমিও বাঁচতে।

(মা এসে চৌকিতে বসে পড়ল। ব্যথায় গোঙাল যেন। কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা)

মা—(আস্তে আস্তে) তোর দাদা থাকলে আমাদের এসব করতে হোত না।

মেয়ে—(খোঁচায়) হ্যাঁ সে থাকলে আমার রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিত আর সাত মহলা বাড়ী করত।

মা—তোর কি ভাল কিছু ভাবতে ইচ্ছে হয় না।

মেয়ে—না। বেঁচে থাকার জন্যে মানুষ পর্যন্ত মেরেছি। এক বেশ্যাবৃত্তিই বাকি আছে। তা করলেও তোমার আপত্তি হবে না।

মা—খুকী !!

মেয়ে—চেঁচিও না, তোমাকে চিন্‌তে আমার বাকি নেই। আমাকে পাপের পথে ঠেলে নিজে সাধু সাজতে সবাই পারে।

মা—(হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে) চুপ কর পোড়ারমুখী !

মেয়ে—(ভয় পায় না) আমার মুখ তো অনেকদিন পুড়েছে—কিন্তু সেই সঙ্গে তোমারও যে পুড়েছে, মনে আছে ?

মা—(সমান রাগে) ওই মুগুর দিয়ে একদিন তোরই মাথা ভাঙব।

মেয়ে—(খুব শান্তভাবে) তাহলে তো বাঁচি। তোমার ছেলের ডন-বৈঠক করার মুগুর দিয়ে বাইরের লোকের মাথা না ভেঙে যদি আমাকে মার, আমি অন্ততঃ বুঝে যাব, তোমার ছেলেকে তুমি ভালবাস।

মা—কি বললি ? আমার ছেলেকে আমি ভালবাসি না।

মেয়ে—না, তুমি তাকে ভাবতে ভালবাস। তার ছবিতে মালা পরাতে ভালবাস, তাকে নিয়ে পুতুল খেলা করতে ভালবাস।

মা—তুই—তুই একথা বললি !

মেয়ে—ভাব দেখি মা—আজ যদি তোমার ছেঁলে এসে হাজির হয়, কি বলবে তাকে ? বলবে কি তুমি বেঁচে আছ মানুষ-মারা টাকায়।

মা—সে বেঁচে থাকলে কবে ফিরে আসত। অন্ততঃ খবর দিত।

মেয়ে—তুমি আমার থেকেও অবিশ্বাসী।

(কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। দরজাটা খুলে খানিক ঝোড়ো-হাওয়া বৃষ্টির সাথে ঘরে ঢুকল। মেয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।)

জলটা জোরে এল।

মা—কি বল্লি ?

মেয়ে—বৃষ্টি পড়ছে।

মা—কটা বাজল কে জানে। (ঘড়ির কথায় তুজনেই সচকিত হয়ে উঠল। কিন্তু প্রাথমিক ইচ্ছেটা কারু নাই।)

মেয়ে—(সোনার ঘড়িটা দেখে বলে) একটা বাজে।

মা—(সচকিত) একটা ? তুটোর সময় তো প্যাসেঞ্জার বাসটা আসবে

মেয়ে—হুঁ।

মা—কেউ চা খেতে আসতে পারে।

মেয়ে—উনোন জ্বলছে।

মা—কেউ রাতে থাকতে আসতে পারে।

মেয়ে—মাঝ রাতে !

মা—বাসওয়ালারা সবাই জানে। বাদলা, রাতে কোন নষ্ট মেয়েকে নিয়েও স্ফূর্তি করতে ঘর ভাড়া চাইতে পারে।

(মেয়ে মায়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে।)

মেয়ে—ওই লোকটাকে আমি বিয়ে করব।

মা—ভারি আমার রাণী এলেন। তোর হুকুম শুনতে ওর বয়ে গেছে।

মেয়ে—(ছেলেমানুষের মত বলে) কেন মা, খুন করতে গেলে লোকে বলে আমায় যা বলবে তাই করব, খালি প্রাণে মেরনা। ওই লোকটাকে যদি আমি বাঁচতে দিই—আমাকে বিয়ে করবেনা ? আমি বলব, আমি এখনও কুমারী, সত্যি।

মা—সেই বাসওয়ালাটাকে তো বলেছিলি—তারপর কি হল মনে আছে ? আর এ তো পয়সাওয়ালা লোক।

(ঘড়িটা মেয়ের নাকের ডগায় তুলে ধরল।)

এই ঘড়ি যারা পরে তারা তোর মত রূপসীকে বিয়ে করেনা।

মেয়ে—(তখনও ছেলেমানুষী) মাথায় মুগুর ধরে যদি বলি।

মা—ও জেগে উঠলে তুই ওকে সামলাতে পারবি ? ঘুমোচ্ছে তাই।

মেয়ে—কিন্তু ওকে যে আমার পেতেই হবে।

মা—থাম। বুড়ো বয়েসে আর নাকে কান্না ভাল লাগেনা। এখনও যেন তুমি কচি খুকীটি আছ। বলি নিজের রূপের কথা কি মনে করিয়ে দিতে হবে। আমার মেয়ে বলে তোকে পরিচয় দিতেও লজ্জা হয়।

(মেয়ে তার মনের সঙ্গে যুদ্ধ হয়ে লড়াই করে। মা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ঘড়িটা দেখে।)

ঘড়িটা সোনারই। কতদিন থেকে সখ ছিল একটা সোনার ঘড়ি হাতে পরব।

(মেয়ের দিকে তাকাল। মেয়ে চুপ করে আছে দেখে ঘড়িটা নিজের হাতে বাঁধল।)

আমার হাতে কিন্তু মানিয়েছে। না রে ? (মেয়ে তখনও যুদ্ধ) কি রে তোর আবার কি হল ?

মেয়ে—ঠিক বলেছ মা। আমার কেউ বিয়ে করতে চাইবে কেন ?····· আমার কখনও এরকম হয় না, এ লোকটাকে দেখে কি রকম

যেন মনে হল। বোধ হল আমার নারী জীবন সার্থক হবে। ওকে আমি পাবই।······ (স্তব্ধতা)

(ভিন্ন গলায়) চল মা কাজ সেরে নি।

(মায়ের ভয় হল মেয়ের গলা শুনে।)

মা—ওকেও মারবি ?

মেয়ে—হ্যাঁ।

মা—আমি বলি থাক।

মেয়ে—না।

মা—আমাদের এখুনি টাকার দরকার নাই।

মেয়ে—কিন্তু সামনের তিনমাস কেউ না আসতে পারে।

মা—না আসুক।

মেয়ে—ও যখন বুঝবে ওকে ওষুধ খাইযে ঘুম পাড়ান হয়েছে, পুলিশ ডাকবে।

মা—পুলিশ।

মেয়ে—তোমার সব কীর্তি বেরিয়ে পড়বে।

মা—আজকে যেন বেশী ভয় করছে।

মেয়ে—মরণ !

মা—ওর হয়ত বৌ আছে বাড়ীতে। বয়েস তো বেশী নয় বললি।

মেয়ে—সেইজন্যেই ওকে আগে মারব। আমাকে যখন বিয়ে করতে পারবে না—ওর বেঁচে থেকে কি হবে ?

মা—তুই তো আর জিজ্ঞেস করিস নি। দেখনা বলে। বললি না তোর গায়ে হাত দিতে চাইছিল।

মেয়ে—ও মরলে কোন ক্ষতি নাই। বদমায়েস কোথাকার।

মা—তবুও বলে দেখতে পারিস। সবাই তো সমান নয়।

মেয়ে—উঠবে, না বসে বসে জাবর কাটবে।……না যদি উঠবে তো দাও ঘড়িটা খুলে দাও। (মা পেছিয়ে যায়।)

ঘড়িটা ফেরৎ দিতে হবে মনে রেখ।

মা—প্যাসেঞ্জার বাসটা আসতে কত দেরী ?

মেয়ে—তোমার হাতেই তো ঘড়ি আছে।

(উভয়ে ভেতরের দিকে চলে গেল। আগে মা পরে মেয়ে। দূরে একটা লবীর কনভয় আসার আওয়াজ উঠল। বাতাসে ঘরের আলোটা দুলতে লাগল। একটা মস্তবড় ছায়া ছেলের ছবিটার ওপর আসা-যাওয়া করতে লাগল। রুদ্ধ দরজায় ঝোড়ো বাতাসের বিকট আওয়াজ। প্রথমে মেয়ে বেরিয়ে এল। তার চেহারায় অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। মুখে একটা নিষ্করুণ কাঠিন্য। এক হাতে একটা কালো কম্বল, অন্য হাতে একটা মুগুর। পেছনে পেছনে মা এল। তার হাতেও একটা মুগুর। কিন্তু চেহারায় বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। কেমন যেন কুণ্ঠিত।)

মেয়ে—(ফিসফাসে) দেরী কোরোনা। তাড়াতাড়ি কর। সময় নেই বেশী।

(মেয়ে ভাড়া দেওয়া ঘরের দরজা সন্তর্পণে খুলে ভেতরে যায়। মা ঢুকতে গিয়ে চোখ পড়ে ছেলের ছবিটার ওপর—দাঁড়িয়ে যায়। মায়ের দেরী দেখে মেয়ে ফিরে আসে।)

কি করছ, তাড়াতাড়ি এস।

মা—শোন্।

মেয়ে—আঃ।

মা—এ ঘরে আয়।

মেয়ে—কি ?

মা—আজকে থাক।

মেয়ে—আবার সেই কথা !

মা—আজকে খোকার জন্মদিন !

মেয়ে—সেইজন্যে আজকেই আমাদের অনেক টাকা রোজগার করতে হবে।

মা—(কথাটা ভাল লাগে) মনে করব আজকের টাকা খোকাই দিয়ে গেছে।

মেয়ে—আর ঘড়ি।

মা—(লোভী ডাইনীর মত) হ্যাঁ, হ্যাঁ ঘড়িটাও খোকা দিয়ে গেছে।

মেয়ে—এস।

মা—চল্। (উভয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।)

(ক্রমে কনভয়টার আওয়াজ জোর হতে থাকল। তারপর বিকট শব্দে ঘরের পাশ দিয়ে যেতে থাকল। মা চকিত হয়ে বেরিয়ে এসে টিনের দরজা খুলে বাইরে দেখল। মটরের চলমান আলো মায়ের মুখের বীভৎসতাকে প্রকট করে তুলল। এবার তার মুখেও বদল এসেছে। আলো গিয়ে পড়ল ছেলের ছবিটায় —বাতাসে সেটা ভীষণ ভাবে দুলছে। মেয়ে ও ঘরের দরজা খুলে মুখ বাড়াল। মা কি বলল শুনতে পেল না। মা হাত নাড়ল, মাথা নাড়ল—তারপর তাড়াতাড়ি মেয়ের কাছে চলে গেল।

কনভয়ের সঙ্গে একটা ট্যাঙ্ক ছিল। তার ভীষণ আওয়াজ উঠল। বাতাস আর জল ঘরের মধ্যে ঢুকতে লাগল। টিনের দরজাটা দড়াম দড়াম করে পড়তে লাগল। হঠাৎ ছেলের ছবিটা মাটিতে পড়ে চুরচুর হয়ে ভেঙে গেল।

গাড়ীগুলো চলে গেল। ঘরটাকে বেশী অন্ধকার মনে হতে লাগল। কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। মেয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল।)

মেয়ে—দরজাটা খোলা কেন? (আলোটা নিবিয়ে দিল। মা এল।)

মা—এ কি ঘর অন্ধকার করলি কেন?

মেয়ে—চুপ। দরজাটা খোলা ছিল। (বন্ধ করে দিল।)

মা—সে কি!

মেয়ে—তুমি দরজার কাছটাতে দাঁড়াও। আমি দেখি।

(দুজনকে অন্ধকারে ভূতের মতন দেখাতে লাগল। মা দাঁড়িয়ে থাকল। মেয়ে চারদিক খুঁজে এল।)

মা—কাউকে পেলি?

মেয়ে—বোধহয় হাওয়ায় খুলে গেছে।

মা—চল্।

মেয়ে—কোথায়?

মা—পাচার করতে হবে না।

মেয়ে—হুঁ।

(মা মুগুর দুটো নিয়ে ভেতরে চলে গেল। মেয়ে চুপ দাঁড়িয়ে থাকল মৃতের ঘরের দিকে তাকিয়ে। মা ফিরে এল। উভয়ে ঘরে ঢুকল। প্রথমে মা বেরিয়ে এল। কাউকে বয়ে আনছে। মা ধরেছে পায়ের দিকে। জুতো জোড়া দেখা যাচ্ছে। আওয়াজ করে একটা লরী এসে থামল। বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজ হল। মা ভেতরে ঢুকে গেল—পরক্ষণে একা বেরিয়ে এল।)

মা—কে—কে—(গলার স্বরে স্বাভাবিকতা আনার চেষ্টা সত্ত্বেও ভয় প্রকাশ পাচ্ছে।)

পুরুষকণ্ঠ—আমি—আমি সদানন্দ।

মা—(একবার বন্ধ দরজার দিকে তাকায়—তারপর বলে) বড্ড শীত। কি চাও ?

সদানন্দ—আরে বাবা দরজা খুলবে না কি—ভিজে গোবর হয়ে গেলাম।

(টিনের দরজায় দুটো লাথি পড়ল)

খুলবে না দরজা ভেঙে ঢুকব ?

(মা গিয়ে দরজা খুলে দিল। আলো জ্বালল। সদানন্দ—লরী ড্রাইভার সামান্য মত্তভাবে ভেতরে এল।)

—যাবাঃ। মরে গিয়েছিলে নাকি ?

মা—কি চাই বাবা।

সদানন্দ—কি আবার চাই—চা-চা। ভিজে একেবারে শালার ঘণ্টা হয়ে গেছি।

মা—এখুনি এনে দিচ্ছি বাবা, জল চড়ানই আছে। (প্রস্থানোদ্যত)

সদানন্দ—খুকী কোথায় মাসী ?

মা—আছে বাবা, কাজকর্ম করছে।

সদানন্দ—এই রাতে, তুমি ঘুমুচ্ছ, আর সে কাজকম করছে ? কি কাজ মাসী ? (বন্ধ দরজার দিকে তাকায়) নাগর জুটেছে নাকি শালীর ?

মা—কি যে বল বাবা, তুমি তো জান খুকী আমার তেমন মেয়ে নয়।

সদানন্দ—চা দাও বাপু তাড়াতাড়ি। হিমে একেবারে জমে গেলাম।

মা—এই যাই। (প্রস্থান)

(সদানন্দ বন্ধ দরজার দিকে তাকায়—তারপর গিয়ে ডাকে)

সদানন্দ—খুকী—এই খুকী। খুলবি তো খোল বাবা, নইলে দরজা তোর এক লাথিতে ভেঙে দেব।

মেয়ে—(ভেতর থেকে) কি বলছ ?

সদানন্দ—বলছি তোর শালা নাগরের মুখটা দেখব।

মেয়ে—আঃ কেন বিরক্ত করছ। চলে যাও।

সদানন্দ—ওঃ ওঃ আমার বেলায় চলে যাও। আমি যেদিন বললাম আয় খুকী তোকে বাঁধী করে রেখে দেব—বলা হল বিয়ে না করলে আমাকে পাবে না। কোন্ শুয়ার কি বাচ্চা—

(দরজা খুলে মেয়ে বেরিয়ে এল। মেয়ের চেহারা দেখে প্রথমে সদানন্দ ভয় পেল। পরক্ষণেই তার বেপরোয়া ভাবটা এনে ফেলল।)

মেয়ে—কি হয়েছে অত চেঁচাচ্ছ কেন ?

সদানন্দ—আরে থাম। তোর মত মেয়ে আমার অনেক দেখা আছে। বারো সপ্তাহে বিশবার কলকাতা-আসানসোল করছি ওই শালা ভাঙা লরী নিয়ে— অত সহজে আমার চোখে ধুলো দেওয়া যায় কি না।

মেয়ে—কে তোমার চোখে ধুলো দিয়েছে ?

সদানন্দ—সর তো দেখি—তোর নাগরের বদনটা বিগড়ে দিয়ে আসি। শালা শুয়ার কি বাচ্চা—

(হাত গোটাতে থাকল)

মেয়ে—এ ঘরে আসতে তোমার সাহস আছে ?

সদানন্দ—থাম থাম।

মেয়ে—এ ঘরে একটা মড়া পড়ে আছে।

সদানন্দ—আমি না হয় শালার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেব সর—

(মেয়ে দরজা খুলে দেয়। সদানন্দ এক লাফে ভেতরে চলে যায়। একটু পরে বাইরে আসে, চুপসে গেছে। মাথা চুলকায়।)

তুই মেরেছিস ?

মেয়ে—হ্যাঁ।

সদানন্দ—(ভাবে) কত পেলি ?

মেয়ে—তিনশ ষাট টাকা। (কিছুক্ষণ চুপচাপ)

সদানন্দ— আমায় বিশ টাকা ধার দিবি – সামনের সপ্তাহে শোধ করব।

মেয়ে—বিশ কেন তোকে পঞ্চাশ টাকা দেব, যদি মড়াটাকে গোর দিয়ে দিস।

সদানন্দ—আমি ? আরে বাপরে—না।

মেয়ে—কেন আমি মারতে পারলাম আর তুই গোর দিতে পারবি না ? তুই আবার পুরুষ হবার বড়াই করিস।

সদানন্দ—(আত্মসম্মানে আঘাত লাগে) ভয় কিসের রে। তবে ওসব কাজ কি আর পঞ্চাশ টাকায় হয়। একশ পঞ্চাশ দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

মেয়ে—একশ পঞ্চাশ !

সদানন্দ—দারোগা পুলিশ হলে কতো হাঙ্গামা বল দেখি।

মেয়ে—হ্যাঁ পুলিশ হাঙ্গামা হলেই বেশী।

সদানন্দ—তবে ?

মেয়ে—তবে ?

সদানন্দ—আমায় টাকাটা দেওয়া কি বেশী ?

মেয়ে—তুই কি পুলিশে খবর দিবি নাকি ?

সদানন্দ—পয়সা না পেলে—

মেয়ে—সেটা ভালই হবে। আমি বলব তুই খুন করেছিস।

সদানন্দ—কি বললি ?

মেয়ে—একটা মেয়ে একটা পুরুষকে খুন করেছে কেউ বিশ্বাস করবেনা। তার থেকে আমার কাজ করে দে, উপরি মিলবে।

সদানন্দ—তাই বলে পঞ্চাশ টাকায় পারব না।

মেয়ে—আচ্ছা, তাহলে ষাট।

সদানন্দ—না না ভাওতি করিস না। পুরোপুরি একশ।

মেয়ে—না। ষাট।

সদানন্দ—আচ্ছা পঁচানব্বই-এ আমি রাজী আছি।

মেয়ে—আমি সত্তর থেকে এক পয়সা বেশী দেবনা।

সদানন্দ—আচ্ছা বেশ পঁচাত্তরে করে দেব তোর কাজ। চল্।

মেয়ে—চল্।

(উভয়ে ভেতরে গেল। তার পর মেয়ে বেরিয়ে এসে আগে নিভিয়ে টিনের দরজা বন্ধ করে ঘরে ফিরে গেল। মা চা নিয়ে ঢুকল।)

মা—সদানন্দ!

(পরক্ষণেই দরজা খুলে উভয়ে একটা ভারি বস্তুকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যেতে লাগল। একবার চৌকীতে দেহটা ধাক্কা খেল।)

মা—সদানন্দ !!

সদানন্দ—মাটিতে এত কাঁচ পড়ে আছে কেন রে খুকী ?

মেয়ে—বোধহয় ওই ছবিটা পড়ে ভেঙেছে।

সদানন্দ—(পায়ে ফুলের মালাটা লাগল।) বাবা ফুলের মালা কার ?

মেয়ে—ওসব মায়ের কাণ্ড। ওই ছবিটার ঘাড়ে ঝুলিয়েছিল।

(উভয়ের প্রস্থান)

মা দাঁড়িয়ে থাকল, মেয়ে এল)

মা —সদানন্দকে সব বললি কেন ?

মেয়ে—আমার বলতে বয়ে গেছে। ওই না জোর করে ঢুকল। আর জানলই যদি তো ওকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিলাম। অন্তত পুলিশের কাছে আর মুখ খুলতে পারবেনা।

মা—ভয় করছে।

মেয়ে—ভয় আবার কি ?

মা—ভীষণ ভয় করছে।

মেয়ে—তুমি চা-টা নিয়ে দাড়িয়ে আছ কেন। দাও। তুমি ততক্ষণ বিছানাটা তুলে ঘরটা পরিষ্কার করে ফেল। ত্নটো বাজতে আর দেরী নাই। (প্রস্থান)

(মা আলোটা জ্বালিয়ে প্রথমে ছবিটা তুলে রাখল। তারপর ভেতর ঘরে গিয়ে বিছানাটা নিয়ে এল। সেগুলো রেখে এসে মাটিতে পড়ে থাকা কয়েক ফোঁটা রক্তকে মুছে নিল। তারপর ঝাঁটা বার করে কাঁচগুলো ঝাঁট দিয়ে একপাশে করতে লাগল। বাইরে থেকে মেয়েব আর সদানন্দের মিলিত কণ্ঠের হাসি শোনা গেল। তারপর মেয়ে দৌড়তে দৌড়তে হাসতে হাসতে এল। তার মুখ-মাথা ভিজে।)

মেয়ে—হা-হা-হা। জান মা, সদানন্দটা এত খচ্চর! কি অসভ্য অসভ্য গল্পই জানে। হা-হা-হা—(তার বাসনাতপ্ত মন কামনায় ভরেছে) জান মা ওই মড়াটার কাপড-চোপড় খুলে ফেলেছে—বলছে কাপড়গুলো তো দোষ করেনি, দিব্বি পরা যাবে। তারপর —হা-হা-হা—তার পর সেই মড়াটার—হা-হা-হাহা—হা—

(মা শঙ্কিত হয়ে পেছনে তাকায়। সেখান দিয়ে ঘর্মাক্ত ও সিক্ত সদানন্দ আসে। খালি গা।)

সদানন্দ—কি রে খুকী পালিয়ে এলি যে?

মেয়ে—আমি আর যাব না। তুমি যা অসভ্য।

(তাকিয়ে থাকে, চোখে কামনা।)

সদানন্দ—যাবি না মানে, তোকে ধরে নিয়ে যাব।

মেয়ে—ধরনা দেখি—

(এদিক সেদিক ছুটে পালায়। সদানন্দ পেছনে ছোটে। শেষে সদানন্দ তাকে ধরে ফেলে পাঁজা কোলে করে তুলে নেয়—বলে—)

সদানন্দ—যাবি না মানে—এবার—

মেয়ে—ছেড়ে দাও বলছি—বেজায় সুড়সুড়ি লাগছে—ভাল হচ্ছে না—

(ছট ফট করে।)

সদানন্দ—দাঁড়া তোর ভাল হওয়াচ্ছি।

(একবার শুধু মায়ের দিকে তাকায়—তার পর ভাড়া দেবার ঘরের দরজাটা এক লাথিতে খুলে ভেতরে চলে যায়। ভেতর থেকে মাঝে মাঝে হাসি ভেসে আসে।

মা প্রথমে বসে থাকে তার পর দরজায় কান পাতে। ধীরে ধীরে কান্নায় ভেঙে পড়ে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

দূরে বাস আসার আওয়াজ হয়। মা উঠে একটা বড় কেটলী হাতে বাইরে চলে যায়। বাস এসে থামে। নানা ঘুমন্ত কণ্ঠের আওয়াজ হয়। কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে পাশের ঘর থেকে খালি হাসির আওয়াজ ভেসে আসে। হঠাৎ টিনের দরজা ঠেলে মা এসে ঘরে ঢুকল। তার পেছনে একটি সুবেশা তরুণী, বিবাহিতা। সুন্দর নয়, কিন্তু এই পরিবেশে মনে হয় সে যেন এক ঝলক সূর্যের আলো।)

তরুণী—আমি বলছি মা আপনার ছেলের বৌ আমি।

মা—না-না-না। চুপ কর। আমার ছেলে আজ কতবছর নিখোঁজ জান?

তরুণী—জানি মা—আমাকে সে সব বলেছে।

মা—কি বলেছে, কি জান তুমি?

তরুণী—বলেছে দারিদ্র্যের জ্বালায় অস্থির হয়ে সে পনের বছর বয়সে বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়।

মা—পনের নয় চোদ্দ বছর ছমাস। তার পর—

তরুণী—তাড়াতাড়ি বড়লোক হবার ইচ্ছায় সে চুরি করে।

মা—চুরি করে!

তরুণী—ছিঁচকে চুরি, ৯ মাস জেল হয়। সেখানে একজন ডাকাতের সঙ্গে আলাপ হয়। সে বলে তার সাকরেদী করলে, সব ডাকাতির ভাগের তিন আনা ও পাবে। তার পর ডাকাতি আর রাহাজানির দায়ে ওরা দুজনেই ধরা পড়ে। এবার ওর বার বছর জেল হয়। জেল থেকে বেরিয়ে—

মা—বারবছর জেল হয়। খুব কষ্ট হয়েছিল?

তরুণী—বোধহয়। কারণ সেকথা বলতে গিয়ে ওর চোখে জল আসত। ওর সব থেকে ভয় ছিল আপনারা যেন জানতে না পারেন। প্রায়ই বলত আপনার কথা।

মা—তার পর বৌমা তার পর—

তরুণী—জেল থেকে বেরিয়ে ও প্রতিজ্ঞা করল আর পাপ পথে যাবে না। কোলকাতাতে কিছুদিন থেকে মাদ্রাজ থেকে পঁচানব্বই মাইল দূরে গিয়ে চাক্‌রী নিল। কি হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটত। তার পর আমার বাবা মারা গেলেন। ওরা এক সঙ্গেই কাজ করতেন—বাড়াতে আমি একা। বাবা ওর হাত ধরে বলে গেলেন আমায় দেখা শোনা করতে। ও তার পরই আমাকে বিয়ে করল।

মা—কিন্তু তখন খবর দিলেনা কেন?

তরুণী—ও বলত আর খবর টবর না—এত টাকা রোজগার করে মায়ের পায়ে ফেলে দিয়ে আসব। তার পর একটি একটি করে ৩৬০৲ টাকা একটা—

মা—কত টাকা?

তরুণী—৩৬০৲ টাকা একটা ব্যাগে জমিয়ে বল্ল মায়ের প্রণামী।

মা—কিন্তু খোকা আসছে না কেন?

তরুণী—ও তো সন্ধ্যেবেলাতেই এসেছে। আমার দিদি থাকে উল্টো-ডাঙ্গায়, তাকে একটু দেখতে গিয়েছিলাম। ও বল্ল, তুমি পরে এস বাপু—আমার আর মাকে দেখার তর সইছে না।

(মায়ের মনটা অজানা আশংকায় কেঁপে উঠে।)

মা—আজকে সন্ধ্যের বাসে?

তরুণী—হ্যাঁ মা।

মা—কিন্তু আজ সন্ধ্যেয় এখানে তো কেউ আসেনি।

তরুণী—আসেনি? তা হতে পারে। যা লাজুক ও। ট্রেনে আসতে কতবার বলেছে কি করে বলব বলত—আমি মায়ের বুড়ো

খোকা। আমি বললাম—আমি বলব। আসার সময় জিজ্ঞেস করলাম—যাচ্ছ তো এতদিন পরে, মা যদি তোমাকে চিনতে না পারেন।

মা—(নিজের মনে সন্ধ্যায শোনা কথাগুলো বিড়বিড় করে বলে) কেউ চিনতে পারে না। সব বদলে গেছে। কেউ চিনতে পারেনা, কেউ না। সব বদলে গেছে।

তরুণী—কি বলল জানেন—বলল মা যদি তার ছেলেকে চিনতে না পারে—

মা—কি বলল ?

তরুণী—বলল, মা যদি তার ছেলেকে চিনতে না পারে, সে ছেলের মরে যাওয়াই উচিৎ।

মা—না-না। বালাই ষাট। ও সব কথা কেন বলে। ও এলে আমি ঠিকই চিনতে পারতাম।

(এবার জেনেশুনে নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা স্থুরু করে)

তাব ওপর এখানে, একটু দূবে দূরে তার কত জানাশোনা—হয় তো কোথায নেমে আলাপ করেছে।

তরুণী—মায়েব যেমন কথা। ত্নঘণ্টা বেশী আমার কাছে থাকলনা সেই ছেলে যাবে অন্যের সঙ্গে গল্প করতে !

মা—…আ…আমাদের বাড়ীটাও কত পালটে গেছে। চায়ের দোকান হয়েছে। ঘর ভাড়া পাওয়া যায়—লেখা হয়েছে……

(মা প্রাণপণে ভাগ্যকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে।)

তরুণী—এক হতে পারে আপনি চিনতে পারেননি দেখে—হয়তো রাগ করে চলে যেতে পারে। যা অভিমানী আপনার ছেলে।

(মা তাতেই রাজী)

মা—তাই হয়তো হবে! কিন্তু কেউ তো আজ……(বলতে যায় আসেনি, বলতে পারেনা)। উঃ ভগবান।

(মাথায় হাত বুলায়। তরুণী এবার ঘড়িটা দেখতে পায়। মুখটা খুসী হয়।)

তরুণী—মা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন কেন ?

মা—ঠাট্টা !! (চোখে কান্নার ঘনঘটা)

তরুণী—ওই তো ওর ঘড়ি। দেখি। হ্যাঁ ওরই তো। আমার বিয়ের সময় বাবার provident fund-এর টাকাতে ও কেনে। ওটা ওর খুব পছন্দ। বলত এটা আমার বিয়ের যৌতুক।

মা—(প্রায় চিৎকার করে ওঠে) এটা তার ঘড়ি !!!

তরুণী—কি হোল মা আপনি অমন করছেন কেন? শরীর খারাপ করেছে ? ওকে ডাকব ? ও কোথায় ? ওই ঘরে ?

(বন্ধ দরজায় প্রথমে ঠেলা দেয়। পরে আস্তে ধাক্কা দেয়।)

শুনছ। আর ঠাট্টা করতে হবেনা বাবা। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গিয়েছিল। এস। মায়ের শরীর খারাপ করছে। সত্যি বলছি। এরপর কিন্তু আমিও রাগ করব হ্যাঁ।

(ভেতরে নানারকম শব্দ হোল। তারপর অবিন্যস্ত বাসে, এলোকেশে মেয়ে এসে ঢুকল। প্রথমে ঘরে নতুন লোক দেখে থমকে গেল। তার পর মাকে বলল।)

মেয়ে—কি জ্বালাতন করছ। ওকে মা ? ও মেয়েটা কে ?

(মা বসে থাকে চিত্রার্পিতের মতো অদ্ভুত একটা মুখ করে, দৃষ্টিহীন চোখ। মুখে ভয়, কান্না—অসহায়তা। এখন থেকে

শেষ পর্যন্ত মা নিস্তব্ধ হয়ে থাকবে। কেবল তার সমস্ত সত্ত্বা যেন দ্রবীভূত হয়ে যেতে লাগল।)

তরুণী—(ভয় পেয়েছে) আপনি বোধহয়—আপনার নামই খুকী ? আমি আপনার দাদার বউ।

মেয়ে—কোন দাদা ?

তরুণী—আপনার দাদা। আঠারো বছর আগে যিনি বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিলেন। এই যে—এই তার ঘড়ি ?

মেয়ে—দাদার ঘড়ি—আমার দাদার ঘড়ি !

তরুণী—হ্যাঁ, তার বিয়ের যৌতুক।

মেয়ে—তার বিয়ের যৌতুক !! মা ?

তরুণী—তিনি কোথায় ?

মেয়ে—মা ? (মা তাকায়, মাথা নাড়ে।)

তরুণী—বলুন না ও কোথায় ? আমার বড় ভয় লাগছে।

মেয়ে—আমার দাদা—আমার দাদা।

(পায়ে পায়ে পেছনে যায়। সদানন্দ দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসে। বেরোতে গিয়ে ধাক্কা লাগে মেয়ের সঙ্গে)

সদানন্দ—যা রাস্তা ছাড়। করছে দেখ, মদ খেয়েছিস নাকি ?

মেয়ে— } আমার দাদা—মা আমার দাদা !
তরুণী— } তিনি কোথায়—বলুন না তিনি কোথায় ?

সদানন্দ—পয়সা পড়ে যায়নি তো। দেখে রাখি বাবা।

(পকেট থেকে একতাড়া দশটাকার নোট বার করে গুনে আবার পকেটে রাখল।)

—বহুৎ সুক্রিয়া, বুঝলি খুকী বহুৎ সুক্রিয়া এবার ব্যাটাকে মাটি চাপা দিয়ে দি গিয়ে।

(কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে গান সুরু করে, শেষ পর্যন্ত ওই গান শোনা যাবে।)

—'আঁধার রাতের কমলমণি...........' (প্রস্থান)

তরুণী—(চিৎকার করে) তুমি কোথায়—ওগো তুমি কোথায়—

(কান্নায় স্বর ভেঙ্গে যায়। সে তাকায় মায়ের দিকে, মা তাকায় মেয়ের দিকে, মেয়ে তাকায় বউএর দিকে। তিনজনার তিনরকম দুঃখকাতর মুখের ওপর যবনিকা পড়ল।)

চেয়ার

এই নাটিকাটি বঙ্গীয় নাট্যসংসদের ষষ্ঠ একাঙ্কিকা নাট্যোৎসবে প্রথম অভিনীত হয় ২৬শে ভাদ্র ১৩৬৭ (১১ই সেপ্টেম্বর '৬০)। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় পরিচালনা করেন এবং শ্রীঅমর ঘোষ দৃশ্য-পরিকল্পনা ও আলোক-নিয়ন্ত্রণ করেন।

অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন—

দাদা— শ্রীসোমেন নন্দী

ভায়া— শ্রীঅদিৎ কুণ্ডু

চেয়ার

(একটি গ্যারেজঘর ভাড়া নিয়ে একটি বৃদ্ধ থাকে। মুখ দেখে তার বয়স বোঝা যায় না, কেন না সারা জীবনের ক্লান্তি তার মুখের ওপর ছাপ রেখে গেছে। প্রতি কাজে অসাফল্য তার চোখের দ্যুতিকে স্তিমিত করে দিয়েছে—দেহকে করেছে ন্যুব্জ। জীবনের তরী বয়ে কোনক্রমে দিন কাটছে।

ঘরের মধ্যে একটা দড়ির খাটিয়া আর একটা টবের বাক্স। আজকের বিশেষ ব্যবস্থায় সেগুলোকে একপাশ করা হয়েছে। কয়েকখানা ভাড়া করা চেয়ার দর্শকের দিকে পেছন করে রাখা। ডানদিকের একটিমাত্র প্রবেশদ্বারে খবরের কাগজের ওপর বড় করে লাল কালি দিয়ে একটা তীর আঁকা। তীরটা ঘরের ভেতর দিকটা ইঙ্গিত করছে। ঘরের পেছনদিকটা জানলা হীনতায় বেশী অন্ধকার। তার মাঝে খাটিয়ার দুটো পায়াকে জিরাফের গলার মতো লাগে। টবের বাক্সর খোলা মুখটা দর্শকদের দিকে—যেন অসহায় ক্লান্তি জানাচ্ছে। গোটা ঘরটায় বৈসাদৃশ্যের পরাকাষ্ঠা।

বৃদ্ধ টবের বাক্সয় বসে খবরের কাগজ পড়ছে। ভাড়া চেয়ার বয়ে আর একজন প্রৌঢ় এল। এর বয়েস প্রায় বৃদ্ধের সমান, তবে নেহাৎ অভ্যেস বশেই দাদা বলে। এর স্বভাব ও চেহারা অন্য জনার বিপরীত। বেঁটে, মোটা, মাথাভর্তি কাঁচাপাকা অবিন্যস্ত চুল, কলপের চেষ্টায় জায়গায় জায়গায় তামাটে হয়ে গেছে। মুখে অল্প দাড়ি। এর জীবনও বিফলতায় ভরা, তবে সেটাকে আরও দশজনের মতো স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিয়েছে। শরীরও এর অন্তঃসারশূন্য—একটা চেয়ার টেনে এনেই হাঁফিয়ে পড়ে। গেঞ্জির ওপর পেটে কোঁচাবাঁধা। সেটাকে খুলে ঘাম মুছে হাওয়া খেতে থাকে।)

ভায়া—ওফ্! আচ্ছা গরম পড়েছে।

(দাদা একবার তাকায় ভাইএর দিকে। তারপর আবার কড়িকাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ভায়া কাপড় কোমরে বেঁধে বাইরে চলে যায়—আর একটা চেয়ারকে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে আসে। তারপব গুণতে শুরু করে।)

এক—দুই—তিন, চাব————চৌদ্দ, আঠার, উনিশ। দাদা, ১৯টা চেয়ার হোল। কুড়িটা করে রাখব না পঁচিশটা? কুড়িটাই করে রাখি কি বল? তারপর যেমন যেমন লোক আসবে নিয়ে এলেই হবে। নইলে এরপর আর নড়বার জাযগা থাকবে না।

(হঠাৎ মনে হয একটা চেযার ফাটা। সেটাকে প্রথমে আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করে। তারপর সেটার ওপব বসে, ওঠে—আবার বসে, চাপ দেয়—ওঠে। খুসী।)

না ভাঙবে না। ভাঙা কি অত সহজ নাকি। তবে একটা ভাঙলেই চিত্তির হবে। এত সব বড় বড় লোক আসবে। হুঁ হুঁ কাউকে বাদ দিইনি বাবা। সহরের যত গণ্যমান্য লোক সবাইকে চিঠি দিয়েছি।

দাদা—কটা বাজল?

(ভায়া চেয়ারে বসেই নানা ভঙ্গী করে বাইরের টাওয়ারেব ঘড়িটা দেখতে চেষ্টা করে। অসফল হয়ে চটে যায।)

ভায়া—ঘড়িগুলোকে টংএর মাথায় না তুললে এদের আমোদ হয় না। কিছুতেই যদি ঘরের ভেতর থেকে দেখা যায়।

দাদা—চেয়ারের জঙ্গল হয়ে গেছে ঘরটা।

ভায়া—সে তো হবেই। কত সব বড় বড় লোক আসবে বল দেখি। এই দেখ না এখুনি এসে যাবে। ছুটির দিন সকাল বেলা একটু আরাম-টারাম করে আসবে আর কি।

দাদা—ওদের বয়ে গেছে এখানে আসতে।

ভায়া—আসবে না মানে? আলবাৎ আসবে। কেন সাধুবাবারা পাহাড়ে গুহায় থাকেন? তাদের কাছে লোক কিছু কম হয়? তুমি না হয় এই গ্যারেজটায় থাক, কিন্তু কলকাতা সহর তো বটে!

(দাদা হাতের তালুটা পরীক্ষা করতে থাকে। অন্য হাতটা পায়ের তলা কণ্ডুয়ন করে। কাগজটা মাটিতে পড়ে যায়। ভায়া তুলে পড়তে থাকে।)

ভায়া—' ' শকবাবের সমালোচনা পড়লে মনে হয়—একই জিনিষ পড়ছি। সব বইগুলোতে কি একই গল্প থাকে?

(নিস্তব্ধতা)

দাদা, আবার হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা লাগছে। মনে আছে সেই তুমি আগেই বলেছিলে nineteen fourteenএ।

দাদা—1914 এ নয়, 1928 এ।

ভায়া—হ্যা হ্যা ও একই কথা হোল। nineteen fourteen-এ যেন কি একটা হয়েছিল? খুব একটা বড়—কি?

দাদা—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

ভায়া—হ্যা হ্যা great war The first great wer. উঃ তোমার কি করে সব মনে থাকে দাদা। বৌদি থাকতে কতবার বলত—তোমাকে ওরা জোর করে সারাজীবন কেরাণী করে রাখল। কথাটা সত্যি। .. আচ্ছা বৌদি মরেছে তিন বছর হবে না?

দাদা—এগার বছর।

ভায়া—এগার বছর? মনে হয় সেদিন। (পায়ের ওপর মশা মারে) ইস্ বড্ড মশা হয়েছে। (নিস্তব্ধতা) দাদা।

দাদা—কি ?

ভায়া—আজ একটা নতুন কিছু হবে। তুমি দেখে নিও। আমার মন বলছে আজ নতুন কিছু একটা হবেই।

দাদা—এই।

ভায়া—কি ?

দাদা—তোদেব অফিসে তিনমাসের বোনাস দেবাব কথা ছিল। দিয়েছে ?

ভায়া—দেবে।

দাদা—কবে ?

ভায়া—তা জানি না। বড়বাবু বলল—দেবে। আমার বাবা বেশী কথা বলতে ভরসা হয় না' ঝাঁ করে বলে বসবে—তুমি সবাইকে খেপাচ্ছ, তোমার চাকরী গেল। বাবাঃ ওর মধ্যে আমি নাই।

দাদা—তাই বলে চুপ করে থাকবি ?

ভায়া—তাইত বড়বাবুকে বলি—থাকত আমাব দাদা, দেখিয়ে দিত। বয়সে আমার সমান হলে কি হয়, বুদ্ধিতে ? বুদ্ধিতে কতো বড়। ......আচ্ছা দাদা তোমাব ষাট হয়েছে ?

দাদা—কি জানি ?

ভায়া—আমিতো এখনও ৫৮ বলে চালাচ্ছি—যতদিন চলে।

দাদা—কেরাণী হলে সে ৬০ বছরেই অকেজো হয়ে যাবে, মন্ত্রী হলে ৭৫ বছরেও যুবা।

ভায়া—বাঃ কি সুন্দর কথাটা বললে বলতো। ওর দামই তো···। দাদা তুমি খবরের কাগজে লেখ, কতলোক পড়বে।

দাদা—লিখলেই যেন ছাপবে।

ভায়া—ছাপবে না ? কতো বাজে কথা দৈনিক ছাপছে। এক কথা দশবার ছাপছে।

দাদা—হাঁরে চেয়ারগুলো ভাড়া করতে কতো লাগল ?

ভায়া—সে তোমায় ভাবতে হবে না। দেখনা আগে সবাই এসে পড়ুক।

দাদা—কেউ কি আসবে ?

ভায়া—আসবেনা মানে ?

দাদা—তুই শুধু চেয়ার দিয়ে ঘর ভর্তি করলি—কেউ আসবে না।

ভায়া—তুমি চুপ কর দেখি। আজকে তোমার মতো বিদ্যেবুদ্ধি যদি সবার থাকতো তাহলে কি আমাদের দেশের এই অবস্থা হয়। তার ওপর যাদের চিঠি দিয়েছি তাঁরা দেশের মাথা। তাঁরা জানেন—দেশের ভালর জন্যে তোমার অভিজ্ঞতা শোনা দরকার। এই দেখনা চিঠিতে কি লিখেছি—'যিনি দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন, বন্যা, মন্বন্তর, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভুমিকম্প ইত্যাদি সম্পর্কে যাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে, চল্লিশ বছরের ওপর যিনি এদেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন; Nineteen eighteen-এ যিনি বলেছিলেন হিন্দু-মুসলমানে কলকাতায় দাঙ্গা হবে—'

দাদা—চুপ কর। লোকে ভাববে পাগলের প্রলাপ।

ভায়া—বললেই হল নাকি। বলতে পার, যা লিখেছি তার একবর্ণও মিথ্যে ? তবে ? (একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে)

এর থেকেও সাংঘাতিক কথা দিয়ে কাগজে যারা বিজ্ঞাপন দেয় তাদের কাছে কিছু কম লোক যায় ভেবেছ ? আরে আমাদের দেশের সবাই তো আর বোকা হতে পারে না।

দাদা—একটা কেরাণীর সারা জীবনের ব্যর্থতার কথা শুনে কারু কোন লাভ নাই।

ভায়া—ক্ষতিও নাই। তুমি কোন স্বার্থের জন্যে এইসব বলছ এ কথা তো কেউ বলতে পারবে না। তুমি যা বলবে সব খাঁটি সত্যি কথা।

দাদা—নে এখন চেয়ারগুলো বার করে দে। একটা টরের বাক্স, দড়ির খাটিয়া, আমার অপরূপ পৃথিবী। আমার মতো লোক পথে পথে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

ভায়া—আচ্ছা বেশ তাও না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু তাদের তোমার মতো বয়স হয়েছে, না তোমার মতো অভিজ্ঞতা হয়েছে? বল এবার চুপ করে থাকলে শুনব না। বল?

(জয়ের আনন্দে ভায়া স্ফীত। লজ্জা ও গর্বে দাদার মনে সাহস ফিরছে। কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা।)

দাদা—তবে কেউ আসবে?

ভায়া—আলবাৎ।

দাদা—চেয়ারগুলো বড় খারাপ হোল। বসতে কষ্ট হবে ওদের। বাড়ীতে সব গদী আঁটা চেয়ারে বসা অভ্যাস।

ভায়া—তুমি থামতো দাদা। কাজের জায়গায় কে আবার করে গদী আঁটা চেয়ারে বসে? যে কোন সভায় যাও কাঠের চেয়ারে বসতে হবে।

দাদা—তবুও।

ভায়া—তোমাকে আর চেয়ারের ভাবনা ভাবতে হবে না। যে যারা বসবে তারা ভাববে। আমি কি কোন খোঁজ নিই নাই ভেবেছ। সেদিন ওই যে বড় বাড়ীতে বিয়ে হোল—কি চেয়ার ভাড়া করেছিল জান? এই চেয়ার। আমি ডেকরেটারের ঠিকানা জোগাড় করে, তার বাড়ী খুঁজে, দরজা ধাক্কিয়ে, তার সঙ্গে কথা বলে টাকা জমা দিয়ে তবে।

দাদা—তাহলে চেয়ারগুলো ঠিক আছে বলছিস্? (ভাই নিরুত্তর) এই, কি ভাবছিস?

ভায়া—দাড়িটা কামিয়ে নিলে হত। কত বড় বড় লোক আসবে।

দাদা—তোকে তখন বললাম শুনলি না, তখন থেকে খালি চেয়ারই বইছিস।

ভায়া—নাপিত ব্যাটাকে বসতে বললাম···

দাদা—বসে বসে সে তোর চেয়ার বওয়া দেখবে!

ভায়া—(ভূয়ো আত্মম্ভরিতায়) সেটাই আমাদের গর্ব দাদা। আমরা হলাম কাজ-করা মানুষ, মজত্নর অর্থাৎ প্রলিটারিয়েট।

দাদা—তুই বেজায় বাজে বকিস্।

ভায়া—বাজে মানে—ওটাই তো সত্যি কথা। আমরা হলাম সাধারণ বুদ্ধিজীবী।···তবে একটা কাজ করলে হত। কিছু লেমনেড আর ফুলের ছোট ছোট মালা—সেদিন ওই যে বিয়ে বাড়ীতে দিচ্ছিল। সে যাকগে, আমাদের হল গম্ভীর-সম্ভির ব্যাপার, ওইসব করলে ছ্যাবলা দেখাবে।

দাদা—থাম। সোজা কথা বলনা পয়সা নাই।

(বাইরে সশব্দে মটরগাড়ী থামবার আওয়াজ হল।)

ভায়া—দাদা তৈরী হও, কে যেন এলেন।

(ভায়া এক দৌড়ে বাইরে চলে গেল।)

দাদা—হ্যাঁরে আমার জামাকাপড়টা কি খুব···। দেখিস ধাক্কা খাস্নে। ধ্যেৎ খবরের কাগজটা ঠিক পায়ের কাছে!

(দাদা খুব nervous হয়ে পড়ল। কি করবে ঠিক পায় না। দরজার দিকে যেতে গিয়ে পিছিয়ে এল। কোঁচা দিয়ে দুটো তিনটে চেয়ার ঝেড়ে ফেলল। হঠাৎ থেমে গেল। কোঁচাটাই ঝাড়ল কয়েকবার। খাটিয়াটাকে বাইরে বার করার জন্যে টানাটানি করতে লাগল। টবের বাক্সের ওপর বসল। তখুনি উঠে সেটা ঠেলে একপাশে নিয়ে গেল। জামায় ময়লা লাগছে খেয়াল হতেই সেটাকে ছেড়ে জামাটা ঝাড়ল। গাড়ীটা চলে যাবার আওয়াজ হল। ভায়া এসে ঢুকল। দাদা স্তব্ধ হয়ে

গেল। ভায়ার মুখে আশাভঙ্গের ছাপ স্পষ্ট। ভায়া বেমক্কা মিথ্যা কথা বলে।)

ভায়া—ইয়ে হয়েছে—মানে কি, এই ঘরটাই কিনা জেনে গেল। তোমার মতো লোক গ্যারেজে বাস করে আন্দাজ করা সোজা নয়।

(একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মিথ্যা কথাব হরির লুট ছড়াতে থাকে। যত অবিশ্বাস্য কথা, তার থেকেও অসম্ভব কথা দিয়ে সেটাকে ঢাকতে চেষ্টা করে।)

আমি যখন বললাম এই ঘরটাই তখন ড্রাইভার ব্যাটার চোখ দুটো এত বড বড় হয়ে গেল। ও বোধহয় জীবনে কখনও ওর কর্তাবাবুকে কোন গ্যারেজে নিয়ে যায় নাই। আমাকে তখন জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে? আমি বললাম, আমি বাড়ীব চাকর। ব্যাটার চোখ দুটো আবার ছানাবড়া হয়ে গেল। গ্যারেজে যে থাকে সে যে আবার চাকব রাখতেও ওরা বিশ্বাসই করেনা। হো হো হো। (হাসে)

এই দাদা চুপ করে আছ কেন? কি হয়েছে? দাদা—

দাদা—কোন বাড়ীর গাড়ী?

ভায়া—(অভিনয় করতে চায়, কিন্তু খুব বাজে অভিনয় হয়) ঐ দেখ, আসল কথাই জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। কি ভুলই যে হয়েছে আমার দাদা।

(দাদা টবের বাক্সটা টেনে এনে তার ওপর বসে। খবরের কাগজ তুলে নিয়ে মুখ আড়াল করে। আশাহত মুখটা লুকোতে চায়। দূরে অন্য একটা মটরগাড়ীর আওয়াজ হয়।)

ওই যে একখানা নীল রঙের গাড়ী আসছে। হেডলাইট দুটো কি চকচক্ করছে। নিশ্চয়ই এখানে আসছে, 'এ্যাই—এ্যাই—।

(গাড়ীটা চলে গেল।)

না এটা নয়। আমি দেখেই বুঝেছিলাম ওই উটকো গাড়ী চড়ে এখানে কেউ আসবে না। গাড়ী তো নয় যেন সাড়ী, রঙেরই বাহার কতো, লাল, নীল, দুরঙা, তিনরঙা। ব্যাটাদের লজ্জা করে না ওই রকম রঙচঙে গাড়ী চেপে বেড়াতে! তোরা নাকি ভদ্রলোক!……দাদা, একটা পুরোন অষ্টিন আসছে। (গাড়ীটা সামনে দিয়ে চলে গেল।) —আঃ ব্যাটা মুড়ির টিন খানাই প্রাণপণে চালাচ্ছে, ভাবছে বুঝি Rolls চালাচ্ছে।

(দাদা নিস্তব্ধ)

দাদা, তুমি ভাবছ কেন—সবাই আসবে।

দাদা—হ্যাঁ সবাই আসবে!

ভায়া—বাঙ্গালী বড ভাবপ্রবণ জাত……(কথার খেই হারিয়ে যায) দেখনা সেবার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে……আঃ দাদা আমার কথাটাই শোন —বাঙ্গালী বক্তৃতা শুনতে খুব ভালবাসে, এই সেবার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে খুব একটা কাণ্ড হয়েছিল। আচ্ছা, অত দুঃখ পাচ্ছ কেন বলতো? শোননা একটা হাসির গল্প বলি, সেবার খুব একটা মজা হয়েছিল।…কি যেন বলছিলাম। ও হ্যাঁ। সেবার একটা খুব হাসির ব্যাপাব হয়েছিল। কি হয়েছিল তা এখন মনে পডছে না কিন্তু খুব হেসেছিলাম আমরা সবাই। হা হা হা।

(কান্নায় মতো শোনায় হাসি সৃষ্টির চেষ্টাটা। তার পর অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে যায়।

দুঃখে ও আশাভঙ্গে দাদা ভেঙে পড়েছে। হাত দুটো শিথিল হয়ে গিয়েছে, মাথাটা ঝুঁকে পডেছে, যেন মৃত্যুর পূর্বাভাষ। ময়লা গালের ওপর চোখের জলধারার ছাপদুটো আলপনার মতো। ভায়া বিচলিত হয়। ভাবে চেয়ারগুলোকে সরিয়ে দিলে দাদা প্রকৃতিস্থ হবে। একটা চেয়ারকে টেনে বাইরে নিয়ে যেতে

থাকে, সেটা অন্য একটা চেয়ারের পায়ায় সঙ্গে বেধে যায়—ফলে দুটোই সশব্দে পড়ে যায়। ভায়া অন্য একটা চেয়ারে বসে পড়ে।)

ভায়া—দূর!

(চেয়ার পড়ার শব্দে দাদার দৃষ্টি সেইদিকে পড়ে। সেই দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। দাদার দুঃখকাতর মুখটা চেয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন কোন অন্তরাত্মার আলোয় দুঃখটাকে জয় করে ফেলে। তার মুখের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় হয়। তার সামনের চেয়ারগুলো যেন পূর্ণ, শূন্য নয়। তার মুখ উদ্ভাসিত, চোখে ঔজ্জ্বল্য, সমস্ত সত্ত্বা গর্বিত-স্পর্ধিত। দাদা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।

ভায়া দাদার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কি হল, কি হচ্ছে এ তার সাধারণ বুদ্ধির বোধগম্য নয়।)

ভায়া—দাদা, কি হয়েছে? চেয়ারগুলোর দিকে অমন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছ কেন?……আমার বড় ভয় লাগছে। তুমি কি কাউকে ওই ফাঁকা চেয়ারে দেখতে পাচ্ছ?

(সে ভয় পায়, উঠে দাঁড়ায়, তারপর মাটিতে বসে পড়ে। শেষে তাড়াতাড়ি দাদার পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। বেলা আগিয়ে যাওয়ায় সূর্য সরে গেছে, ফলে ঘরটাকে আরো অন্ধকার লাগছে।

দাদা চেয়ারগুলোর দিকে তাকিয়ে বলতে সুরু করে—তার কণ্ঠস্বর রিক্ত, অনাসক্ত, ক্লান্ত। চেয়ারগুলো যত আলোকিত হতে থাকবে ব্যক্তি দুজন তত অস্পষ্ট হয়ে শেষে আঁধারে পরিপূর্ণ বিলীন হয়ে যাবে। এই চেয়ারগুলোকে জীবন্ত করার ওপরই নাটকের সার্থকতা।)

দাদা—আপনারা সবাই এসেছেন বলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এত আনন্দ যে ভাষায় প্রকাশ করা চলে না।

ভায়া—(ভীত) দাদা, কার সঙ্গে কথা বলছ। ওখানে যে কেউ নাই।

দাদা—(যেন কোন কথা বলা হয় নাই) আমার মনের পাগলা খেয়ালের জন্যে আপনারা এত দূর আসবেন আশা করি নাই। এই অপ্রাপ্য সম্মান পেয়ে যখন কুণ্ঠিত হব ভাবছি তখন মনে হোল আমার কুণ্ঠার কোন কারণ নাই। সত্যি আমার এমন কিছু বলার আছে যা অদ্বিতীয়।

ভায়া—দাদা!

দাদা—আপনাদের আসার আশায় সযত্নে ভাষণ লিখেছিলাম। কিন্তু সে অতি সাধারণ। তার থেকে বড় কিছু যদি না বলতে পারি, সবটাই হবে প্রকাণ্ড উপহাস।

(একতাড়া কাগজ বার করে অকম্পিত হাতে ছিঁড়ে ফেলে।)

ভায়া—না-না। ও কি করছ ?

দাদা—(চেয়ারগুলোকে বলে চলে) নিজের কাছে ছোট সেজেছিলাম। তাই বুঝতে পারি নাই নিজের ক্ষমতা। বুঝিনি আমিও যা তোমরাও তাই। রবি ঠাকুর বলেছেন না, কেবল বানিয়ে তোলা কাপড়ে কেউ বা রাজা, কেউ বা ভিখারী। সেই কাপড় খানা সরে গেছে—নিজেকে আমি দেখেছি।

ভায়া—আমার ভয় করছে, ভীষণ ভয় করছে।

দাদা—যে জন্যে ডেকেছি তোমাদের। ভোর থেকে সুরু করি। শাশ্বত সূর্য রোজ ওঠে। আমরা ভাবি কালকের সূর্য ওঠার মধ্যে নতুন কিছু থাকবে।······সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠি, মনে হয় আজ আমি নতুন হয়েছি। জেগে উঠে দেখি রোজকার আমির সঙ্গে আজকের আমির কোন তফাৎ নেই। তেমনি ক্ষয়িষ্ণু, তেমনি মুখাপেক্ষী। প্রতিদিনের আমির কাছে আমার স্বপ্নে দেখা আমির হার হল। গড্ডালিকা প্রবাহে বয়ে চললাম বিফল জীবনের স্রোতে।

......এটাই সাধারণ, এটাই স্বাভাবিক। মনের প্রশ্নের মুখে পাথর চাপা দি। কেন আমার ইচ্ছার আমি বার বার মরে যায়? কেন হতে পারিনা একজন হতে বা পাঁচের মধ্যে পঞ্চম হতে!...

জায়া—দাদা, চুপ কর। (কান্নায় ব্যথিত স্বর)

দাদা—তাই আমি জানতে চাই, কেন আমি হারার দলে। কে করল সেই ভাগ, কোথায় সেই স্বার্থপর ধাতা। যদি কপালে লিখে গেল ভাগ্য—কেন মুছে দিতে পারল না দুর্ভাগ্যের অভিশাপ।...

আমি যদি বিধাতা হতাম। যদি পারতাম আকাশটাকে সমুদ্রে ডোবাতে। কুৎসিতকে সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে, দুঃখের কান্না থেকে আনন্দের হাসিটাকে টেনে বার করে আনতে!

দুঃখ পেতে পেতে মনে হয়েছে এবার বুঝি দুঃখের শেষ। দেখেছি তার পরেও দুঃখ আছে। আর তারও পরে স্তব্ধ ব্যথার সীমানায় আছে ফ্যাকাশে একটু সুখ—ব্যথার সুখ, দুঃখ পাওয়ার সুখ। তাইত এই বোকা পৃথিবীটার সব ভুল, ভুল, একেবারে ভুল।

জায়া—চুপ কর ভাই।

দাদা—এস এবার যুক্তি আর নিয়ম দিয়ে জীবনটাকে বিচার করি। নিয়ম খালি অনিয়মের, তাই অযৌক্তিক; আর যুক্তি অনর্থক। যাদের জন্য আমি সাধারণ হলাম তাদের মুখ দেখতে যদি আমার ভাল না লাগে, তোমরা বলবে, অসামাজিক। যারা আমার জীবনে ক্ষতির কারণ, তাদের বিরুদ্ধাচরণ করলে বলবে, অসভ্য। যদি আমি ঘরের কোণে বসে নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকি, সকলের সঙ্গে একজোট হয়ে জগতের ভাল করার চেষ্টাকে প্রলাপ মনে করি, তোমরা বলবে, অদ্ভুত। তোমাদের হিসেবে যাকে সফলতা বলে তা যদি আমার না থাকে, বলবে, অপটু। আর যাদের

জন্যে ক্লেদাক্ত হয়ে রইলাম, সারাজীবন বয়ে বেড়ালাম এই জঞ্জাল এই ঘৃণা, বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম নিজের অক্ষমতায়—তাদের যদি ধ্বংস করতে চাই, যদি শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে চাই মাটি থেকে, তোমরা বলবে, অপরাধী !

ভায়া—(কেঁদে ফেলে) চুপ কর ভাই। অনেক হয়েছে আর কাজ নাই।

দাদা—(বলে চলে) উঠছ কেন, বোসনা। এখনও শেষ হয় নাই আমার। এবার যা বলব তা তোমাদের আরও খারাপ লাগবে। এবার আমি ভালবাসার কথা বলব, প্রেমের কথা বলব। ক্ষীণ মিথ্যার সুতো, তার ডগায় ঝুলছে একবিন্দু জলের মতো ভালবাসা। পড়ে গেল আর কোথাও নাই। ……কি প্রেম, কি ভালবাসা, কর্পূরের মতো উড়ে যায় সব, পড়ে থাকে খানিকটা ক্লেদাক্ত কাম, কিছু উচ্ছ্বাস আর অনেকখানি প্রতারণা। কতো কথার সৃষ্টি হয়েছে বল দেখি—পুত্রকাম, কন্যাকাম, ভ্রাতৃকাম, ভগ্নীকাম। থাক। এখনই পাঁকেতে বুদ্বুদ দেখা দিয়েছে। মনের গহনে যে পাপ নিত্য প্রেমকে অসুন্দর করছে তার শেষ কোথায় ?

ভায়া—দোহাই দাদা, এবার ক্ষান্ত দে।

দাদা—(বলে চলে। কণ্ঠস্বর যেন বহু দূর থেকে আসছে) এই পৃথিবী আমার সহ্য হয় না। তাই তো চাঁদ চাই—চাই চাঁদে যেতে। এমন কিছু চাই, যে চাওয়াটা অসম্ভব। আনন্দ চাওয়ার মতো, সুখ চাওয়ার মতো, বিধাতাকে চাওয়ার মতো।……

দুটো জিনিষ খালি সত্যি। মানুষ মরে আর মানুষ সুখী নয়। সুখী নয় তাই চাঁদ চায়, মরে তাই তার দাম নাই। না, কোন দাম নাই মানুষের জীবনের, তাতে যদি কাব্য ভেসে যায়—যাক। নতুন দিনের আশা পথ চাওয়া তাই আমার বিফল হয়ে

গেল। সূর্য ওঠার সঙ্গে এল শঠতা আর প্রবঞ্চনা, ক্লান্তি আর অসংযম। এই অসঙ্গতির যদি অবসান না থাকে—তাহলে বেঁচে আছি কিসের জন্যে? কিসের জন্যে এই বদ্ধ ঘরে অপেক্ষা করছি—সৌন্দর্যহীন, আলোহীন, আশাহীন। তার থেকে মরিনা কেন সবাই মিলে মানুষের গর্বটা থাকতে থাকতে!

(স্তব্ধতা। দাদাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, ভায়া পড়ে আছে একপাশে। সে উঠে দাঁড়াল, চারদিকে তাকিয়ে ডাকল)

ভায়া—দাদা। দাদা—দাদা!

(বাইরে অনেক কণ্ঠে কোলাহল উঠল। ভায়া দরজার কাছে যেতে গিয়ে চেয়ারে ধাক্কা খেল।)

ভায়া—আঃ এই চেয়ারগুলো! চেয়ারগুলো খালি পথ আটকাচ্ছে।

(দৌড়ে গেল দরজার কাছে। এদিকে ওদিকে তাকাল—তারপর দৃষ্টিটা ঊর্ধ্বমুখী হোল—তাতে ফুটে উঠল ভয়। চিৎকার করে উঠল ভায়া।)

দাদা, লাফাসনে ভাই। ছাদ থেকে লাফাসনে, মরে যাবি। লক্ষ্মী দাদা, পায়ে পড়ি তোর— না—না—না।

(নেপথ্যে পতনের শব্দ, কোলাহল এবং তার পরে মৃত্যুর স্তব্ধতা। পতনের মুহূর্তে ভায়া চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, আশা, আকাঙ্খায় সে ধীরে ধীরে পতিতের দিকে তাকায়। মৃতের বীভৎসতা তার মুখে ছড়িয়ে যায়—সে মুখ ঘুরিয়ে নিল।)

ভায়া—উঃ। না না——না!!

টেবিল

চরিত্রলিপি

বদনবাবু

★

তাঁর মেয়ে ও ছেলেরা

★

আর তাদের বন্ধুর দল

টেবিল

(একটি সেক্রেটেবিয়েট টেবিল। তার পেছনে একখানা চেয়ার। টেবিলের ওপর নানারকম বইপত্র, হিসাব নিকাশের খাতা, নভেল, Reader's Digest, Quink আর Sulekha কালির কার্টন। এক কথায় টেবিলের ওপর একটা পৃথিবী, এক টুকরো বাঘ বা ভালুক যে নেই, একথা জোর করে বলা যায় না। বদনবাবুর মেয়ের বিয়ে। টেবিলের ওপর তার যত হিসেব জুটেছে। মেয়ে শিক্ষিতা। বিয়ের কথায় মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাবে এমন নয়—কাজেই তার বইটই সব আছে। বদনবাবুর বড় ছেলে গোকুল স্বদেশী করে। তার রাজ্যের pamphlet, political manifesto ইত্যাদি রয়েছে। মেজ ছেলে কবি, সেজ ছেলে Commerce পড়ে, তার পরের জন artist, তার পরের জন Radio mechanic, তার পরের জন—আচ্ছা থাক। সব শেষের জন 'হাসিখুসি' পড়ে। এই সব এই টেবিলটার ওপর জড়ো হয়েছে।

নাটক যখন আরম্ভ হল তখন বদনবাবুর মেয়ে আর ছেলেরা—কতজন? যতজন দিতে পারা যাবে—আর তাদের বন্ধুরা হাসছে। রবিবার সকাল। কারু কোন তাড়া নাই। চেয়ারে সবাইকে আঁটে নাই। কেউ ছোট টিপয়ে বসেছে, কেউ অন্য ঘর থেকে মোড়া বা টিনের চেয়ার নিয়ে এসেছে, কেউ এনেছে টুল বা জলচৌকি। সব থেকে ছোট ভাইটি সেক্রেটেরিয়েটের জিনিষ পত্রের মধ্যে একটু জায়গা করে দিয়েছে। কেউ রসিকতা করছে। হাসির প্রচণ্ড আওয়াজে পটক্ষেপ হল।

সবাই হাসছে। মুখে কাপড় দিয়ে, টেবিলে মুখ দিয়ে, পেটে হাত দিয়ে, উবুড় হয়ে, চিৎ হয়ে, দাঁড়িয়ে পিঠ চুলকাতে চুলকাতে,

শুয়ে গড়াতে গড়াতে, অট্টহাস্যে, মিহিস্বরে, অশ্বনাদে, গর্দভনাদে ও নিঃশব্দে।

এমন সময় বদনবাবু এসে ঢুকলেন। এক মুহূর্তে হাসি থেমে গেল। অনেকটা যন্ত্রসঙ্গীতের মাঝখানে রেডিও বন্ধ হওয়ার মতো। কোন মিহি-সুরো গলার অধিকারী বদনবাবুর প্রবেশ দেখে নাই। সবার হাসি থামার পর তার উল্লসিত হাসি বিসদৃশ ঠেকল নিজের কানেই, বেচারা হাসিটাকে কাশি করতে গিয়ে প্রথমে বিষম খেল, তারপর বেদম কাশতে লাগল। সেটাও ভাল শোনালনা, হঠাৎ চুপ করে গেল।

(বদনবাবু ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত, বিরক্ত। চারিদিকে তাকিয়ে দেখেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।)

বদনবাবু—কি রথের মেলা বসিয়েছিস্ যে!

(বলার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুকুলের সকলে এবং কয়েকজন ছেলে চট্‌পট্ করে সরে পড়ল। বড ছেলেরা প্রসেশনের পেছন দিকে ছিল—তাদের উদ্দেশ্য করেই বদনবাবু বললেন।)

বদনবাবু—সকলে তো দল বেঁধে চললেন। তারপর কাজগুলো হবে কোত্থেকে? আছে বুড়ো বাপ—কলুর বলদ।

(বড চারজন ছেলে ফিরে এল। অন্যেরা দ্রুততর সরে পড়ল। সব ছোট টেবিলে-বসা ছেলেটিকে সম্বোধন করলেন বদনবাবু।)

বদনবাবু—মণ্টু, তুই আর বসার জায়গা পেলিনা টেবিল ছাড়া। ওইখানে তোর দিদির বিয়ের যত হিসেবের খাতা আছে। একটু এদিক সেদিক হলে কি হবে জানিস্?

(মণ্টু অসহায়ভাবে দিদির দিকে তাকায়। দিদি তাকে কোলে তুলে নেয়। বদনবাবুর রাগটা এবার মেয়ের ওপর গিয়ে পড়ে)

বদনবাবু—তোর আস্কারা পেয়ে পেয়ে ছেলেগুলো বিগড়ে যাচ্ছে। আজ বাদে কাল যার বিয়ে তার এত মিটিং জমাবার কি আছে ভেবে পাই না। খালি হা-হা আর হি-হি।

(মেয়ে রাগে। রাগবেই। কোন্ কলেজে পড়া মেয়ে এমন old-fool-পণা সহ্য করে? সে উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হয়।)

বদনবাবু—জানি জানি বলবি যে তুই বি. এ. পড়ছিস—আর আমার চোদ্দপুরুষের কেউ কখনও তা পড়েনি। তাই বলে কি মাথা কিনেছিস নাকি? জানিনা বাবা, আমাদের সময় মেয়েরা বিয়ের কথা শুনলেই মুখে আঁচল দিয়ে পালিয়ে যেত। আর আজকালকার মেয়েরা হবু বরকে নিয়ে আলোচনা, গবেষণা কতো কি। (মেয়ে মুখ ভার করে)

আবার মুখটাকে প্যাঁচার মতো করলি কেন? আমি তো কেবল বলেছিলাম আমাদের সময় মেয়েরা কি করত। অই-অই-চললি কোথায়? তুই অমনি মুখ করে তোর মায়ের কাছে যাবি আর তোর মা এসে আমাকে তুলোধোনা করবে।

(মেয়ে হাসে)

হাসছিস্ কি? বিয়ের পরে দেখবি বাবাজী আমার কি রকম "হ্যাঁ হুজুর—না হুজুর" করে।

(মেয়ে খুব হাসে। মণ্টু এবার বুঝতে পেরেছে—সেও হাসে।)

এই দেখেছ মণ্টেটা গিয়ে সব বলে দেবে। হতচ্ছাড়া আবার দাঁত বার করে হাসছে। একটা কথা বলেছিস কি!

(একেবারে দাঁত কিডমিড় করেন। মণ্টু কাঁদ কাঁদ হয়ে যায়। বদনবাবু মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলেন।)

ওরে—ওমা খেন্তি নিয়ে যা মা। এখুনি ভ্যাঁ করলে গিন্নি রান্নাঘর থেকেও শুনতে পাবে।

(মেয়ে মণ্টুকে কোলে নিয়ে চলে যায়। ভাইরা আবার চোখাচোখি করে। ভাবখানা—এইবার আমাদের পালা, চার ভাইএর নাম—গোকুল, গনু, বায়না আব হাবু।

বদনবাবু প্রথমে নিশ্চিন্ত হয়ে নেন—গিন্নি শুনতে পায়নি তো! তারপর জামাটাকে খুলে চেয়ারের পিঠে ফেলে দেন। চেয়ারটা টেনে বসেন। দুটো হাত কচলে নিয়ে বলেন—)

বদনবাবু—পাখাটাকে full force করে দে। (যে যার জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সেদিকে তাকিয়ে বদনবাবু রেগুলেটর-এর দিকে তাকান। full করা আছে।)

ও করা আছে। সে কথা বলতে কি হয়! বোবা নাকি সব? এতক্ষণ তো এমন আওয়াজ করা হচ্ছিল যে জব্বলপুর থেকেও শোনা যাবে।······তা দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে—কাজকর্ম করতে হবে না। আশ্চর্য ছেলে হয়েছ বাবা সব। গোকুল আজ পর্যন্ত হিসেব লিখেছিস না কি?

(গোকুল হিসাবরক্ষক। সে কি বলতে যায়।)

কেন লেখা হয় নাই খাতা? পই পই করে বলেছি না—রোজকারটা রোজ লিখবি। একটু গোলমাল হলে হিসেব

মেলাতে মাথা ফেটে যাবে। তা শোনার প্রয়োজন কি? নিজের রোজগারের টাকা তো নয়—তা হলে বুঝতে! খাচ্ছ বাপের হোটেলে, মরুক না বাপ ব্যাটা খেটে খেটে। চোখ যেদিন বুজব সেদিন বুঝবে কত ধানে কত চাল।

(গোকুল ক্ষেপে গিয়ে একটা লম্বা খাতা টেবিলের ওপর থেকে বার করে। তারপর তার একটা পাতা খুলে বাপের সামনে ধরে।)

ও কাল রাত পর্যন্ত হিসেব লিখেছিস্! সে কথা বললেই হয়। বোবার মত মুখ বুজে থাকলে কি করে বুঝব বাবা।…… ……এ কি রে পৌনে তিনটাকা কি করলি? নিশ্চয় বাবুর সিনেমা দেখা হয়েছে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে। দিদির বিয়ে। তবে আর কি মাথা কিনেছ। এই সুযোগে পাড়ার যত বকাটেদের বসে সিনেমা দেখাও—তারপর তোমার "চলবে না-চলবে না" মিছিলে বেশ দাঁড়িয়ে যাবে। যা আমি অপছন্দ করি, তাইতো তোমাদের করতে হবে কি না। কি দরকার তোর রাজনীতির মধ্যে ঢোকবার? Corporation-এর Councillor কে হবে আর লোকসভায় কাকে ভোট দেওয়া উচিত, এ নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা কেন শুনি।……অমন চোখ গোল করে তাকালে কি হবে? পৌনে তিনটাকার হিসেব আমি নেব, তবে এখান থেকে উঠব।

(গোকুল বদনবাবুর সামনের খাতা থেকেই আর একটা কাগজ টেনে বার করে। বদনবাবুর হাতে দেয়।)

বদনবাবু—ও হ্যাঁ। এটা তো সেই এ্যাডভান্সটা না। দেখেছিস্ একেবারে ভুলে গেছি। তুই তো আবার দু'আনা পাবি আমার কাছ থেকে, না?……বুঝলি আমার আর মাথাটাথার ঠিক নেই।

(চার ভাই চোখে চোখে তাকায়। ভাব—অতি সত্যি কথা।)

মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি আর সহজ ব্যাপার! কতো সাবধানে চলতে হয়। হিসেব করে পত্তব করে।······হ্যাঁরে গোকুল, বাবা যোগে ভুল করিসনি তো। অ্যাঁ? আর একবার দেখ, আর একবার দেখ। বলিস কিরে আজ পর্যন্ত এতো টাকা খরচ হযে গেছে! তবু তো আসল খরচ এখনও আরম্ভই হয়নি। ডোবালি আমাকে এবার, ডোবালি।······ দাঁড়িয়ে থাকলি যে হাঁদার মতো! দেখ যোগটা ঠিক আছে কিনা।

(খাতাটা ফেলে দেন। গোকুল যোগটা মেলাতে থাকে। অন্য তিনজনা চোখাচোখি করে।)

তোর মত বযসে আমার অাঁক কষায় খুব নাম ছিল। পাড়ায় যত বিয়ে হোত আমাকে ডেকে নিয়ে যেত যোগ করতে। আর তখন পারতামও। দু'মিনিটে বড বড় দু'তিন পাতার যোগ করে ফেলতাম। কোনটাকে দুবার কষতে হয় নাই। সব সময়ে ঠিক হয়েছে। আমাদের সময় ছিল ওই রকম, অাঁকের ওপর খুব জোর দিত। আর তার ফল ভালই হয়েছে—দেখনা অঙ্কে আমি কত strong. কিরে এখনও হল না! হ্যাঁরে তুইতো আবার যোগ করছিস না—repeat করছিস।······কি লেখাপড়াই যে শিখেছ তা তুমিই জান! কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা—খালি বাক্যি আছে এক কাঁদি।

(গোকুল মুখ তোলে খাতা থেকে)

কিরে ঠিক আছে? (গোকুল মাথা নাড়ে অর্থাৎ হ্যাঁ) তা হলেই তো ডোবালি। দেখি এত খরচ কিসে হল।

(খাতা টেনে নিয়ে দেখতে লাগলেন। চার ভাই চোখাচোখি করল। অর্থাৎ এবার দ্বিতীয় পর্ব।)

হ্যাঁরে গনু furnitureএর জন্যে advance তো লাফাতে লাফাতে দিয়ে এলি, receiptটা এনেছিস ?

(গনু পকেট থেকে Receipt দেয়)

কি লিখেছে? সোমবার দেবে? মঙ্গলবারে বিয়ে আর সোমবারে furniture আসবে। বলিহারী বাবা। তুই কি বলে রাজী হলি? ও ব্যাটাদের আর কি, জিনিষ না দিতে হলেই সব থেকে আনন্দ হয়। শোন আজকেই যাবে। রবিবার তো হয়েছে কি, প্রথমে মোটাবাবুর কাছে যাবে। বাড়ীতে না পেলে মেয়ের বাড়ী যাবে। লোকটা প্রতি রবিবার তার মেয়েব কাছে যায়। ওর বাড়ীতে খোঁজ করে ঠিকানা জেনে নেবে। আর মেয়ের বাড়ী গিয়ে যদি না পাও—যেখানে পাবে সেখানে যাবে। মোট কথা furniture অত দেরী করে দিলে চলবে না। Economicsটা তো পড়লি না, তা হলে বুঝতে পারতিস, ওই advanceএর দেরী হওয়া মানেই—জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যাওয়া। Interest, interest—বুঝলি না চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ।

(বুঝতে পারেন বোঝানো হল না। চটে যান)

নিজে এগুলো একটু পড়ে নিলে তো হয়। তা নয় কেবল রবি ঠাকুর পড় আর কবিতা লেখ। কবিতা লিখে হয়টা কি কচু। খালি সময় নষ্ট আর হাভাতেপণা। যা আমি পছন্দ করি না তাই। (গনু কি বলতে চায়)

ক্ষের মুখে মুখে জবাব? এই রকম করেও লজ্জা নাই একটু, আবার গলা তুলে মুখে মুখে উত্তর। মার হচ্ছে তোমার একমাত্র ওষুধ।······গয়নাগুলো নিশ্চয় আসেনি। তোর মাথা নাড়ার আগেই সেটা বুঝতে পেরেছি। আসেনি কেন অ্যাঁ? সেদিন মধু স্যাকরাকে পই পই করে বলে দিলাম যে মশাই সময়ে সব জিনিষপত্রগুলো দিয়ে যাবেন। আমি একে ডিসপেপটিক —সময় যত এগিয়ে আসবে, আমিও ততো nervous হবো।

(ভাইরা চোখাচোখি করে)

আর তুমিও হয়েছ তেমনি, দিব্যি মাথা নেড়ে দিলেন। তবে আর কি, আমি উদ্ধার হয়ে গেলাম। উঃ কি করে যে কি হবে।······তোমাদের মত যার এতগুলো দামড়া ছেলে থাকে —তাকে বিয়ের জন্য কিছু ভাবতে হয় না। ছেলেরাই সমস্ত কাজ করে—বাপ কেবল সম্প্রদান করেই খালাস। আমার ভাগ্যে কতকগুলো ভেড়া জুটেছে খালি। একবার এদিকে যাচ্ছে আর একবার ওদিকে যাচ্ছে।······অন্য জিনিষগুলো কি করেছ? কই খাতা বের কর। যত বোবা কালা নিয়ে তো আমার কাজ হয়েছে।······

(গনু টেবিলের ওপর থেকে খাতাটা নিয়ে একটা পাতা বার করে বাপকে দেয়।)

হুঃ! এসেছে এসেছে। আচ্ছা। শাড়ী দেখতে কি তোদের মা গিয়েছিল না কি? বলতে হবে না, দাম দেখেই বুঝতে পারছি। তা শাড়ী যে এত টাকার এল—আর সব হবে কোত্থেকে? হুঁ, ব্লাউজ, ব্লাউজ, গেঞ্জি! গেঞ্জি আবার কে পরবে?······ও জামাইএর দ্রব্য। তা জামাইএর দ্রব্য

লিখেছিস্ বেশ করেছিস, পাশে আবাব একটা টোপর এঁকেছিস কেন? অযথা সময় নষ্ট। ভাল কথা টোপর তো কই দেখলাম না!

গনু খুঁজে টোপবের পাতাটা বার করে)

এই যে। প্রথম পাতাতেই আছে। পাতার সুরুতে আবার সরস্বতৈঃ নমঃ লিখেছিস কেন? বিয়ের ব্যাপারে লিখতে হয় প্রজাপতৈঃ নমঃ। কবে তোরা এসব শিখবি বাবা। তা হলে খালি furniture আর গযনা এসে গেলেই......হ্যারে নেমন্তন্ন করতে বেবোচ্ছিস তো?

(ভাইবা চোখাচোখি করে। অর্থাৎ তৃতীয় পর্ব সুরু হল। বায়না গলা ঝেড়ে প্রস্তুত হয।)

বাযনা, নেমন্তন্নেব লিষ্টটা বাব কর।

(বাযনা নেমন্তন্নেব খাতাটা দেয়)

সেই পুরোনো খাতা দেখেই নেমন্তন্ন করছিস? তোরাই আমাকে ডোবাবি দেখছি। বলে গেলাম না, নতুন খাতায় সব টুকতে। আমাকে তোরা বিপদে ফেলবি। যার নেমন্তন্ন হবার নয়,—তার নেমন্তন্ন হবে আর যার সব আগে নেমন্তন্ন হওযা উচিত—সে-ই বাদ পড়ে যাবে। তোদের জন্যে লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পর্যন্ত পারব না। কেন ভাল খাতায় পরিষ্কার করে টুকলে হয়টা কি।......চার বার এর আগে টুকেছিস্ তাতে কি হয়েছে? ওরে বাবা বিয়ের ব্যাপার—প্রয়োজন হলে দশবার টুকতে হবে।

(হেবো বুঝতে পারে এরপর তার পালা। সে পেট টিপতে আরম্ভ করে। মাঝে মাঝে পেট ধরে উপুড় হয়, মাঝে মাঝে বসে পড়ে। তার পেট ব্যথা সত্যিও হতে পারে—নাও হতে পারে।)

যে সে কথা নয় বাবা, কন্যাদায়। সব সময়ে গলবস্ত্র হয়ে থাকতে হয়। আর তোরা ভুল করলে লোকে বলবে ছেলে মানুষ ভুল করে ফেলেছে। কিন্তু এটা যে কন্যাদায়—বিয়ে। ভুল হলে কেউ ক্ষমা করবে না। বলবে অমুকবাবু এই রকম করেছিলেন। কাজেই বুঝতে পারছিস কতো সাবধানে কাজ করতে হবে। তুই যদি এটাকে ভাল করে নতুন খাতায় আর একবার না টুকিস তাহলে কি রকম সাংঘাতিক পরিস্থিতি হবে, বুঝতে পারছিস্ না।

(বায়না খাতাটাকে তুলে নিয়ে দুম্ করে টেবিলের ওপর ফেলে দেয়। বিদ্রোহ।)

তোমাদের পক্ষে এখন চট করে অধৈর্য হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ এটা হচ্ছে তোমাদের অধৈর্য হবার বয়স। রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ তোমাদের বয়সে আমিও একটু বদরাগী ছিলাম। (হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন।) কিন্তু তোমাদের মত এমন অসভ্য ছিলাম না। ......হেবো পেট টিপছিস্ কেন? পেট ব্যথা করছে? তা বলতে কি হয় হনুমান? যা। যা এক্ষুণি তোর মার কাছ থেকে ওষুধ চেয়ে নে গা।

(হাবু পত্রপাঠ সরে পড়ে। তিনভাই পরস্পরের দিকে তাকায়। হাবুর দৌর্বল্যে তারা আহত।)

আশ্চর্য ছেলে! শরীর খারাপ হয়েছে—তা মুখ টিপে বসে আছে! তারপর এখান থেকে কিছু হোক আর তোমাদের মায়ের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে জান পয়জান।……হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম। আমরা ছেলেবেলায় তোমাদের মতো অসভ্য ছিলাম না। গুরুজনদের ভক্তি করতাম, ভয় করতাম। তাদের মুখের ওপর খাতা ফেলে দেবার স্পর্ধা কোনও দিনও কল্পনাতে আসেনি।

(বায়না মরিয়া হয়ে কি বলতে চায়। দুই দাদার দিকে চোখ পড়ে। তারা কঠোরভাবে তাকে চোখ দিয়ে বকে। বায়না নিস্তব্ধ হয়।)

আমি একবার ছোটবেলায় মোহনবাগানের ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছি। খুব বৃষ্টি হল। গোরাদের আর বাঙ্গালীদের মধ্যে হয়ে গেল একহাত। আমার নাকের ওপর পড়েছিল এক প্রকাণ্ড ঘুসি। নাক তো ফেটে গেছে। রক্ত পড়ছে। কাপড়-চোপড়ে কাদা। বাড়ী ফিরতেই জেঠামশায়-এর সামনে। বললেন, হারামজাদা ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছিলি! যাও কাদা কাপড় কেচে আন। উঃ সেই অন্ধকার উঠোনে দাঁড়িয়ে, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে আর আমি কাপড় কাচছি। যতবারই যাই আর জ্যেঠামশায় বলেন এইখানে কাদা আছে। আবার যাই। বিশ্বাস করবি না সতের বার সেদিন কাপড় কেচেছিলাম।

(বায়নার মুখ দিয়ে হাসি চাপবার অস্ফুট আওয়াজ বার হয়। সেটা ঢাকতে গিয়ে গনু একটা সশব্দে হাই তোলে। গোকুল গলা ঝাড়ে।)

ভাবছিস্ তোদের বাপ চাল মারছে। …… …তা ভাববি না? কলিকালের ছেলে যে! বাপকে শুধু মিথ্যাবাদী কেন ঠগ্ ভাববি, পাশের বাড়ীতে চুরি হলে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিবি। বাপ আর কে, একটা ঝঞ্ঝাট।…… বাড়ীতে যত গুণ্ডামীর আখড়া করেছ। খাবে আর আড্ডা দেবে। বোনের বিয়ে হল কি কি না হল তোমাদের কি এল গেল—নিজের আহারটি সময় মতো পেলেই হল। ভেবেছ কে তোমাদের এই সব শিক্ষা দিচ্ছে, আমি বুঝি না। হ্যাঁঃ—তা হলে আব ব্যবসা করে খেতে হত না। আশ্চর্য! … আচ্ছা বাপু মায়ের হুকুমে বাপের সঙ্গে শত্রুতা না হয় করছিস, কিন্তু আমার কথাটা ভেবে দেখেছিস একবার। আমিও তোদের বাপ, জন্মদাতা।

(কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষেপে যান)

লোকে শুনলে বলবে বোবা-কালার ইস্কুল করেছি আমি! কোন্দিকে কে যাচ্ছিস্? শ্যামবাজারে গোকলো গিয়েছিলি? নিধুখুড়োর কাছে? নৈহাটীর নেমন্তন্ন গন্ন্ শেস কবেছিস্?…… বায়না খাতা নে, ভাল করে আবার লিখবি। ফের তেরিয়া মেজাজ দেখিয়েছিস কি তোরই একদিন! হেবো—হেবো গেল কোথায়। বাজার দরগুলো দেখেছে?

(হাতের ধাক্কায় কতকগুলো বই পড়ে গেল। কয়েক-খানা কাগজ বেরোল। ভাইরা চোখাচোখি করল—অর্থাৎ সেরেছে)

এইগুলো কি রে? (বিয়ের কবিতা গোলাপী সিল্কেন কাগজে ছাপা) 'দিদির বিয়েতে আমাদের কথা'—কবিতা! বিয়ের কবিতা। বলেছি না বিয়ের কবিতা আমি পছন্দ করিনা। কে লিখেছে?

নিশ্চয়ই গনার কীর্তি। ওঃ তলায় আবার কায়দা করে নাম দেওয়া হয়েছে—গোকুল, গনু, বাযনা, হেবো, পটল, ক্ষেপু—তার থেকে লিখলেই পারতিস 'যদুবংশ'। আবার গোলাপী আর্ট কাগজে ছাপান হযেছে। পযসা কে দিল? শুনি? পয়সাটা দিল কে? না কি আমার হিসেব থেকে চুরি করেছিস্? গোকলো!! বদমায়েসগুলো তোমাদের হাতে পয়সা দিয়েই আমি ভুল করেছি। তোমাদের আবার মানুষে বিশ্বাস করে!

(বাযনা আবাব খেপে যায। টেবিলের দেরাজ থেকে একটা লম্বা কাগজ বার করে বাপেব হাতে দেয়। বাপ পড়ে।)

এটা আবার কি? গোকুল ২৲, বায়না ১৲, হেবো—৷৷৹ পটল ৷৷৹। এটা আবাব কি? ক্ষেপু—৷৷৹, ভেলো ৷৷৹। ওঃ চাঁদা করে কবিতা ছাপা হয়েছে দিদির বিয়েতে। খুব বাহাদুব। যেহেতু আমি পছন্দ কবিনা ওই কবিতাই তোমাদের ছাপাতে হবে। কেন চাঁদা তুলে আর কিছু করা যায় না। হতচ্ছাড়া বদমাযেস বাউণ্ডুলেব দল।······বাপকে যখন দরকার নাই তবে আর কি, চাঁদা করেই সংসার চালাও তোমরা। তোমরাই তো কর্তা হয়েছ। দরকার কি বুড়ো বাপে— এবার ঘাড ধবে তাকে বাড়ী থেকে বার করে দাও।

(তিন ছেলেই খাতাপত্র ফেলে বীরদর্পে চলে গেল। তাদের চলে যাওযাতে বিদ্রোহ স্পষ্ট।)

যাচ্ছ কোথায় বুক ফুলিয়ে? মানে কোরোনা চলে গেলেই ছাড়া পাবে। ভাত বন্ধ কবে দেব তোমাদের, উল্লুকের দল। শিক্ষা হয়েছে না হাতী হয়েছে। কেবল বদমাইসি শেখা হয়েছে। যাওনা—তারপর তোমাদের কি করি দেখ! এঃ

ওরা ছাড়া যেন আমার কাজ হবে না। কিছু করি না বলে ভেবেছ বুঝি কিছু করার ক্ষমতা আমার নাই! আমি হলাম ওই টেবিল। বুঝলেন বাবুরা আমি হলাম ওই সেক্রে-টারিয়েট টেবিল। যত ভার চাপবে সব সহ্য করব। তোদের তোয়াক্কা করি যেন। এস আবার কোন কাজ করতে, কান ধরে থাবড়া কষিয়ে দেব। যত হনুমান !!......

......শুনতে পাচ্ছিরে—শুনতে পাচ্ছি। মায়ের কাছে গিয়ে সব লাগান হচ্ছে। লাগা—লাগা, তোদের মায়ের ভয়ে আমি যেন ইঁদুর হয়ে গর্ত খুঁজে বেড়াব। থোড়াই কেয়ার করি আমি।......এই সেরেছে গিন্নী এদিকে আসছে। হুঁ। এমন বাইসনী পদক্ষেপ আর তো কারু নাই। ডোবাল বাক। ছেলেগুলোও হয়েছে এমন আস্ত শয়তান এক একটা—

(সার্টটাকে কাঁধে ফেলে দ্রুত প্রস্থান।)

বার্ণাড শ'র দুটি চরিত্র

চরিত্রলিপি

শ্রীমতি আর সুগত

* এ নাটকটির অভিনয় বিরামহীন হবে। দৃশ্যসজ্জা কিছু থাকবে না। পেছনের পরদায় বিভিন্ন রকম ছায়া ফেলে দৃশ্য-বিভাগ বোঝাতে হবে। *

বার্ণাড শ'র দুটি চরিত্র

॥ ১ ॥

(একটি অনামা নির্জন গলি। পেছনের সাদা পরদায় গ্যাসের ল্যাম্প পোষ্টটার ছায়া পড়েছে। যবনিকা সরে যাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার এবং তারপর এই কথাগুলো শোনা গেল।)

নারীকণ্ঠ—কি চাই তোমার? কেন আমায় তাড়া করছ?

ভারী, অকরুণ কণ্ঠ—হাতের ব্যাগটা আর কানের দুল দুটো দিয়ে দাও দেখি ভালমানুষের মেয়ে। হাতের চুড়ি দুটো কি সোনার না গিল্টি? খুলে দাও।

নারীকণ্ঠ—ব্যাগে অনেক দরকারী কাগজ আছে।

ভারী, অকরুণ কণ্ঠ—সোজা কথায় দেবে, না গায়ে হাত দিতে হবে? মেয়েদের কাছে নেবার অনেক জিনিষ থাকে। বিশেষ তোমাদের মতো সুন্দরী মেয়েদের কাছে। সে সব তো এখনও চাইনি!

(হঠাৎ ঝটাপটির আওয়াজ)

নারীকণ্ঠ—ছেড়ে দাও—বদমায়েস কোথাকার! বাঁচান কে আছেন—বাঁচান আমাকে—গুণ্ডার হাত থেকে—

নতুন কণ্ঠ—কি হয়েছে? কি হল। কোন সাহায্য চাই—

ভারী কণ্ঠ—তুই শালা সরে পড় তাড়াতাড়ি—নইলে—

নতুন কণ্ঠ—নইলে কি—চলে আয়, চলে আয় দেখি, গায়ে কত জোর দেখি। একা মেয়েছেলে পেয়ে হামলা করছিস। আয় আগে আমার সঙ্গে একহাত লড়ে যা। আয়—

(পরদা যখন সরে গেল, ২৮ বছরের একজন সুন্দরী অবিবাহিতা তরুণী—আশঙ্কিত দৃষ্টিতে একদিকে তাকিয়ে আছে। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত হল। একটি যুবক এল। পোষাক মলিন, অত্যন্ত কৃশ চেহারা, মুখে দাড়ি। ইনিই নতুন কণ্ঠের অধিকারী।)

যুবক—এই নিন আপনার কানের দুল আর চুড়ি। আপনার দুর্জয় সাহস তাই বদমায়েসটার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছেন। আর এই নির্জন রাস্তায়।

নারী—আপনার সাহসও কম নয়। ওই রকম লম্বা চওড়া চেহারার লোকের সঙ্গে মারামারি করতে গেলেন। আমার মনে হল ও আপনাকে খুব মারবে। ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম।

যুবক—তখন পালালেন না কেন। সেইতো সুযোগ ছিল।

নারী—ছিঃ। আপনি আমার জন্যে ওই বদমায়েসটার কাছে মার খাবেন আর আমি পালাব? আমাকে এত নীচ ভাবছেন?

যুবক—না সবাই সাধারণত তাই করে। নিজের দিকেই নজরটা আমাদের বেশী। কিন্তু আপনি এই কানাগলিতে এসে পড়লেন কি করে?

নারী—ওই লোকটা অনেকক্ষণ থেকে পিছু নিয়েছে। ওকে এড়াতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেললাম। কোলকাতায় আমি নতুন এসেছি।

যুবক—আপনার কিন্তু তা হলে একা বেরোনো উচিৎ হয়নি। ভারতের সেরা চিড়িয়াখানা হল কোলকাতা শহর, আর যাই হোক মাংসাশীর অভাব নাই। তবু ভাল, যে লোকটার হাতে পড়েছিলেন সে বোকা—কিন্তু সে-ই কোলকাতার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি নয়। অন্য কারুর হাতে পড়লে আপনার পক্ষে ফিরে যাওয়া কঠিন হত।

নারী—কিন্তু আপনি ওকে কি বললেন যে ওই লোকটা অমন করে ছুটে পালাল।

যুবক—আমি ওর বুদ্ধিটা কতোখানি প্রথমে জানলাম—তারপর হঠাৎ তেড়ে মেরে হাত গোটাতেই ও ঘুরে দৌড়। ওকে আপনার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল—ওর দেহটা নিশ্চয়ই কাপুরুষতায় ভরা। যারা শরীর আর গলার জোরে ভয় জাগাতে চায়, তারাই সাধারণত খুব ভীরু হয়। আমাদের এই সন্ধ্যেবেলার বন্ধুটিও সেই দলের।

নারী—আমার কিন্তু ওকে দেখে খুব ভয় হয়েছিল। নিজের জন্যে তো বটেই, শেষে আপনার জন্যেও।

যুবক—আমার ভয় হয়েছিল আপনার চিৎকার শুনে। খুব সময়ে এসেছিলাম কিন্তু।

নারী—সে জন্যে আপনাকে কি ভাবে ধন্যবাদ দেবো তার ভাষা পাই না। আপনি না এসে পড়লে ও লোকটা কিছুতেই থামত না। আপনার কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ—যদি কখনও আপনার কোন কাজ করতে পারি তাহলে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করব।

যুবক—উপকার হয়তো অনেক করতে পারবেন। কারণ, আমি বেকার, আমার এমন ডিগ্রী নাই যাতে বরফ গলতে পারে। সুতরাং একটা চাকরী জোটাতে পারলে পেটের ভাত হবে।

নারী—বেশ আমি দাদুকে বলব। আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন জানলে উনি নিশ্চয়ই আপনাকে একটা চাকরী জোগাড় করে দেবেন। আমার দাদু হলেন শ্রীহরগৌরী সিংহ।

যুবক—ও আপনি বিখ্যাত চামড়া ব্যবসায়ী হরগৌরী সিংহের নাতনী। আমার ভাগ্য ভাল। এখন মনে হচ্ছে গুণ্ডাটা আপনাকে ধরেছিল কেবল আমার ভাল করার জন্য।

নারী—কই আপনার নাম ঠিকানা লিখে দিন। (ব্যাগে থেকে কলম কাগজ বার করল।)

যুবক—কাগজ কলমের দরকার নাই। আমার নাম সুগত। ঠিকানা-নাই। দাদুকে বলবেন আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুলশীল। সম্বল হল আমার এই দুটো হাত আর মাথা। আমি কালকে এই সময় আপনার বাড়ীতে যেতে পারি—আপনার দাদুর অফিসও আমার অজানা নয়।

নারী—ভাল, আমি দাদুকে বলে রাখব। উনি যদি দেখা করতে বলেন কাল আপনাকে জানিয়ে দেব।

যুবক—আপনি আমার অনেক উপকার করলেন।

নারী—কেবল আমাদের আলাপ পূজা সংখ্যা বাংলা গল্পের মত সুরু না হলেই ভাল হত। এখন আমাদের নাটকের আপনি হলেন নায়ক আর আমি হলাম নায়িকা। (সামনে দেখিয়ে) পরিণতি জানবার জন্য সবাই উন্মুখ হয়ে থাকবে।

যুবক—মন্দ বলেননি, নাটকই বটে তবে মানুষের জীবনের নাটক বার্ণাড শ'র লেখার মত—নিয়ম মেনে চলেনা। সবাই যখন বিরহ না মিলন এই অপেক্ষাতে বসে থাকবে—হয়তো দেখা যাবে কিছুই ঘটল না। বিরহ মিলন ছাড়া কোন নাটক শেষ হয়না, কিন্তু মানুষের জীবন হয়—সেটাই স্বাভাবিক।

নারী—আপনি পড়াশুনা করেন দেখি। ডিগ্রীহীনতা কেবলমাত্র ছল।

যুবক—আজ্ঞে না। আমার মতো বুদ্ধিজীবীদের পড়াই হচ্ছে সব। সেই আমাদের খাদ্য, পানীয়, আবার বুদ্ধি শান দেবার চকমকি। চলুন আপনাকে বাড়ী পযন্ত পৌছে দি—যে উপকার আপনি করলেন তারপর সেটা না করা কৃতঘ্নতা হবে।

নারী—মনে করছেন চাকরি আপনি পাবেনই? জানেন তো দাদু পাকা ব্যবসাদার। কেবল কথায় তাঁকে ভেজান কঠিন।

যুবক—পরশু চাকরির খবর নিয়ে আপনার সহিত দেখা করব। মাইনে হবে—দাঁড়ান ভাবি—৪-৪৷৷০, না না ৫৲ টাকা দিন হলে মাসে দেড়শো টাকা।

নারী—(হাসল) আপনি দেখছি গণৎকার।

যুবক—আজ্ঞে না। আমি হলাম বার্ণাড শ'র একটি চরিত্র। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবি মানুষ। চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

॥ ২ ॥

(শ্রীহরগৌরী সিংহের বাড়ীর বাগান। পেছনের পরদায় বড় বড় গাছের ছায়া। এমনি একটি গাছের তলায় শ্রীমতি একটা চেয়ারে বসে বই পড়ছে। সুগত ঢুকল। দুদিন চলে গেছে। দাড়ীটাড়ী কামান ফিট-ফাট ভাব। পোষাক একই।)

সুগত—হয়ে গেল চাকরি, মাসে দেড়শো টাকা।

শ্রীমতি—আপনি তাহলে সত্যি গুনতে জানেন দেখছি।

সুগত—না গোনা নয়, হিসেব।

শ্রীমতি—কি রকম?

সুগত—এই দেখুন। আমি আপনার দাদুকে বললাম দিন পাঁচ টাকা দিলে আমি কাজ করতে পারি।

শ্রীমতি—তারপর উনি খুব চটে যান নি?

সুগত—না, হেসে বললেন কি কাজ করতে পার? চামড়া কাটতে পার? আমি বললাম চেষ্টা করলে হয়তো পারব, তবে তাতে আপনার লোকসান হবে আর আমিও দু'দিন পরে ছেড়ে চলে যাব।

শ্রীমতি—কেন? আপনি তো চাকরি খুঁজছিলেন।

সুগত—হাঁ। কিন্তু যখন আমার কাজে আমার মন সায় দেবে না—তখন এখানে আর একদিনও থাকার ইচ্ছা করবে না।

শ্রীমতি—কি কাজে আপনার মন সায় দেবে?

সুগত—আপনার বাবাও ওই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। উনি আমার ওপর খুব চটেছেন। বললেন ভিখারীর আবার পয়সা বাছা!

শ্রীমতি—(হঠাৎ রূঢ়) আমারও তাই মনে হচ্ছে।

সুগত—(হেসে) খুব স্বাভাবিক। আপনার বাবার বন্ধু আর আপনাদের চার আনির অংশীদার ব্যোমকেশবাবু তো ঠাট্টা করে বল্লেনই, কোম্পানীর চেয়ারম্যান হলে তবে তোমার মন উঠবে বাপু? আমি বললাম, না এখনই অতদূরে যেতে ইচ্ছে করি না। ক্রমে দেখা যাবে। আপাতত একটা ওভারসিয়ারি পেলেই চলবে।

শ্রীমতি—বাবা কিছু বললেন শুনে?

সুগত—না তিনি আগেই রেগে ঘর থেকে চলে গিয়েছিলেন।

শ্রীমতি—কেন? কার ওপর রাগ করলেন?

সুগত—আমি উপলক্ষ্য—আপনার দাদুর ওপর

শ্রীমতি—কেন—কি বলেছিলেন আপনি।

সুগত—বলেছিলাম যে হরগৌরীবাবু শূন্য থেকে আরম্ভ করেছিলেন, উনি আমার কথাবার্তা বুঝবেন। আপনারা তৈরী জিনিস উঠতি অবস্থায় পেয়েছেন, আমার কথা বোঝা শক্ত।

শ্রীমতি—একথা বলার আপনার কোন অধিকার নাই। আপনি আপনার অধিকারের বাইরে কথাবার্তা বলছেন। আমার জন্যেই আজকে বাবাকে অপমানিত হতে হয়েছে।

সুগত—আপনিও আমাকে ভুল বুঝছেন।

শ্রীমতি—মোটেই না, আপনাকে আমি চিনেছি। প্রতিষ্ঠিত লোকদের দিকে কটাক্ষ করে যাদের সময় কাটে আপনি তাদেরই একজন।

সুগত—সম্পূর্ণ ভুল। আমিও জীবনে উন্নতি করতে চাই। জানি আমার জীবনে এ সুযোগ হয় তো আর কখনও আসবে না, তাই প্রাণপণ চেষ্টা করছি যাতে হেলায় শ্রেষ্ঠ মুহূর্তটা নষ্ট না হয়ে যায়।

শ্রীমতি—আপনি উপকার করার সুযোগ দিয়ে এমন ভাব করছেন যেন আপনাকে চাকরি জুটিয়ে দেওয়া আমাদের স্বার্থ আর কর্তব্য।

সুগত—কর্তব্য নিশ্চয় নয়। আপনাদের দয়া। কিন্তু দয়ারও তো পাত্র অপাত্র আছে। সুপাত্রে দয়ার ফল শুভ, তাতে আরও পাঁচটা লোকের উপকার হবার সম্ভাবনা থাকে। অপাত্রে দয়া, [illegible]।

শ্রীমতি—আপনি হলেন সুপাত্র!

সুগত—(কথাটার দ্ব্যর্থবোধে হাসে) আপনার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধে নয়।

শ্রীমতি—চুপ করুন, আমাকে ফাজলামো করতে হবে না।

সুগত—(হাসে, তারপর গম্ভীর হয়ে যায়) আপনি যদি মনে করেন আপনাদের এখানে চাকরি নিয়ে আমি অন্যায় করেছি, আমি তা এই মুহূর্তে ছেড়ে দেবো। আমি স্বার্থপর নই। আপনার উপকার আমি ভুলব না।

শ্রীমতি—দাদু আপনাকে চাকরী দিয়েছেন, আমি তার মধ্যে কথা বলবার কে?

সুগত—না, সে কথা নয়। আপনি যদি মনে করেন আমি যা করেছি তা অন্যায়—আমি এখনই বিদায় হচ্ছি। আমাকে আর আপনারা দেখতে পাবেন না।

শ্রীমতি—(নরম) দাদুর সঙ্গে আর কি কথা হল আপনার?

সুগত—উনি বললেন ওভারসিয়াররা তো অত বেশী মাইনে পায় না। তোমাকে বেশী দেওয়া অন্যায় হবে।

শ্রীমতি—দাদু ঠিকই বলেছেন। আমার কি ধারণা জানেন। আপনার উদ্দেশ্যটা অর্থকরী। জানেন বোধহয় আর দুমাস পরেই বাবা কোম্পানীর চেয়ারম্যান হবেন। ব্যোমকেশবাবু হবেন ভাইস-চেয়ারম্যান।

সুগত—জানি, আপনার দাদুই সে কথা বললেন। বেশী মাইনে পেলে আমার সহকর্মীদের মধ্যে হিংসা আসবে তাও বললেন

শ্রীমতি—সকলের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে আপনি কি করে কাজ করবেন আমি বুঝতে পারছি না। দাদু তো দুমাস পরেই কাশী চলে যাচ্ছেন। ব্যবসার ভার পড়বে বাবার ঘাড়ে।

সুগত—ব্যোমকেশবাবু প্রস্তাব করেছিলেন শ'পাঁচেক টাকা নিয়ে সরে পড়তে। আমি তা নিইনি।

শ্রীমতি—কেন ?

সুগত—টাকা রোজগার করার ইচ্ছা নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু সেটা লটারীর টিকিট কি বা হারাণ প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশের পুরস্কার হিসেবে নয়।

শ্রীমতি—তারপর ?

সুগত—শেষে আমি একটা প্ল্যান দিলাম। ওঁরা একটা কাজের ভার আমাকে দেবেন—আর সেই কাজটা সুসম্পূর্ণ হলে সপ্তাহে ৩৫৲ টাকা আমার প্রাপ্য হবে। যদি কাজটা ঠিক বা ভাল না হয় টাকা কাটা যাবে। আর আমার প্রথম সপ্তাহের কাজ যদি তাদের পছন্দ না হয় তা হলে আমাকে এক সপ্তাহেরও মাইনে বা চাকরী দেবার দায়িত্ব ওঁদের থাকবে না।

শ্রীমতি—দাদু এতে রাজী হলেন ?

সুগত—প্রথমে হননি। উনি কম মাইনেতে ওভারসিয়ারি দেবার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু ব্যোমকেশবাবু ওঁকে রাজী করিয়েছেন। ভদ্রলোক ব্যবসা কিছু বোঝেন না। আমি দেখলাম এই ভাবেই আমি আমার দক্ষতা প্রমাণ করতে পারব। আপনার দাদুকেও তাই বললাম। যাদের সঙ্গে কাজ করতে হবে তাদেরই বিশ্বাস উৎপাদন করে। আপনার দাদু চলে গেলে ব্যবসার ক্ষতি হবে।

শ্রীমতি—তারপর—

সুগত—তারপর এখন আপনি বলুন—এ কাজটা আমি নেব কি না।

শ্রীমতি—আমি কি বলব। আপনাকে পছন্দ হলে ওরা রাখবেন।

সুগত—সে তো পরে। এখন আমি যোগ দেব কি? আপনার অনুমতি চাইছি।

শ্রীমতি—যদি অনুমতি না দিই, আপনি চলে যেতে পারেন?

সুগত—প্রমাণ চাইছেন?

শ্রীমতি—আপনার চলবে কি করে?

সুগত—চলা তা পারব জোরের ওপর নির্ভর করে সেটা এখনও আমার যথেষ্ট আছে

শ্রীমতি—(বুঝতে পারে মনের কোথায় একটা টান এসেছে এই লোকটার জন্য। বুঝতে পেরে ভয় পেল। ভয় কাটাতে হাসে।) আপনার নায়ক হবার অনেক গুণ আছে যদি বলি চলে যান?

সুগত—সেটা শক্ত কি। আপনার দাদুকে বলে দেবেন। নমস্কার।

(গমনোদ্যত)

শ্রীমতি—(লজ্জা হল। নিজের ভয়ের জন্য একজনকে অনাহারের পথে ঠেলে দেবে!) শুনুন। আপনি কাজটা নিন।

সুগত—(হাসল) বেশ তাই হবে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এখন থেকে আপনি আমার মনিব হলেন, সুতরাং আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসাটা আর উচিত হবে না। নমস্কার।

(সোজা চলে গেল)

(শ্রীমতি দাঁড়িয়ে থাকল। একবার মনে হল সুগতকে ডেকে কিছু বলবে। অনুভব করল ডাকাটা উচিত হবে না। তাড়াতাড়ি ফিরে উল্টোদিকে বাড়ীর ভেতর চলে গেল।)

॥ ৩ ॥

শ্রীমতি সিংহের বাড়ী। খোলা বারান্দায় শ্রীমতি অস্থির ভাবে পায়চারি করছে। পেছনের পরদায় বাড়ীটার ছায়া পড়েছে। এক বছর কেটে গেছে। শ্রীমতি কিছু শীর্ণা। সুগত এল। এক বছরে তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে; পরিচ্ছদে বাবুগিরি নেই, তবে খুব ফিটফাট। কর্মক্ষম লোকের আত্মচেতনা তার মধ্যে স্পষ্ট। তবে অহঙ্কারের প্রকাশ নাই।

সুগত—আমাকে ডেকেছেন ?

শ্রীমতি—হ্যাঁ। হিসেব করছিলাম গত একবছরের মধ্যে মাত্র একদিন আপনি এই বাড়ীতে এসেছেন। আর সেও দাদুর মৃত্যুর দিন।

সুগত—আপনার দাদু ছিলেন একজন সত্যিকারের কর্মী। যতই বয়স হোক না কেন অমন একজন লোকের মৃত্যু সবদাই ক্ষতিকর।

শ্রীমতি—আপনাকে তিনি বিশেষ ভালবাসতেন।

সুগত—তার দয়াতেই মানুষ হবার সুযোগ পেয়েছি আমি। তার জন্যেই জীবনে উন্নতি করতে পারব। সর্বদা অনুভব করেছি তাঁর সস্নেহ দৃষ্টি আমার সব কাজ লক্ষ্য করেছে। তাঁর অভাব আমার কাছে অনেকখানি।

শ্রীমতি—বাবা বলছিলেন কালে যদি কোন লোক ওঁর কাজ সম্পূর্ণ করতে করতে পারে তা হলে সে লোক আপনি। আমি তো শুনে অবাক। বাবা আপনাকে সব থেকে অপছন্দ করতেন।

সুগত—না, এখন উনি আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। বরঞ্চ এত ভালবাসেন যে নিজেকে পঙ্গু করে ফেলছেন আমার ওপর নির্ভর করে। আমি যা করি সব তাতেই উনি রাজী—এতে আমারও কাজ করতে অসুবিধা হয়। বুঝতে পারি না অতি বিশ্বাস—আমাকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে কিনা।

শ্রীমতি - আপনার প্রশংসা সকলের মুখে, তাতেও দেখি আপনি সন্তুষ্ট নন। বাবা আপনাকে বেশী বিশ্বাস করেন বলে তাঁকে হেয় করেন। আপনার মনের এই অধঃপাত তুঃখের। ছিঃ।

সুগত—অধঃপাত !!

শ্রীমতি—নিশ্চয়। আপনার কথায় উনি ব্যোমকেশবাবুকে পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়েছেন। ভদ্রলোক ব্যবসা না বুঝলেও বাবার বন্ধু ছিলেন। ব্যোমকেশবাবুর শেয়ার সুদশুদ্ধ দাম দিয়ে আপনি কিনেছেন, এতেও বাবা আপত্তি করেন নি। কোম্পানীর বুড়ো বুড়ো কর্মচারীদের আপনার কথায় বরখাস্ত করা হয়েছে, হাঁ—তাদের কোম্পানীর শেয়ার দেওয়া হয়েছে বিনা পয়সায়, নগদ টাকাও দিয়েছেন আপনারা। কিন্তু তাদের কাজ করবার অধিকার ?

সুগত—ব্যবসার ভালর জন্যে যা প্রয়োজন সবই আমি করেছি। যেখানে দশজন লোক সারাদিনে একটা কাজ শেস করতে পারছিল না তাদের বার্ধক্যের জন্যে—সেই কাজ মাত্র তুজনে দৈনিক শেষ করছে।

শ্রীমতি—কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন তারা দাতুর সঙ্গে কাজ করেছে।

কোম্পানীর সুরু থেকে তারা আছে। তাদের অধিকার আপনার অধিকারের থেকে অনেক বেশী পুরোনো।

সুগত—না।

শ্রীমতি—না মানে?

সুগত—প্রত্যেক ব্যবসার ক্ষেত্রে সেই ব্যবসার অধিকার সব থেকে বড় অধিকার। তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হলে যদি পুরোনো গাছ কেটে ফেলতে হয়—পুরোনো ঝরা পাতা পুড়িয়ে ফেলতে হয় তাহলে তাই করতে হবে।

শ্রীমতি—মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে?

সুগত—তাদের মনুষ্যত্বকে অপমান করা হয় নাই।

শ্রীমতি—শুধু বলা হয়েছে তোমাদের প্রয়োজন নাই। তোমরা পুরোনো।

সুগত—অগত্যা।

শ্রীমতি—আর যে সব অল্পবয়সী ছেলেদের আপনার তাড়িয়েছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত পুরোনো। তাদের কি দোষ?

সুগত—তাদের কোন দোষ নাই। তারা যে কাজ করত সে কাজ এখন মেসিনে হচ্ছে। ২৫ জন লোকের কাজ একটা মেসিনে করছে। তাদের অবশ্য আমরা কাজ দেব আর ছমাস পর। ততদিনে নতুন কারখানাটা তৈরী হয়ে যাবে।

শ্রীমতি—ততদিন তারা কি করবে?

সুগত—কেন আমরা তো বসে-থাকা বেতন দিচ্ছি।

শ্রীমতি—কাজ না করে তারা কতদিন থাকবে, আর থাকবেই বা কেন?

সুগত—উপায় নেই। ওদের মধ্যে কতকগুলো আছে যারা মেসিনের কাজ শিখতে চায় না। বোধহয় ভয় পায়। আর কতকগুলো আছে যারা এত বোকা যে মেসিনের কাজে দেওয়া যায় না। আমাদের নতুন কারখানাটা উঠলে—

শ্রীমতি—উঃ কারখানা আর মেসিন, মেসিন আর কারখানা। এ ছাড়া কি আপনারা কিছুই জানেন না? দয়া মায়া, স্নেহ, মমতাও কি আপনাদের মেসিন চাপা পড়ে চেপ্টে হয়ে গেছে?

সুগত—দেখুন আপনি বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছেন না। আপনি যেখানে মাত্র কয়েকজন কর্মীর কথা ভাবছেন [illegible] সেখানে অনেক কর্মীর [illegible]—অবশ্য [illegible] ভাবে।

শ্রীমতি—কি রকম?

সুগত—যেমন ধরুন, [illegible] এক বেশী পড়ত যে আমার ভাগে [illegible] সময় [illegible] পারতাম না। [illegible] ছুটোছুটি [illegible] দরুন আমাদের [illegible] হচ্ছে [illegible] পারছে, [illegible] মঙ্গল [illegible] চোখ [illegible]

শ্রীমতি—[illegible]

সুগত—এমন [illegible] কারণ আমার [illegible] সঙ্গে সেই [illegible] ভাবে ছড়িয়ে পড়ল। [illegible] কর্মীর [illegible] শাঁসালো আর [illegible] সরকার। জোচ্চোর ব্যবসায়ী নাই তা বলিনা—[illegible] দলের নই তাতো জানেন।

শ্রীমতি—চুপ করুন। আপনাদের মনগুলোও এমন মেসিন হয়ে গেছে যে সাধারণ কথা আপনারা বুঝতেই পারেন না। আপনারা বোঝেন খালি ছক আর গ্রাফ। কথা বলেন অঙ্কের হিসেবে।

সুগত—(হাসল) কি হলে আপনার মনঃপূত হবে? কারখানা ভেঙ্গে ফের জঙ্গল বানালে?

শ্রীমতি—আপনি তো হাসবেনই। মাটির কোন টান নাই আপনার। তাই মাটিকে ঢেকে দিতে আপনার এতটুকুও বাধে না। শুনলাম দাদুর সাধের গোলাপ বাগানটার ওপর আপনার নজর পড়েছে। সেটাকেও নষ্ট করতে হবে।

সুগত—সেখানে নতুন কারখানা হবে, ডিরেক্টররা তাই ঠিক করেছেন।

শ্রীমতি—থামুন, ডিরেক্টর বোর্ড যে আপনার কথায় ওঠে বসে সে কথা আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। আচ্ছা—আপনি—। কি করে আপনাকে বোঝাব আমি ভেবে পাই না। আপনি আমার ভাষা বোঝেন না, আমার ভাব বোঝেন না। আপনার সঙ্গে কথা বলা যেন মঙ্গলগ্রহের কারো সঙ্গে কথা বলা।

সুগত—বলুন না, অত কিন্তু হচ্ছেন কেন?

শ্রীমতি—আচ্ছা দাদুর বাগান নষ্ট করার আগে সঙ্কোচ হবে না আপনার? আপনি যাকে অত ভালবাসতেন। আপনার উন্নতির মূলে যিনি—তাঁর হাতে গড়া বাগান।

সুগত—আপনি আমাকে দোষী করছেন শুধু শুধু। ভেবে দেখুন ওই বাগানের জায়গাটাকে কি করা যায়। যদি ওটাকে বাদ দিয়ে ওটার পাশে নতুন কারখানা হয় তা হলে বাগানে কাটা চামড়ার গুঁড়ো পড়বে, ফলে বাগান নষ্ট হবেই। তার থেকে যেখানে উনি কাজ করছিলেন সেখানেই নতুন কারখানা ওঠা ঠিক নয় কি? অবশ্য যদি বলেন নতুন কারখানার প্রয়োজন নাই তা হলে সেটা আলাদা কথা। কিন্তু সেখানে আপনিই তো একমাত্র অংশীদার নন—অন্যেরা শুনবে না। কাজেই কারখানা হবেই।

শ্রীমতি— আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে হয় আপনার সঙ্গে কথা না বলে যদি আপনার মেসিনগুলোর সঙ্গে কথা বলতাম ওরা বুঝত। আপনি যে মনে প্রাণে মেসিন তা এত স্পষ্ট বুঝিনি কখনও। যাক। যে জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি একবছর পরে তাই বলি।

সুগত—বলুন। আপনার বলা হলে আমারও একটা কথা বলার আছে বলব। সুযোগ যখন পাওয়া গেল।

শ্রীমতি—(আশান্বিতা) বলুন না।

সুগত— না আপনার কথা শুনি, তারপর বলব।

শ্রীমতি—(প্রথমটা সঙ্কুচিত) দেখুন আপনার কাজের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়েছে। এমন কি বাবাও সব সময়ে বলেন আপনার মত ছেলে নাকি হয় না।

সুগত—দেখুন আপনি আর কিছু বলার আগে আমি কেন এইসব কাজগুলো করেছি বলে নিই। (শ্রীমতি আশান্বিতা হয়ে চুপ করল—যেন সুগত এবার ওর প্রশংসা করবে, কিন্তু ওর কথায় হতাশা স্পষ্ট দেখা যাবে) আমি এর মধ্যে ঢুকে দেখলাম অসম্ভব উন্নতির উপায় আছে এই ব্যবসার আপনার দাদু শক্ত খুঁটি তৈরী করেছেন—তার ওপর বড় জিনিষ বসাতে হবে। দেশের দাবী, সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, রাষ্ট্রের সম্মান ইত্যাদি বড় বড় কথা যা বলা হয়, আপনার কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই, এসব কিছুই আমার মনে আসে নাই। আমি দেখেছি একটা বিরাট সম্ভাবনা, চেষ্টা করেছি সেটাকে রূপ দিতে। একটা ছোট ছেলের বড় হবার ইচ্ছাটাকে সাহায্য করেছি মাত্র। এই মস্ত শিক্ষা আপনার দাদু আমাকে দিয়ে গেছেন।

শ্রীমতি—আপনার এতো সুন্দর সুন্দর কথাগুলো অপাত্রে পড়ল। আমি ওগুলোর আধেক শুনিনি। আপনাদের কচকচি শুনে মনে হয় কেবলমাত্র হিসেব আর পরিকল্পনা খেয়ে আপনারা বেঁচে থাকেন কি করে! যাক। সে প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আবার একঝুড়ি বক্তৃতা শুনতে চাই না। যে কথা বলতে চেয়েছিলাম বলে চলে যাব এখুনি। শুনুন—বাবা আপনার দক্ষতায় এত সন্তুষ্ট হয়েছেন যে আপনাকে তাঁর জামাই করতে চান। কাল তিনি সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করেছেন—আজ সম্ভবতঃ আপনার কাছে প্রস্তাব পাঠাবেন।

সুগত—ও।

শ্রীমতি—আমার উপর যদি আপনার কিছুমাত্র মমত্ববোধ থাকে তা হলে আপনি দয়া করে এই প্রস্তাবে রাজী হবেন না। এর জন্য আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।

সুগত—(এক মুহূর্ত ভেবে) আচ্ছা।

(কিছুক্ষণ দুজনেই অস্বাভাবিক ভাবে চুপ করে থাকল)

শ্রীমতি—কিছু বলছেন না যে?

সুগত—কথাটা খব নতুন লাগল। ভাবিনি আগে। নাই হবে এখন আমার আর ভাববার প্রয়োজন নাই। এবার আমার কথাটা বলতে পারি?

শ্রীমতি—বলুন।

সুগত—আপনার এই বাড়ীটা বেজায় পুরোন হয়ে গেছে। প্রায় সব ঘর দিয়েই জল পড়ে। দেখুন না বসার ঘরটা পর্যন্ত কি অন্ধকার! অনুমতি করেন তো এ বাড়ীটা ভেঙ্গে একটা নতুন বাড়ী বানিয়ে দিই আপনাকে।

শ্রীমতি—কি বলছেন আপনি!

স্বগত—এ বাড়ী আপনার দাদু আপনাকে দিয়ে গেছেন। এটাই তাঁর আদি বাড়ী। কিন্তু দেখুন, আপনার বাবা পাশেই কি চমৎকার বাড়ী করেছেন। আপনি শুধু গোঁ ধরে রইলেন। ওটার পাশে এটাকে কদাকার বিশ্রী লাগে।

শ্রীমতি—আমার কদাকারই ভাল।

স্বগত—কথা দিচ্ছি আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

শ্রীমতি—আমি দাদুর বাড়ী ভেঙ্গে ফেলব! আমি! সে জায়গায় উঠবে নতুন ফ্যাসানের বাংলো। আপনি—আপনি ভাবেন কি আমাকে?

স্বগত—(হেসে) আমি ভাবি এই রকম সাংঘাতিক বাড়ীতে বাস করার পেছনে বীরত্ব অনেক থাকতে পারে, তবে বুদ্ধি কতটুকু আছে বলা কঠিন।

শ্রীমতি—আপনি মনে করেন পুরান সমস্ত ভেঙ্গে ফেললেই এগিয়ে যাওয়া হল? ঐতিহ্যের দাম নাই, অতীতের সৌন্দর্য নাই?

স্বগত—কিন্তু যে ঐতিহ্য ভাঙ্গা বাড়ী হয়ে মাথায় ভেঙ্গে পড়ে সেটা নাই বা থাকল, কার তাতে ক্ষতি হবে। আর যে অতীত সৌন্দর্য, বৃষ্টির জল আটকাতে পারে না তার সঙ্গে বাস করা কঠিন নয় কি?

শ্রীমতি—আপনি—আপনি কি? আপনার লজ্জা বোধ নাই, সঙ্কোচ নাই! আমার বাড়ীতে বসে আমাকে অপমান করতে আপনার এতটুকু বাধেনা!

স্বগত—আপনাকে তো কোন অপমান করিনি।

শ্রীমতি—কিন্তু এই বাড়ী ভেঙ্গে ফেলে দিতে চেয়েছেন।

স্বগত—হ্যাঁ। কেননা জল পড়ে, অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে—

শ্রীমতি—ব্যস, অনেক হয়েছে। এবার আপনি আসুন।

সুগত—আপনি ভেবে দেখবেন আমার কথাটা।

শ্রীমতি—আপনি যান—আপনি যান আপনার কোন কথা আমি শুনবনা।

সুগত—কিন্তু—

শ্রীমতি—আপনাকে তাড়িয়ে না দিলে কি আপনি যাবেন না?

সুগত—(হাসল) আচ্ছা চলি। মত বদলালে ডেকে পাঠাবেন।

(চলে গেল)

(শ্রীমতির মুখে একটা ক্লান্তির ছায়া)

শ্রীমতি—ও কেন বুঝতে পারে না! (চলে গেল)

॥ ৪ ॥

চার বছর পর। শ্রীমতি সিংহের নতুন বাড়ীর বারান্দা। একখানা চেয়ারে শ্রীমতি বসে আছে। গায়ের ওপর একখানা শাল। হাতে বই। তবে মনটা বইয়ের পাতা থেকে মাঝে মাঝে আকাশে চলে যাচ্ছে। তার চোখেমুখে আরও ক্লান্তি। কিছুক্ষণ পর সুগত এল। আগের দৃশ্যের মতনই, কেবল মুখের ঔজ্জ্বল্য একটু বেড়েছে। কানের পাশের কয়েকটি চুলে অসময়ের শ্বেতবর্ণ লেগেছে। শ্রীমতি ধীরে ধীরে সুগতর ওপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে। সময় সন্ধ্যা।

সুগত—আজকে কেমন আছেন?

শ্রীমতি—ভাল।

সুগত—আজকে আর জ্বর আসেনি তো?

শ্রীমতি—না।

সুগত—কি খেলেন?

শ্রীমতি—পাঁউরুটি।

স্বগত—ডাক্তার বলেন আপনি নিজেকে বঞ্চিত করে এই রোগ করেছেন। দেহমনকে আপনি পূর্ণ রাখেন নি।

শ্রীমতি—অদ্ভুত কথা বলা বড় বড় ডাক্তারদের অবশ্য কর্তব্য।

স্বগত—আমারও কিন্তু ধারণা আপনি নিজের শরীর সম্বন্ধে যথেষ্ট যত্ন নেন না।

শ্রীমতি—আমি যদি একটা কারখানা, মেসিন বা ভাঙ্গা বাড়ী হতাম আপনার ধারণা ঠিক হতে পারত। কারণ ওগুলোই আপনি ভালো বোঝেন।

স্বগত—আপনি এখনও আমার ওপর রেগে আছেন। কিন্তু আমি কি অন্যায় করেছি বলে দিন।

শ্রীমতি—কিছু অন্যায় করেন নি। আপনি কখনও অন্যায় করেন না, ভুল করেন না। আমাদের একটা ব্যবসা ছিল—আজ পাঁচ বছরে সেখানে পাঁচটা ব্যবসা হয়েছে। আপনি নিজেও আলাদা ব্যবসা করেছেন, অথচ আমাদের ছেড়ে যাননি। আপনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

স্বগত—ছিঃ ছিঃ কি বলছেন। আপনারা সুযোগ দিয়েছিলেন বলেই না আমার ভাগ্য ফিরেছে। নইলে সেদিন আমাকে চিনত কে বলুন। আপনার কাছে সে ঋণ শোধ হবার নয়।

শ্রীমতি—আপনি আজকে প্রতিষ্ঠার শিখরে। লোকে আপনার সঙ্গে দেখা হলে ভাগ্য মনে করে। আমাদের এখন পরিচয় কেবল আপনার আবিষ্কর্তা বলে। কি অদ্ভুত বলুন দেখি! পাঁচ বছর আগে আমরা আপনাকে করুণা করতাম—এখন আপনি আমাদের করুণা করবেন—না কি তারও সময় পান না?

স্বগত—কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন?

শ্রীমতি—লজ্জা কেন পাবেন, আপনার প্রশংসা করছি। এক এক

সময়ে আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি সব কিছু আপনার কথা শোনে।

সুগত—কি রকম?

শ্রীমতি—এই দেখুন না এই বাড়ীটার কথা ধরুন। আপনি নতুন বাড়ী করতে চাইবার পর থেকেই সব ভেঙ্গে পড়তে লাগল। যেন ওরাও আপনার কথা শুনতে পেয়েছে। শেষে যেদিন একটা টালি পড়ে গেল চাকরের মাথায়, বাবা আপনাকে ডাকলেন। উঠলো নতুন বাড়ী, বিলেত থেকে এল রান্না করার মস্ত স্টোভ, কাপড়-ধোওয়া মেসিন, কুকার, আরও কত কি। আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য।

সুগত—আপনি কিন্তু তখন আপত্তি করেন নি, বরং সায় দিয়েছেন আমাদের কাজে। কুকার, স্টোভ সবই আপনি বেছে নিয়েছেন।

শ্রীমতি—অস্বীকার করছি না। আরামে থাকবার সব উপকরণই আমার আছে। আমিও যে আরামে নাই একথা বলতে পারি না।

সুগত—তবে?

শ্রীমতি—ওই 'তবেটা'ই জীবনের সব থেকে বড় প্রশ্ন। আমার ঠাকুমাদের সময় হলে আপনাকে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বলতেন।

সুগত—হয়তো 'ডান' বলে ঝাঁটাও মারতেন।

শ্রীমতি—(হাসল) সে সম্ভাবনাও ছিল। আপনার কথা শুনে বাড়ী পড়ে গেল, এটা তাঁরা খুব সহজ মনে নিতেন না।

সুগত—আপনাকে হাসতে দেখে আমার ভাল লাগছে। আপনার গম্ভীর মুখ দেখি আর মনে হয় আমি বুঝি তার কারণ।

শ্রীমতি—কেন মনে হয়? কেন আপনি আমার কথা ভাবেন?

সুগত—কি জানি, এখন বলতে পারব না। মনে হয় আপনাদের আর

পাঁচটা কাজের মধ্যে এটাও আমার কাজ। আপনার প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে—অধিকারের কথাটা বাদ দেওয়া যায় না।

শ্রীমতি আমি যদি আপনাকে আজ বলি—ভাববেন না আমার কথা, আপনি পারবেন আপনার চিন্তার মেসিনের সুইচ টিপে দিতে।

স্বগত—না। তা বোধ হয় পারব না।

শ্রীমতি—(উৎফুল্ল) জানেন এতদিনে বোধ হচ্ছে আপনার মনের খোঁজ আমি পেয়েছি। বোঝাতে পারছি জীবনের সব কাজ সুইচ টিপে হয় না।

স্বগত— আমার মনের খবরে আপনার প্রয়োজন? আমার মনের অন্ধকার দূর করতে আপনি এত উৎসুক কেন জানতে পারি?

শ্রীমতি—(হঠাৎ লজ্জা পেয়ে) না।

স্বগত—আপনার কাছে আমি আর যে অপরাধ করিনা কেন, অস্পষ্টতার অপরাধ করিনি। আপনার কথামত আপনার বাবার প্রস্তাবে আমি রাজী হই নাই। অথচ তারপর আপনার বাবা যখন ভাল ভাল পাত্র সন্ধান করে আনলেন—আপনি তাদের সকলকেই অপছন্দ করে ফিরিয়ে দিলেন।

শ্রীমতি—আমি যার যোগ্য—তারা কেউ তার যোগ্য নয়

স্বগত—কিন্তু আপনার যোগ্য কে সে কথাটা স্পষ্ট করে বলুন। কথা দিচ্ছি আপনাকে, নেহাৎ হনুমানের মতো যদি সাগর পার হতে হয় তাকে এনে দেব আপনার কাছে

শ্রীমতি—কেন?

স্বগত—(বুঝতে না পারে) কি বললেন?

শ্রীমতি—কেন? আমার জন্যে আপনার চিন্তা কেন?

স্বগত—চোখের সামনে দেখছি আপনি নিজেকে খালি গুটিয়ে নিচ্ছেন। সকলের সংশ্রব এড়িয়ে এই একা থাকার ইচ্ছা আমার ভাল

লাগে না। আপনাব অসুস্থতাব পেছনে মনে হয় কোথায় মনেব মধ্যে জট পড়েছে।

শ্রীমতি—আচ্ছা একটা কথা সহজ কবে বলবেন? কোনদিন, কখনও আপনি কাক কথা ভাবেন কি না। তখন কেমন মনে হয়?

সুগত—তা জেনে আপনাব লাভ?

শ্রীমতি—লাভ আছে কিনা জানি না কিন্তু আজকে আপনাব কথাব ফাঁকে ফাঁকে কেমন অদ্ভুত সুব বাজছে। আপনাব মনটাকে যত কঠোব জানি—তত কঠোব বলে মনে হচ্ছে না। সেজন্যে জানতে ইচ্ছা হচ্ছে এই কোমলতা কেন।

সুগত—দেখুন আমি যন্ত্র বা দানব নই। সুতবাং মানুষেব অন্যান্য দুবলতা যে থাকবে সেটা স্বাভাবিক। . . স্পষ্ট কবেই বলি। আপনি যেদিন আমায় জানালেন আপনাব বাবা আমাকে নির্বাচন কবেছেন আপনাব জন্য, দেহেব মধ্যে অদ্ভুত একটা বোমাঞ্চকব অনুভূতি উপলব্ধি কবলাম। সেদিনই প্রথম বুঝলাম আপনাব সম্বন্ধে আমাব দুবলতা আছে। সেই প্রথম দিনেব প্রভাব সিযাবি থেকে আজ পর্যন্ত আমাব সেই দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। সবদা মনে হয়েছে কাজ কবে আমি আপনাব যোগ্য হব। তবে তা কখনও প্রকাশ কবি নাই কেন, তা আপনি সহজেই বুঝবেন।

শ্রীমতি—অথচ আমি সবদা মনে কবেছি আপনি আমাব প্রতি বিরূপ হয় তো কিছুটা দম্ভ ছিল সেই চিন্তাধাবায়। আশ্চয না। যে দিন আপনাকে বাবণ কবেছিলাম বাবাব প্রস্তাবে সম্মত হতে, সেদিনও আমাব নিজেব দিক থেকে কোন বাধা ছিল না। শুধু মনে হয়েছিল আপনাব করুণা কবে কবা বিবাহ আমাব সহ্য হবে না।

সুগত—তা হলে এস, এখনও সময় চলে যায় নাই।

শ্রীমতি—না। এখন আমিই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মস্ত বাধা। আমার জন্যে তুমি বড় হয়েছ—কিন্তু নিজেকে আঁকড়ে থেকে আমি পেছনে পড়ে আছি। আমিও যে তোমার সমকক্ষ হতে পারি সে কথা আজ তুমিই আমাকে শেখালে। তোমার সমান না হয়ে তোমার কাছে যাব কেমন করে?

সুগত—আমি এই পাল্লাপাল্লি থেকে বিদায় নিতে এখনই রাজী।

শ্রীমতি—না। তা হলে তুমি আমাকে লজ্জা দেবে। আমাকে ভালবেসে যদি তুমি এত বড় হয়ে থাক তবে আমিই বা তা না পারব কেন। তবে তুমি বড় হয়েছ তোমার বুদ্ধির সাধনায়—আমি বড় হতে চাই হৃদয়ের সাধনায়। তুমি কারখানা গড়েছ—মানুষ যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে। আমি শেখাব যন্ত্রকেও মানুষ করা যায় সেটা হবে এগিয়ে যাওয়ারও আগের কথা। আমাদের জীবনে যদি আপস হয় তবে সমাজের জীবনেও হবে।

সুগত—এ জীবনে তাহলে আমরা ঘর বাঁধব না?

শ্রীমতি—ক্ষতি কি, নাটকের তো সেখানেই শেষ নয়। (সামনে দেখিয়ে) ওঁদের অবশ্য সেটা পছন্দ হবে না।

সুগত—সত্যি ভারি দুঃখ পেলাম।

শ্রীমতি—ছিঃ। এই তো আমাদের জীবনের সুরু। তোমার দুঃখকে প্রশ্রয় দিও না, আমার দুর্বলতার মতো আঁকড়ে ধরবে। এই তো আমাদের মিলন হল মননলোকে। বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয় যদি একসঙ্গে পা ফেলতে পারে তার থেকে আনন্দ আর কিসে? নাটকের সুরুতে তুমি বলেছিলে না তুমি একটি বার্ণাড শ'র চরিত্র—এতদিনেও চিনতে পার নাই কেন আমিও তাই। নাটক সুরু হবার আগেই আমাদের মিলন হয়েছে।

সুগত—(হাসল) জান, তোমার দুর্বলতা তুমি মানুষের স্নেহ, ভালবাসা,

আশা, আকাঙ্ক্ষাকে বড় মনে করলেও নিজে তুমি বুদ্ধিবাদী। আর আমি বুদ্ধিকে জীবনের মূলমন্ত্র করেও তোমার ভালবাসার কাঙ্গাল। তবে ভালই হল, আগুনে পুড়ে পুড়ে আমরা দু'জনাই খাঁটি হব।

শ্রীমতি—লোকে ভাববে, এ গল্পটার উদ্দেশ্য কি হল!

সুগত—উদ্দেশ্য মহৎ এইটুকু বুঝলেই যথেষ্ট। ....আপনার সঙ্গে কাল কখন দেখা হবে?

শ্রীমতি—বিকেলে একটু চা খেতে আসবেন। এবার চলি, ওষুধ খেতে হবে।

সুগত—কাল দেখা হবে। নমস্কার।

(দু'জন দু'দিকে চলে গেল।)

কেবলি ছবি—পটে লিখা

বঙ্গীয় নাট্যসংসদ কর্তৃক ১৮ই বৈশাখ ১৩৬৬ (২রা মে ১৯৫৯) প্রথম অভিনীত হয়। নাটক পরিচালনা করেন শ্রীষোড়শীকুমার মজুমদার ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন—

কল্কি— নাটকের প্রধান চরিত্র —শ্রীঅতুল পণ্ডিত

দেবরাজ } —নাট্যকার — " রমেন লাহিড়ী

যমরাজ } —নাট্যকার — " সোমেন নন্দী

প্রম্পটার — — " গৌর ঘোষ

লোচনবাবু - শিল্পশ্রীর উপদেষ্টা — " গোপাল হাজরা

অনাক— কটো তাগে — " দিলীপ রুদ্র

অচিন্ত্যবাবু— শিল্প ব্যবসায়ী — " পাঁচু মুখোপাধ্যায়

গোঁড়া সমালোচক— — " অজিত কুণ্ডু

মহিলা সমালোচক— — " আরতি গুপ্ত

লম্বা সমালোচক— — " বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

এষা — কল্কির মেয়ে — " উমা দাশগুপ্ত

কেবলি ছবি—পটে লিখা

নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থাদি হয়েছে। সামনের পর্দা ঠেলে একজন পুরুষ ঢুকে সকলকে নমস্কার করল। লোকটির চোখ দুটি জাপানী, চুল কাফ্রীর, নাক সাহেবের আর থুৎনি দ্রাবিড়ীয়। তার নাম একটা আছে—কিন্তু সবাই ডাকে "কঞ্চি"। পোশাক বাঙালী, অর্থাৎ দেখে বোঝার উপায় নাই—সে বাড়ীর চাকর না বাজার সরকার, এমনও হতে পারে সে বাড়ীর বাবুর ছোট ভাই অথবা মেজ ছেলে কিংবা তার শালীর খুড়তুতো দেওর। কঞ্চি পর্দা ঠেলে এগিয়ে এল, তারপর সকলকে আপ্যায়িত করে বলতে লাগল- যেন সারাজীবন লোকজনকে অপ্যায়ন করা ছাড়া সে অন্য কোন কাজ করে নাই।

কঞ্চি - ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের আমি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি। আমাকে এ বাড়ীর কর্তা ডাকেন কঞ্চি, অবশ্য বাবুর বন্ধুরা ডাকে কাঞ্চ, কিন্তু গিন্নিরা ডাকেন কঞ্চি। কাজেই আপনারা যদি আমাকে কঞ্চি বলে ডাকেন, তাহলে সাড়া আমাকে দিতেই হবে। তবে ও নামটা আমার পছন্দ নয়, কেমন যেন বাঁশ না বাঁশপাতার গন্ধ আছে। আমার নিজের নামটাই আমার পছন্দ। এক্ষুনি অবশ্য মনে পড়ছে না—তবে নামটা ভাল।...... ...যাকগে বাজে কথা। নাটকের কথা বলি। আপনারা আজ যে নাটকটা দেখতে এসেছেন সেটা আমার নাটক। না—না—আমার লেখা নয় তার জন্যে তো অনেক লোক আছে। আমার নাটক মানে সেই নাটকে আমিই প্রধান। তবে হ্যাঁ, একটু মুস্কিল আছে, আমার আবার দুটো নাটক আছে।

কোনটা আপনাদের শোনানো যায়? (কিছুক্ষণ আঙ্গুল চুষে নখ কামড়ে ভাবল) ঠিক হয়েছে, নাট্যকারদেরই ডাকা যাক। দেবরাজ, ও দেবরাজ।

(পর্দা ঠেলে নাট্যকার দেবরাজ এলেন। কাপড়, চাদর, পরিপক্ব চেহারা, পাকা চুল, ঠোটে বিদ্রূপের হাসি আর হাতে ছড়ি।)

কঞ্চি—ইনি হলেন বিখ্যাত নাট্যকার দেবরাজ। এঁকে আপনারা—

দেবরাজ—নমস্কার। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আজকের দিনের সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে ভাল নাটক কি করে লেখা হবে। আমার মনে হয়

কঞ্চি—এই সেরেছে রে। সুরু হলে তো শেষ হবে না। ও মশাই শুনুন, এঁরা এখানে আপনার বক্তৃতা শুনতে আসেন নি। কি মুস্কিল। শুনছেন, আপনাকে সভাপতির অভিভাষণ দিতে হবে না।

দেবরাজ—আমার মনে হয় কেবলমাত্র অনুকরণপ্রিয়তা আমাদের দেশের আদি জিনিসকে নষ্ট করে দিচ্ছে। খালি নকলনবিশী করলেই চলবে না, ঘরের দিকে নজর দিতে হবে। যেমন ধরুন ভরতের নাট্যশাস্ত্র, Aristotle-এর শাস্ত্রের থেকে কিছুমাত্র হীন নয়। যদি তাই হত তা'হলে কোনদিন বিস্মৃতির অতল—

কঞ্চি—আচ্ছা বিপদে পড়লাম বাপু। শুনছেন ও মশাই—ও দেবরাজ,—বক্তৃতা দিতে হবে না।

দেবরাজ—কি হল? এত চেঁচাচ্ছ কেন?

কঞ্চি—বক্তৃতা দিতে হবে না। এঁরা সবাই নাটক দেখতে এসেছেন—শুনতে আসেন নি। তাই অনুমতি চাইছি, আপনার নাটকটা অভিনয় করে এঁদের দেখাই।

দেবরাজ—আমার কোন নাটক অভিনয় করতে চাও ?

কঞ্চি—ওই যে……দূর ছাই, নাটকটার নাম মনে আসছে না, মস্ত বড় নাম —'দেশে ভেদে'—না-না 'দেশে দেশে ভেদ'……কি যেন ?

দেবরাজ—ও তুমি ওই "দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে ভেদ নাই আর ভেদ নাই" খানা বলছ ?

কঞ্চি—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দেবরাজ—না।

কঞ্চি—না মানে !

দেবরাজ—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগলে ওই বইখানা একটা classic হোত। দেশে দেশে অনুবাদ হোত। UNESCO কিংবা SEATO বইখানার স্বত্ব কিনত। বিশ্বযুদ্ধও লাগল না, বইটার কদরও কেউ বুঝল না। সবই আমার ভাগ্য। নইলে তুমি কঞ্চি তার অভিনয় করতে চাও! উঃ বড় আঘাত পেলাম। আমার বক্তৃতাকে পর্যন্ত নষ্ট করে দিলে।

কঞ্চি—আপনাকে তো আজ বক্তৃতা দিতে ডাকিনি। চলে যাচ্ছেন যে— শুনুন।

দেবরাজ—বড় দাগা দিলে হে কঞ্চি, বড় দাগা দিলে। (প্রস্থানোদ্যত)

কঞ্চি—আমার সব তৈরী কেবল একটু আপনার মুখের কথা।

দেবরাজ—যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে। (প্রস্থান)

কঞ্চি—দেখুন দিকি। ওকে ডেকে এনে কি বিপদে পড়লাম। চুপচাপ অভিনয় করে দিলে আর কে ধরত। আজকাল আবার নাকি নাট্যকার সংঘ হয়েছে। কি ফ্যাসাদ বলুন দেখি।…… ঠিক হয়েছে। (এক দৌড়ে ভেতর দিয়ে এক ভদ্রলোককে ধরে নিয়ে এল। ষণ্ডের মত চেহারা, ডাকাতের মত গালপাট্টা, ডাক্তারের মতো কব্জি আর মাছের মত চোখ।)

কঙ্কি—ইনি হলেন নাট্যকার ধর্মরাজ। এখনও বিখ্যাত হননি, তবে হবার আশা রাখেন। (ধর্মরাজ কিছু বলার জন্য হাঁ করা মাত্র) আজকে এঁর একখানা নাটক আমরা অভিনয় করব। (ধর্মরাজ হাঁ করে) ইনি অবশ্য বিনয় করে বলেন উনি সে নাটক লেখেন নাই। কিন্তু আমরা জানি নাট্যকার হিসেবে ওঁর নামই লেখা থাকবে। (আবার হাঁ) নাটকের নাম সকলের জানাই স্বাভাবিক, না জানলেও ক্ষতি নাই। এইবার নাট্যকার নাটকটি সম্বন্ধে দু'চার কথা বলবেন। (ধর্মরাজ হাঁ করে) বলার কথা সামান্যই। আমি কঙ্কি হচ্ছি নাটকের নায়ক। আমি যাঁর বাড়ীতে থাকি হরলোচনবাবু একজন খ্যাতনামা শিল্পী। এইবার দৃশ্য। (পেছনে তাকিয়ে দেখে তখনও পর্দা সরে নাই। ধর্মরাজ কথা কথা বলার জন্য হাঁ করে। কঙ্কি ঢাকাই রঙের বাঙ্গাল ভাষায় বলে) হালায় তখন থেক্যা কইছি স্ক্রীনটা টাইনো। ফুরসৎ হইছে না বুঝি ?

স্ক্রীনম্যান—(নেপথ্যে) কও ক্যেনো নাই।

কঙ্কি—হাত নুলি আওড়াইয় বুদ্ধি দেখাইও না।

(হাততালি দিল দুবার, স্ক্রীন সরে গেল। ভেতরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।)

(বীরভূমি ঢঙ্গে) নাটক কি আঁধি মাঝে হবেক নাকি? আলোটা জ্বালুন কেনে। হাতে কি উই লাগিছে ?

(আলো জ্বলে উঠল। অর্থবান লোকের ঘর, খুব রুচি-সঙ্গতভাবে অতি অল্প আসবাবে সাজানো। বিকাল গড়িয়ে যাওয়ায় আকাশের আলো পশ্চিমের জানালা দিয়ে দেখা যায়।

উত্তরদিকে সহজ আলোর প্রাচুর্যের জন্যে উঁচুতে কাঁচের জানলা। ঘরেব ঠিক মধ্যেখানে একটা artistএর easel, তার ওপর দর্শকদের দিকে পেছন করে একখানা বড় ছবি রাখা। Easelএর ঠিক তলে একখণ্ড রঙ করা চট।)

কঞ্চি—এইটা হোল লোচনবাবুর studio. ওই দিকে দিয়ে আসে North light. কি মশাই বলুন না। (ধর্মরাজ হাঁ করে) পাত্র পাত্রী যা আছে তা ক্রমেই দেখতে পাবেন। আপনারা শুধু মনে রাখবেন সন্ধ্যাবেলায় ঘুমোনো লোচনবাবু দেখতে পারেন না। অবশ্য জেগে থাকাটাও পছন্দ করেন না। তাই লোচনবাবুর পায়েব শব্দ পেলেই আমি ঘুমোনোর ভান কবি।……ওই, ওই পায়ের শব্দ পাচ্ছি। (একদৌড়ে চটটার ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ল) এবার আমায় ঘুমুতে হবে। (নাক ডাকাতে লাগল।)

লোচনবাবু (নেপথ্যে)—কঞ্চি—

ধর্মরাজ—(অবশেষে সুযোগ পেয়েছে। কাংসধ্বনিত ত্রিতাল গলায় সুরু করে) আমাব নাম হোল ধর্মরাজ, কঞ্চি বলে ধম্মের ষাঁড়—

(গলায় বাঁশি, হাতে বই প্রম্পটার স্টেজে ঢুকল)

প্রম্পটার—আচ্ছা লোক মশাই আপনি। প্লে আরম্ভ হয়ে গেছে আব আপনি স্টেজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন! কেন এতক্ষণ, বক্তৃতা করে আশ মিটল না!! চলে আসুন!!!

(হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। কঞ্চির নাক ডাকতে লাগল। লোচনবাবু ডাকলেন।)

লোচনবাবু—কঞ্চি, কঞ্চি, কঞ্চে। ওরে হতভাগা। ঠিক ভর সন্ধ্যাবেলায় ঘুমুচ্ছে। (প্রবেশ। মোটাসোটা চেহারা। একটু দাড়ি থাকলেই বা ক্ষতি কি! মাথায় চুল কদমফুলি ছাঁটে ছাঁটা।) হ্যাঁরে

হনুমান। (কঞ্চির নাক ডাকে) হ্যাঁরে জাম্বুবান (নাকের ডাক আরো জোর হয়, লোচনবাবু বাজের মত হাঁক ছাড়েন।) ওরে উল্লুমান! (কঞ্চি ধড়ফড় করে উঠে বসে। তারপর ভীষণ ভয় পাওয়ার অভিনয় করে হামা দিয়ে পালাতে চায়। দিক ভুল করে লোচনবাবুর পায়ের সঙ্গে ঠোক্কর খায়। খেয়ে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে হামা দেয়। লোচনবাবু ডাকেন) কঞ্চি— (কঞ্চি যেখানে ছিল সোজা হয়ে দাঁড়ায়)

কঞ্চি—আজ্ঞে ?

লোচন—ব্যাটা তোকে পই পই করে বারণ করেছি সন্ধ্যাবেলায় ঘুমোস না। তুমি কখন কথা শুনবে ? না ঘুমুলে কি হয়—অ্যাঁ হয় কি ?

কঞ্চি—ঘুমাই তো নি। একটু কেবল শুয়ে—

লোচন—ফের মিথ্যে কথা ? পষ্ট শুনলাম ঘড়ঘড় করে নাক ডাকছে— ডেকে ডেকে গলা ফেটে গেল।

কঞ্চি—তাকিয়ে তাকিয়ে ভাল লাগছিল না। তাই চোখ দুটোকে একটু বিশ্রাম দিচ্ছিলাম।

লোচন—আর নাকটাকেও তালে তালে ডাকাচ্ছিলাম। হ্যাঁরে তোর এই রকম জ্যান্ত জ্যান্ত মিথ্যেগুলো বলতে লজ্জা করে না। কথাগুলোকে ছেড়ে দিলে যে আপনি চলে বেড়াবে।

কঞ্চি—আজ্ঞে—

লোচন—থাক আর ভাঁওতাবাজী করতে হবে না। শোন্ আজ অচিন্ত্যবাবু ওই ছবিটা কিনতে আসবে। খবরদার ৫০০০৲ টাকার একপয়সা কমে ছাড়বিনা। গতবারে ঠকিয়েছিল। ৩০০০৲ টাকায় কিনে ৫৫০০৲ টাকায় বেচেছিল। বুঝলি ? নাকি এখনও ঘুমুচ্ছিস্ !

কঞ্চি—বুঝলাম।

লোচন—আমি 'গরবিনী এনাক্ষী হোটেলে' আছি। সোয়া পাঁচটায় আর পৌনে ছটায় টেলিফোন করব।

কঙ্কি—আলু কিন্তু আর ছবি আঁকতে চাইছে না।

লোচন—ঠিক চাইবে। বেশী করে খেলনা পাতি কিনে দাও। আমি চললাম। (প্রস্থান)

(কঙ্কি গিয়ে ছবিটার সামনে দাঁড়াল। তার মুখে চাপা হাসি। তারপর চট করে বাইরে চলে গেল। দুই সেকেণ্ড পর চোরের মত জানালা দিয়ে একটা যুবক ঢুকল। অনিরুদ্ধ। কয়েকদিন দাড়ি কামান হয় নাই। পেণ্টুলটা জামাটা ময়লা ছেঁড়া। কাবলে চটিটা কর্দমাক্ত। ঘরে এসে চারিদিকে চেয়ে দেখল, তারপর হাতের ব্যাগ থেকে ক্যামেরা, ফ্ল্যাসগান ইত্যাদি বার করে easelএর ছবিটার ছবি তুলতে যাবে, এমন সময় কঙ্কি একদৌড়ে ঢুকে তার হাত ধরে ফেলল। কঙ্কি একটা গলাবন্ধ কোট গায়ে দেওয়াতে তাকে আরও ভদ্র লাগছে।)

কঙ্কি—ওটা কি হচ্ছে?

অনিরুদ্ধ—ছেড়ে দিন না দাদা। ফটোটা তুলি। বিশ্বাস করুন দু'দিন স্রেফ জল খেয়ে আছি।

কঙ্কি—কিন্তু ভায়া বিখ্যাত শিল্পী হরিলোচনের ছবির কপি বাজারে তো আগে বের হলে চলবে না।

অনিরুদ্ধ—সত্যি বলছি আপনাকে copy বিক্রী করার একটুকুও ইচ্ছা নাই। তবে যে কাগজ বেশী দাম দেবে তাকেই plateটা দিয়ে দেব।

কঙ্কি—criticরা দেখবার আগে সেটাও ঠিক হবে না। হরিলোচনবাবুর ছবির dealer অচিন্ত্যবাবু দেখার আগে কোনরকম reproduction নিষেধ।

অনিরুদ্ধ—(হতাশ হয়ে) কয়েকদিন ধরেই কাগজে দেখছি হরিলোচনবাবু আর একখানা ছবি শেষ করেছেন। উঃ সহরময় কি উত্তেজনা। ভাবলাম কোনক্রমে যদি একখানা ছবি তুলতে পারি যে কোন কাগজ অন্ততঃ ৫০০৲ টাকা দেবে—কালকে scoop করার জন্যে।

(বসে পড়ল)

কঞ্চি—সে তো সত্যি কথাই। ওর মত এতবড় শিল্পী দেশে আর ক'টা আছে! বিদেশ থেকে পর্যন্ত লোক আসে ছবি কিনতে।

অনিরুদ্ধ—তাহলে সত্যি দেবেন না ছবি তুলতে?

কঞ্চি—বরঞ্চ আমার একখানা ছবি তুলতে পার।

অনিরুদ্ধ—(আশান্বিত) এই ছবিটাকে background করে?

কঞ্চি—খুব বুদ্ধি দেখি! তাহলে না গেয়ে আছ কেন?

অনিরুদ্ধ—লজ্জায়।

কঞ্চি—কি রকম?

অনিরুদ্ধ—ভাল কিছু করার বুদ্ধি মনে আসেনা, কিন্তু খারাপ কাজ করার বুদ্ধি ঠিক আসে। ছোটবেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে পড়েছি। শুধু শুধু অন্যায় করতে ইচ্ছা করে না।

কঞ্চি—তাহলে ভায়া এখানে একটু অপেক্ষা কর।

(বেগে অচিন্ত্যবাবু ঢুকলেন। মাথায় টাক, বেঁটে আর ভুঁড়ি।)

অচিন্ত্যবাবু—কইরে কঞ্চি। ছবিটা রাগলি কোথায়। কি সর্বনাশ! Photographer! কঞ্চে!!

কঞ্চি—আজ্ঞে বলুন।

অচিন্ত্য—ও কে? ওকে ঢুকতে দিয়েছিস কেন? ওকে ঢুকতে দিয়েছিস কেন ক্যামেরা শুদ্ধ? বারণ করেছি না।

কল্কি—আজ্ঞে তা আমি কি করব, বাবু ওকে দাঁড করিয়ে রেখে গেলেন।

অচিন্ত্য—লোচন ওকে দাঁড করিয়ে রেখে গেছে।

(অনিরুদ্ধ অস্ফুট আওয়াজ করে অবাক হয়)

কল্কি—উনি 'ছেড়ে দে মা' কাগজের সর্বহারা আর্ট critic. আশ্চর্য আপনি ওকে চেনেন না ? ওঁর লেখা যে প্রায়ই বেরোয়। কি নাম যেন আপনার ?

অনিরুদ্ধ—অনিরুদ্ধ .....

কল্কি—হ্যাঁ-হ্যাঁ অনিরুদ্ধ। কৃষ্ণপুত্র অনিরুদ্ধ।

অচিন্ত্য—কই ওই নামের কোন critic বাংলা দেশে আছে বলে তো জানি না। বাংলা দেশের আধুনিক art এর যারা চাঁইলোক তাদের আমি খবর দিয়েছি। এখুনি সবাই এসে পড়বে।

কল্কি—বাবু তাই বলেন।

অচিন্ত্য—কি বলেন ?

কল্কি—বলেন অচিন্ত্য modern artই বোঝে। modern art criticদের বোঝে না।

অচিন্ত্য—বলেন বুঝি ! (ফণাটা ছোট হয়ে গেল)

কল্কি—(ঔষধ ধরেছে দেখে) আরও বলেন modernদের সুযোগ দেয়না অচিন্ত্য, খুব তাডাতাডি back-dated হয়ে যাবে।

অচিন্ত্য—কই ছবিটা দেখি।

(ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চশমা লাগান। তাঁর মুখ দেখে বোঝা যায় ছবিটার কিছুই বোঝেন নি। পরক্ষণেই সে ভাবটা সামলে নিয়ে বলেন)

—বাঃ। বা বা বা বা।

কল্কি—(অবস্থাটা উপলব্ধি করে) কিসের ছবি কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না।

অচিন্ত্য—(মাতব্বরি হাসি হাসে) সেটা তোমাদের কাছে, আমাদের কাছে নয়।

কঙ্কি— অনিরুদ্ধবাবুও তাই বলছিলেন।

অচিন্ত্য—যারা বোঝে তারাই তাই বলবে।

কঙ্কি—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা তো বটেই।

অচিন্ত্য—কি রকম রঙের খেলা দেখেছেন মশাই।

অনিরুদ্ধ—হুঁ।

অচিন্ত্য—অথচ দেখুন রঙ বেশি ব্যবহার করা হয় নাই।

অনিরুদ্ধ—হুঁ।

অচিন্ত্য—আপনি দেখছি বেজায় কম কথা বলেন।

কঙ্কি—ওঁর সব কথা লেখার অক্ষরে। ওঁর মুখ থেকে কথা বার করতে পেরেছে এমন লোক তো বাংলা দেশে দেখলাম না।

অচিন্ত্য—কি বলেন মশাই, masterpiece হয় নাই? কি বলেন।

অনিরুদ্ধ—(বেকায়দায় পড়ে এদিক ওদিক তাকায়, তারপর কাশতে আরম্ভ করে)

অচিন্ত্য—কি হল, কি হল? ওঃ বিষম লেগেছে। ওরে কঙ্কি, জল আন। কথা বলতে গেলেই আপনার বিষম লাগে বুঝি? থাক মশাই, আর কিছু জিজ্ঞাসা করব না। উঃ শেষে খুনের দায়ে পড়ি আর কি।

(সকলে শান্ত হবার পর)

কঙ্কি—(অনিরুদ্ধকে) আপনার দামটা কিন্তু বড্ড কম।

অচিন্ত্য—দাম মানে কিসের দাম। আমি না লোচনের এজেন্ট!

অনিরুদ্ধ—(অনেক ভেবে) না।

অচিন্ত্য—না মানে?

কঞ্চি—ওটা আমার কথার জবাব। বাবু বলেন উনি বেজায় ভাবুক। (হঠাৎ চটার অভিনয় করে) দাম কম নয় মানে—নিশ্চয় কম!

অনিরুদ্ধ—(প্রথমটা ঘাবড়ে যায়, অলক্ষ্যে কঞ্চি এক লাথি কসায়, সেও রাগের অভিনয় করে) না!

কঞ্চি—হ্যাঁ!!

অনিরুদ্ধ—না!!

কঞ্চি—হ্যাঁ!!

অনিরুদ্ধ—না!! (যেন পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত চলবে)

অচিন্ত্য—কত দাম দিয়েছেন উনি? কত দিয়েছেন আপনি?

অনিরুদ্ধ—(থতমত খায়। কঞ্চি পাঁচ আঙ্গুল দেখায়) পাঁচ।

অচিন্ত্য—উঃ মশাই আপনার সঙ্গে কথা বলা প্রচণ্ড পরিশ্রমের ব্যাপার। পাঁচ কি?

কঞ্চি—(চট করে) হাজার—হাজার।

অচিন্ত্য—পাঁচহাজার টাকা দাম দিয়েছেন এই ছবিটার আপনি?

কঞ্চি—উনি নন, একজন Russian.

অচিন্ত্য—Russian! (হতাশ হয়। তার পরেই মনে পড়ে যায়) কঞ্চি আমি লোচনের বিরুদ্ধে মামলা করব। আমি তার agent আর সে কিনা আমাকে লুকিয়ে একজন Russianএর কাছ থেকে offer নিচ্ছে আর তাও এই ছোকরাটাকে দিয়ে। ঠিক বলিনি?

অনিরুদ্ধ—হ্যাঁ।

কঞ্চি—বাবু বলেন গতবার আপনি তাকে ঠকিয়েছেন। তিন হাজারে কিনে সাড়ে পাঁচ হাজারে বিক্রী করেছেন।

অচিন্ত্য—(মাখনের মত নরম) আমার খরচ কিছু কম হয় নাই তো ভাই কঞ্চি। ঘর ভাড়া নেওয়া। প্রদর্শনী করা, কাগজে বিজ্ঞাপন

দেওয়া—সমালোচকদেব……(অনিরুদ্ধের দিকে পেছন করে হাত মুখে তুলে খাবার অভিনয় করে) এই যে দেখ না গোটা কলকাতা সহরের লোক আজ জানে হরিলোচন আর একখানা ছবি শেষ করেছে। এর জন্যে কে দায়ী ? আমি। কম খরচটা করতে হয়েছে কঙ্কে।

অনিরুদ্ধ—(অস্বস্তি অনুভব করে) যাই।

অচিন্ত্য—না না তা কি হয়। আপনার সঙ্গে এখনও বোঝাপড়া বাকী আছে। আপনি যে ঝট্ করে একটা দাম দিয়ে বসলেন—(অনিরুদ্ধ রুদ্ধশ্বাস শোনে। হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। কঙ্কি গিয়ে টেলিফোন ধরে ডুবার মাথা নেড়ে শুরু করে)

কঙ্কি—(ফোনে) পাzালুস্তা নে কৃথা দিতিএ। (ঘরের ভেতর) সেই রুশ ভদ্রলোক। (ফোনে)—কাহ্‌ক ভাঈ পাzাইভাঃ যেতে। (মানে, কেমন আছ।) যা ভাস্ত ভিতে। (ভ-দুটা নিঃশব্দ। মানে, সুপ্রভাত।) (টেলিফোন রেখে দিল) Russian ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করছিলেন—কখন নিতে আসবেন ছবিট—আমি বললাম একটু পরে বলছি।

অচিন্ত্য—(রেগে গেলেন) এসব তোর বদমাইসি, হারামজাদা কঙ্কে। ভেবেছিস কমিশন খাবি হতভাগা। আমার হাতে এক ডজন সমালোচক আছে, রাতারাতি লোচনের ছবির দাম কমিয়ে দেব।

কঙ্কি—ভুলে যাবেন না উনি কৃষ্ণপুত্র অনিরুদ্ধ। একাই একশ'।

অচিন্ত্য—(বাস্তবিক চটে) কতো অমন দেখলাম। হাতিরুদ্র।

অনিরুদ্ধ—(অত্যন্ত ভীত) আমি যাই।

কঙ্কি—(সে কথাটা ঘুরিয়ে, বীরদর্পে বলে) হ্যাঁ যান তো—খবর দিন যত আন্তর্জাতিক সমালোচকদের। অচিন্ত্যবাবুকে দেখিয়ে দিন এক হাত। (অনিরুদ্ধ প্রস্থানোদ্যত, কঙ্কি জনান্তিকে) আর একটু বক ফুলিয়ে যান।

(অনিরুদ্ধ দরজা পর্যন্ত গিয়েছিল। ফিরে এল। তারপর অচিন্ত্যবাবুর সামনে দিয়ে বীরদর্পে চলে গেল। অচিন্ত্যবাবু অবাক হলেন। চিন্তিতও হলেন। উদ্‌গত হাসি ঢাকতে কঙ্কি কড়িকাঠ গুণতে লাগল।)

অচিন্ত্যবাবু—(খুব নরম গলায়) কঙ্কু, কেন শুধু শুধু ঘোরাচ্ছিস্?

কঙ্কি—তা বাবু দাম ঠিক করেছেন আমি কি করব?

অচিন্ত্য—তুই ঠিক করে দাও না কেন?

কঙ্কি—তা আপনি দাম কম দিলেন কেন?

অচিন্ত্য—আমি দাম কম দিই! ওরা ওই ছবি সাড়ে তিন হাজারে কিনবে বল।

কঙ্কি—সাড়ে তিন কোথায়—তিন হাজার

অচিন্ত্য—আর তুই যে পাঁচশো টাকা নিলি—সেটা? মোট আমার পকেট থেকে সাড়ে তিন হাজারই গেল।

কঙ্কি—কিন্তু বিক্রী তো হল সাড়ে পাঁচ হাজারে।

অচিন্ত্য—তা আমার খরচ নাই বুঝি। বিজ্ঞাপন—

কঙ্কি—যাই বলুন এবার বাবু ভীষণ চটেছেন। দাম না বাড়ালে—(বাইরে গাড়ী আসার আওয়াজ) ওই আপনার সমালোচকরা এল।

অচিন্ত্য—(অত্যন্ত নরম) বাবা কঙ্কু, আর যাই করিস, ওই ভদ্রলোকদের সামনে আমাকে বে-আক্কেলে করিস না। তার জন্যে তোকে

কিছু ধরে দেব'খন তোর কমিশনের সঙ্গে। (বেগে প্রস্থান।) (কঙ্কি গিয়ে একটা পাটকরা চাদর ঘাড়ে ফেলল। তাকে আরও গম্ভীর দেখাতে লাগল। অচিন্ত্যবাবু তিনজন সমালোচককে নিয়ে ঢুকলেন। দু'জন পুরুষ, একজন মহিলা। পুরুষ দু'জনের যা বয়েস তার থেকে বুড়োটে হবার চেষ্টা করেছেন, মহিলাটির যা বয়েস তা কমাবার চেষ্টা করেছেন। তার ফলে ফল হয়েছে এক, বিসদৃশ।)

গোল সমালোচক—Nice, বাঃ সুন্দর। (চশমা খুলে মুছে চোখে পরলেন।) Good, উঃ চমৎকার! (দেখতে লাগলেন)

লম্বা সমালোচক—(বক্তৃতা করে) যা ছবি হরিলোচনবাবুঃ। আজ। এঁকেছেন। তা দেখেঃ। আমার একটা কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছেঃ। বলতে ইচ্ছা হচ্ছেঃ। যে। এমন রঙ কেউ দেখায়—না—আই॥ বলতে ইচ্ছা হচ্ছেঃ। যে। এমন রূপ কেউ দেখায় না—আই॥ প্রথমেঃ তাঁর ছবি দেখলেঃ মনে হয়—কিছুই। বুঝলাম না।। কিন্তু যখন অন্তরের। অন্তরাত্মার অগ্নিময় আলোয়। অকস্মাৎ অসতোমাসদ্গময়ের আদেশ ভেসে আসেঃ। তখন মনে হয়। কতো সুন্দর। কতো সাধারণ কতো অপূর্ব ভাব ছবিটার। মধ্যেঃ খেলা করছে। জীবনের দ্যুতির—

মহিলা সমালোচক—Abstract painting.

গোল সমালোচক—Wrong. ভুল। Cubism.

লম্বা সমালোচক—(বক্তৃতার জের টেনে বলে) সেই জীবনের দ্যুতিতে দেখলাম। খাঁটি ভারতীয় শিল্পের অপূর্ব প্রকাশ। আমাদের—কৃষ্টির। আমাদের জীবনধনের—

মহিলা সমালোচক—এ ছবিটার নাম হওয়া উচিত 'মা আর ছেলে'।

গোল সমালোচক—No. এটার নাম হওয়া কর্তব্য 'ধান কাটা সারা হল'।

লম্বা সমালোচক—(সমান বেগে চলে) আমাদের জীবনধনের রক্তে রাঙ্গা নাম দাও। 'ঋক অরণ্যেঃ আগুন লেগেছে—পালিয়ে যায় পশুর পাল।' আমাদের সেই পুরাতন বৈদিক জীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলেই আজ—

মহিলা সমালোচক—আপনারা মশাই ছবির কিছুই বোঝেন না।

গোল সমালোচক—Trash. বাজে কথা বলার জায়গা পেলেন না ?

লম্বা সমালোচক—নারীজীবনের এই যে পুরুষোচিত প্রকাশ। ধিক্কার যোগ্য।

মহিলা সমালোচক—আমার পেছনে তো এখন দল বেঁধে লাগবেনই—সেবার ঠোকর খেয়েছেন কিনা।

গোল সমালোচক—সেবারের কথা তুললেন তো I must say—আমাদের ভুল পথে উনিই (লম্বাকে দেখায়) নিয়ে গিয়েছিলেন। বক্তৃতার ঝোঁকে কি যে বলেন, whereabouts থাকে না। অথচ think করবেন না। কেন বাবা rememberটাকে একটু strong করলেই তো হয়। সাধারণ common sense নাই লোকটার মশায়, সাধারণ common sense নাই।

লম্বা সমালোচক—(খাটি চাষাড়ে ঢঙে) নিজের বক্তিমে কিছু কম হল। আমি মশাই মাটির লোক—মাটির সঙ্গেই সম্পর্ক। আপনাদের মতো উঁচু মাচাও নাই—আর মোটা খুঁটিতে নৌকা বাঁধাও নাই।

গোল সমালোচক—ছোটলোক ইতরটা দিনে দিনে extremeএর বাইরে চলে যাচ্ছে।

মহিলা সমালোচক—বার্নার্ড শ' সাধে বলেছেন আপনারা আর আমরা দুই জগতের জীব !

লম্বা সমালোচক—জীব ! জীবই বটে !

মহিলা সমালোচক—মুখ সামলে কথা বলবেন মশাই! (বিতণ্ডা)

অচিন্ত্য—ও মশাই শুনুন শুনুন। মশাইরা—

কল্কি—কি বিপদেই পড়লাম। (মুর্শিদাবাদী ঢঙ্গে) একটু আস্তে গোলমাল করেন কেনে। বাড়ীর মধ্যি যেন তিনটা কপাট বদাম বদাম করে পড়তে লেগেল্ছে।

গোল সমালোচক—Why do you come to talk in the centre of the talk? Come to talk behind my talk?

কল্কি—(মুর্শিদাবাদী ঢঙ্গে) কতি যাতি বলছেন?

(সমালোচকরা সে কথায় কান দেয় না)

মহিলা সমালোচক—আমি বলছি রঙের ব্যবহারে Flemish Schoolএর স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। কেউ যদি দেখতে না পায় সে কানা।

লম্বা সমালোচক—নন্দন না। নন্দলাল। রঙের ব্যবহার দেখা গেছে অজন্তায়, বাঘ গুহায়, [illegible]—

গোল সমালোচক—Ridiculous. Monetian high light দেখছেন না? Detail-এর blurred. ওর colour combination কি রকম প্রখর মানে bright

মহিলা সমালোচক—গোড়া থেকেই আপনারা ভুলপথে যাচ্ছেন।

গোল সমালোচক—Never. কখনো না।

লম্বা সমালোচক—ঐতিহ্য কৃষ্টি-সংস্কারকে আপনারা অস্বীকার করেন।

মহিলা সমালোচক—Certainly not, আপনি বরঞ্চ সব জিনিষেই ভারতের প্রভাব দেখতে পান—আর ঐতিহ্য ঐতিহ্য করে লাফান।

লম্বা সমালোচক—কদাচ নহে!

অচিন্ত্য—দেখুন কিছু মনে করবেন না। আপনারা মনস্থির করতে পারলেই—

গোল সমালোচক—(ছবিটার কাছে গিয়ে) এইটা, এইটা flemish না abstract ? বলুন ? (সবাই ছবির কাছে যান।)

লম্বা সমালোচক—আপনার cubism কোনটা এইটা না এইটা ? অন্য কোথাও এটাকে Monetian বললে Monetianরা উত্তম মধ্যম দিয়ে দেবে।

মহিলা সমালোচক—অজন্তার কোনখানে এই রঙটা আছে। আর এই রঙটাই বা কোথায় আছে ? 'পটল চেরা' ছেড়ে দিলাম, চোখই বা কোথায় ? তাহলে বলছিলাম চমৎকার abstract.

গোল সমালোচক—Childish ! Cubism !

লম্বা—খাঁটি ভারতীয় রীতির প্রকাশ। ১ম সমান বাজো জন্মেজয়—

(কঙ্কির গলা। ভেসে আসে টেলিফোনে। টেলিফোন কখন বেজেছে কেউ শোনেনি। বিজাতীয় ভাষায় সব স্তব্ধ।)

কঙ্কি—(টেলিফোনে) নি হাও মা। উও হান হাও।

(উচ্চারণ হবে যেন শেষবারে—'আমার জন্মভূমি' গানের সুরের মতো। প্রেমে যাবার আগে যেমন করে ওই কথা তিনটি বলা হয়। ওই দুটি কথার আসল মানে তুমি কেমন আছ ? আমি ভাল আছি।)

অচিন্ত্য—কে ফোন করছে কঙ্কি ?

কঙ্কি—একজন চীনাম্যান।

অচিন্ত্য—চীনাম্যান ছবি কিনবে ?

কঙ্কি—এখুনি আসছে। বলল টাকা নিয়ে আসছি।

মহিলা সমালোচক
গোল সমালোচক
লম্বা সমালোচক } আসছে। এক্ষুনি ?

অচিন্ত্য—হ্যাঁরে কঙ্কি, তুর ব তো সুব কবে ছোট ছোট কি বললি তাব মধ্যে অত কথা বলা হযে গেল ?

কঙ্কি—হুঁউঁউ। চীনা ভাষা যে। চীন ভাষাব বড বড কথা লেগে একটা অক্ষবে। ওঁদেব জিজ্ঞাসা করুন। ওঁবা এসব জানেন।

গোল সমালোচক—Exactly. ঠিক তাই ঠিক তাই।

মহিলা সমালোচক—স্বল্পে প্রকাশ কবাব অদ্ভুত ক্ষমতা চীনেদেব।

লম্বা সমালোচক—সেইজন্যে মুনিঋষিবা প্রাচীন যুগে চীনেব সঙ্গে—

অচিন্ত্য—আমি বলি কি—ছবিটাব সমালোচনা এই বকম কবলে কি হয়—ধরুন 'abstract cubism এব ভাবতীয় প্রকাশ"।

কঙ্কি—কিংবা ভাবতীয় বীতিতে abstract cubism

গোল সমালোচক—Not a bad idea.

লম্বা সমালোচক—প্রকাশটা কিন্তু ভাবতীয়। আমাদেব কৃষ্টিব—

মহিলা সমালোচক—Abstract Painting স্বীকাব কবলেই আমি খুসী।

অচিন্ত্য—বাঃ এই তো ভাল হল। তা হলে আপনাদেব সমালোচনাগুলো কালকেই কাগজে বেরুবে তো।

গোল সমালোচক—Certainly নিশ্চয। অযথা দেবী কবা আমাব স্বভাব নয।

অচিন্ত্য—বুঝতেই তো পাবছেন আপনাদেব সমালোচনাব উপবেই ছবিটাব দাম নির্ভব কববে।

গোল সমালোচক—হ্যাঁ তা তো বটেই।

লম্বা সমালোচক—(গোলকে) শুনুন

মহিলা সমালোচক—(গোলকে) আমাদেব আলোচনাটা কবে নিই।

(তিনজন চুপিচুপি আলোচনা কবল)

অচিন্ত্য—সেবেছে বে। এইবাব সেবেছে।

গোল সমালোচক—আপনি দামের কথা বলাতে মনে পড়ে গেল অচিন্ত্যবাবু। আমাদের কিছ—

অচিন্ত্য—আর বলতে হবে না বুঝতে পেরেছি। এই নে। (প্রতিজনকে ১০০ টাকার একখানা করে নোট দিলেন। কাহিনের শেষে কল্কি হাত পেতে দাঁড়ায়) তুই আবার হাত পেতে দাঁড়িয়েছিস যে। তুই কি করবি এটা?

কল্কি—না আমাকে দেবেন না। বাবা গো—আমায় কিছু দেবেন না।

অচিন্ত্য—তুই সুনাম পেলি অথচ নিবি না। উঃ এই বুদ্ধিটা বার করতে মাথা ফেটে যাচ্ছিল।

কল্কি—(মোক্ষম চাল দেব।) আপনি বুদ্ধি বার করলেন কখন? ওঁরাই তো সব বলে দিলেন। কি বলেন তাই না?

মহিলা সমালোচক—নিশ্চয়ই ওর কৃতির কিছু পাওয়া উচিৎ।

অচিন্ত্য—অন্যের টাকা হলে সবার সমানই কিছু পাওয়া উচিত হয়।

মহিলা সমালোচক—[illegible]। কাল কাগজে লিখব ভারতীয় [illegible] abstract cubism নামটি শ্রীমান কল্কির—আপনার ভালো নাম কি?

কল্কি—শ্রীকল্কি

মহিলা সমালোচক—শ্রীমান শ্রীকল্কি দেওয়া যাবে।

গোল সমালোচক—তারপর শ্রীকল্কিকে তাত্ত্বিক সমালোচক পর্যায়ে তুলে দেওয়া যাবে

অচিন্ত্য—আর আমাকে দেউলে করা হবে। রক্ষা করুন মশাই। কল্কে এই নে। (একখানা দশ টাকার নোট দেয়)

কল্কি—(নোটটা নিয়ে মহিলার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়) দেখুন মা। আপনি বিচার করুন। আমি কিছু বলব না।

মহিলা সমালোচক—ছিঃ অচিন্ত্যবাবু!

অচিন্ত্য—(প্রথমে একখানা দশটাকার নোট দেয়। মহিলা তখনও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে আরেকখানি পাঁচটাকার নোট দিয়ে বলেন) না আর না যথেষ্ট হয়েছে !

মহিলা সমালোচক—আর দশটাকা দিন তাহলেই হবে।

গোল সমালোচক—Afterall আপনার কাছে দশটাকা আর কি !

লম্বা সমালোচক—উঃ কি ঐতিহ্য কি জ্ঞান—কি পাণ্ডিত্য—

অচিন্ত্য—(তাড়াতাড়ি দিয়ে) এই যে, এই যে, দিয়ে দিয়েছি !

গোল সমালোচক—আমরা তা'হলে চলি অচিন্ত্যবাবু। হেঁ হেঁ।

অচিন্ত্য—অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। আচ্ছা হেঁ হেঁ।

(সমালোচকগণ প্রস্থান করলেন। অচিন্ত্যবাবু তাদের গাড়ীতে তুলে দিতে গেলেন। ফোন বাজল।)

কঙ্কি—হ্যালো। ও অনিরুদ্ধ। অ্যাঁ ? কালোয়ার। আচ্ছা। বেশ। বেশ। নিয়ে এস।

(ফোন রেখে দিল। অচিন্ত্যবাবু এলেন।)

অচিন্ত্য—নে কঙ্কি তাড়াতাড়ি শেষ কর। অনেক রাত হল।

কঙ্কি—করুন, আমার তো এক কথা।

অচিন্ত্য—ঠিক করে বল কত বলেছে লোচন।

কঙ্কি—সাড়ে পাঁচ হাজার।

অচিন্ত্য—দেখ কঙ্কি অধর্ম করিস্ না।

কঙ্কি—বেশ। তাহলে ছবি রাশিয়া চলল। চীনাম্যানই কি কিছু কম দেবে নাকি ? ওরা অত পয়সার মায়া করে না।

অচিন্ত্য—তবে তাই কর গিয়ে......কঙ্কু বাপ, আমি মরে গেলে কি তোর আনন্দ হবে ?

কঙ্কি—ছি ছি সে কি কথা !

অচিন্ত্য—আমাকে মারিস না বাবা—তোর হাতে ধরছি। শোন ছবিটার দাম দিই তিনহাজার আর তোকে দিচ্ছি পাঁচশো।

কল্কি—পাগল আর কি!

অচিন্ত্য—তোকে না হয় আরও পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেব।

কল্কি—উঁহু।

(অনিরুদ্ধ এল। সঙ্গে একজন লম্বা চওড়া কালোয়ার—নাম কালু। বিশাল কালো চেহারা। পালোয়ানি গোঁফ।)

কালু—কোন বাবুর সাথ কোথা বোলতে হবে বলুন।

অচিন্ত্য—(অনিরুদ্ধকে) আপনি আবার এসেছেন?

অনিরুদ্ধ—(অনিরুদ্ধ ভাবে কি উত্তর দেবে। শাইত দেখছি।

কালু—হামি শুনেছে যে ছবিকা business মে বহুত মুনাফা থাকে। ওহি বাস্তে হামি বোলল একবার থোড়া কোসিস করনা চাহিয়ে।

কল্কি—এই তো ছবি, কতো দেবেন বলুন।

কালু—ঢাই—

কল্কি—আড়াই এ কিছু হবে না। ইনি তিন দিয়েছেন—cash down.

কালু—তিন তো হামি ভি দিতে পারি।

কল্কি—ওর সঙ্গে আরও আছে কমিশন। আর এক ভদ্রলোক পাঁচ দিয়েছেন।

অচিন্ত্য—(তাড়াতাড়ি) টেলিফোন offer. Cash down তো নয়!

কল্কি—বাবু কিন্তু বলেছেন সাড়ে পাঁচের কমে ছাড়া হবে না।

কালু—(অনিরুদ্ধকে) এ বাবু এ ছবিতে তো হাজার রুপেয়া জরুর হোবে।

অনিরুদ্ধ—হাজার রুপেয়া। জরুর জরুর।

অচিন্ত্য—হাজার রুপেয়া কি বলছেন, তার থেকে অনেক অনেক বেশী দাম হবে।

কল্কি—হাজার টাকা! কি বলছেন আপনি?

কালু—ঠিক আছে ভাই। সাড়ে পাঁচই হামি দেব আউর দো পারসেণ্ট কমিশন—উয়ো তো হায় এগারো রূপেয়া।

কল্কি—এগার টাকা? কতো দাম দেবেন পুরো করে বলুন দেখি?

কালু—কেন সাড়ে পাঁচশো রূপেয়া।

অচিন্ত্য—সাড়ে পাঁচশো—হা হা-হা।

অনিরুদ্ধ—শ-ওহাব!

কল্কি—আরে মশাই। হাজার হাজার। পাঁচ হাজার টাকা দাম পেয়েছি।

কালু—হাজার! (গিয়ে ছবি দেখে) হয়ে কিসকা picture? ইস্‌কা এতনা দাম! ওজন ভি নেহি আছে। রঙ ভি নেহি আছে। নেহি মশাই হাম চললো—ও ছবি হাম নেবে না। নারগিস্‌কা ছবি হোলে একহাজার দিতাম।

(প্রস্থান)

অনিরুদ্ধ—(হঠাৎ খেয়াল হয় চলে গেছে) নেবে না কেন এমন চমৎকার……

(প্রস্থান)

অচিন্ত্য—কল্কে Russianটা যদি পাঁচ হাজার দেয় তুইতো আর কিছু পাচ্ছিসনা। আমি বলি কি সাড়ে তিন হাজার টাকা দাম থাক। আর তোর কমিশন হোক সাতশো। কি বলিস্?

কল্কি—কিন্তু বাবু কি বলবেন?

অচিন্ত্য—বাবুকে তুই সামলাতে পারবি তা আমি জানি।

কল্কি—তবুও—

অচিন্ত্য—আর তবুও করিস্‌না বাবা। এইখানেই শেষ কর।

কল্কি—কিন্তু—

অচিন্ত্য—কিন্তু কিছু নাই। আবে বাবা ছবিব দাম তো ধাপে ধাপে একটু বেড়ে উঠবে, না কি একদিনে বাজা বাদশা হবে—

কল্কি—তাই তো ভাবছি।

(একজন সুবেশা সুন্দরী তরুণী এল।)

এষা—বাঃ, তোমাব ভাবী অন্যায়। ভালুকে দিয়ে—(অপবিচিত লোক দেখে থেমে যায়।)

অচিন্ত্য—তোমাব মেয়ে নাকি কল্কি? বেশ বেশ।

কল্কি—খেঁদি, তুই কখন এলি?

এষা—এইতো আজ সকাল বেলায়। বাড়ীতে যা কাণ্ড তুমি কবেছ বাবা—

অচিন্ত্য—তোমাব নামটি কি মা?

এষা—শ্রীমতী এষা—

অচিন্ত্য—বাঃ বাঃ সুন্দব নাম—তা কল্কি কেন খেঁদি বলে ডাকে?

কল্কি—খেঁদি তোকে এখানে আসতে কে বলেছে?

এষা—তোমাব কাণ্ড দেখে চুপ কবে বসে থাকা যায় না বাবা—

অচিন্ত্য—কোথা থেকে আসা হচ্ছে মা?

এষা—পাটনা থেকে। সেখানে পিসামাব কাছে থেকে পড়াশুনা কবি।

অচিন্ত্য—ও ভাল ভাল। কতদূব পড়েছ মা?

এষা—এবাব বি. এ. পাশ কবেছি।

অচিন্ত্য—বাঃ খুব ভাল। কল্কি কোনদিন বল নাই তো তোমাব মেয়ে বি. এ. পড়ে। তোমবা কটি ভাইবোন মা?

কল্কি—খেঁদি বাড়ী যাবি না মাব খাবি ছোটবেলাব মত?

এষা—তুমি আবাব চেঁচাচ্ছ বাবা। ওইটুকু দুধেব ছেলেকে দিয়ে—

কল্কি—অচিন্ত্যবাবু আমি আপনাব দবে বাজী।

অচিন্ত্য—সাড়ে তিন আর সাত।

কঙ্কি—হ্যাঁ। সাড়ে তিন আর সাত। কিন্তু এক সর্তে

অচিন্ত্য—আবার কি সর্ত ?

কঙ্কি— এখুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে।

অচিন্ত্য—চলে যেতে হবে ! মাথা খারাপ হোল নাকি তোমার ?

কঙ্কি—তিন গোনার সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে হবে। নইলে ছবির দাম—

অচিন্ত্য—ছবির দাম !

এষা—ছবির কথাই তো বলতে চাই।

কঙ্কি— এক।

অচিন্ত্য— আচ্ছা, আচ্ছা যাচ্ছি।

কঙ্কি—দুই।

অচিন্ত্য—চলি মা। আবার দেখা হবে। বড় আনন্দ পেলুম আলাপ করে।

কঙ্কি—তিন।

অচিন্ত্য—যাচ্ছিরে বাপু—যাচ্ছি—যাচ্ছি। (প্রস্থান)

এষা—বাবা তুমি আলুর কি অবস্থা করেছ !

কঙ্কি—চুপ কর। বুড়োটা এখনও সিঁড়িতে আছে।

এষা—চুপ করব ! ওই সাত আট বছরের ছেলে, এখনও প্রথম ভাগ শেষ করে নাই…তুমি তাকে স্কুলে পর্যন্ত যেতে দাও না…

কঙ্কি—যেতে দিই না কি আর সাধে !

এষা—যেতে দাও না পাছে বেরিয়ে পড়ে লোচনবাবু একজন ঠগ। তাঁর একটা ছবিও তার নিজের আঁকা নয়, ওই সাত বছরের ছেলে আলুর আঁকা !

কঙ্কি—চুপ কর চুপ কর। কে শুনে ফেলবে।

এষা—শুনুক তাই আমি চাই। ছেলেটাকে তুমি বাড়ী থেকে পর্যন্ত বার হতে দাও না। গুচ্ছের খেলনা দিয়েছ। খাবার দিয়েছ, বিস্কুট, লজেন্স, মিষ্টি দিয়েছ। পড়াশোনার নামগন্ধ পর্যন্ত নাই।

কল্কি—কেন আমি তো রোজ সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা করে পড়াই।

এষা—কি পড়াও, আমার বেশ জানা আছে।

কল্কি—মুখ সামলে কথা বলবি খেঁদি। তোর মত বিদ্বান না হতে পারি, তবুও প্রথম ভাগটা পড়াবার ক্ষমতা আমার আছে।

এষা—তাহলে ছবি আঁকাটাও তো নিজে করলেই পারতে। আমি তো সব দেখে শুনে থ বনে গিয়েছি। ওইটুকু ছেলেকে দিয়ে যত হিজিবিজি আঁকাবে—যার না আছে মাথা—না মুণ্ডু। তারপর মস্ত মস্ত সমালোচনা লিখবে—এমন ছবি আগে দেখা যায় নাই। লোচনবাবু মিটিং করবেন। শিল্পশ্রীর উপদেষ্টা হবেন। তোমরা কি।

কল্কি—রোজগার না করলে হবে। তাছাড়া সবাই এই করে।

এষা—এটাকে রোজগার বলে না, একে বলে জোচ্চুরি আর ভাওতাবাজী। আমি বলে দিচ্ছি বাবা তো আর পারবে না। তালুকে আমি নিয়ে যাব আমার সঙ্গে।

কল্কি—দেখ সে সব কথা পরে হবে, এখন বাড়ী চল।

এষা—আমার ইচ্ছা করে তোমাদের লোচনবাবুকে একবার মুখোমুখি পাই। মুখোস খুলে দিই লোকটার।

কল্কি—আচ্ছা আচ্ছা বাড়ী গিয়ে আলোচনা করা যাবে। ওরে পরদাটা টান্। (দর্শকদের বলে)

—একটা কথা কিন্তু সত্যি বলছি আপনাদের, আমি এত খারাপ না। আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না। ওই মেয়েটার আসার কথা ছিল না। ও এসেই সব গণ্ডগোল করে দিল।

এষা—বাবা, এস তাড়াতাড়ি।

কল্কি—যাই রে যাই। (দর্শকদের) আর যদি বিশ্বাসই করে বসেন আমি এই রকম, তাহলে ভেবে দেখবেন টাকার জন্যে লোকে কি না করে।

(এষা গিয়ে ছবিটার সামনে দাঁড়ায়)

এষা—ছবি হয়েছে না হাতী হয়েছে। খানিকটা খানিকটা জ্যাবড়া জ্যাবড়া রঙ—ছেলেমানুষের কীর্তি এই নাকি তোমাদের অপূর্ব ছবি!

(যদি সত্যি ছবি রাখা সম্ভব হয় তাহলে এই সময়ে সেটা ঘুরিয়ে দেওয়া চলবে দর্শকদের দিকে।)

কল্কি—আর একটা কথা বলে নিই। এ নাটকটার সিনেমাতে অনেক সম্ভাবনা আছে। অনিরুদ্ধকে নায়ক করে প্রেমের জোয়ারও বেশ তোলা যাবে। আর হাওড়া স্টেশনে নেমে আমার মেয়ে যদি আর কৃষ্ণপুত্র অনিরুদ্ধের খানিকেনেক ডুয়েট—ওঃ জমে বরফ হয়ে যাবে বই। ছেলেটা ভাল করে গুছিয়ে মিথ্যে কথাও বলতে পারে না।

এষা—মা ঠিকই বলে জান বাবা—বকতে পেলে তুমি আর কিছু চাও না। এস। (টানতে টানতে নিয়ে চলে।)

কল্কি—(পরদার পেছন থেকে) আচ্ছা চলি। নমস্কার।

জোর

শ্রীমতি অ—একজন বিবাহিত তরুণী

শ্রীমতি ই —একজন অবিবাহিতা তরুণী

অগাস্ট স্ট্রিন্‌বার্গের —The Stronger-এর অনুবাদ

জোর

রেস্তোরাঁতে একটি ঘর। ছোট ছোট টেবিল ঘিরে দুখান, চারখান চেয়ার। শ্রীমতি 'অ' বিবাহিতা। গায়ে দামী ওভারকোট। হাতে সুন্দর একটি জাপানী হাতঘড়ি। শ্রীমতি 'ই' অবিবাহিতা। তিনি সামনের গেলাস থেকে খড় দিয়ে চুমুকে চুমুকে পানীয় খাচ্ছেন, আর মাসিকপত্র পড়ছেন। একখানা পত্রিকা দেখা হয়ে গেল। অন্য একটা বার করে ছবি দেখতে লাগলেন।

শ্রীমতি ই আগে থেকে বসে আছেন। শ্রীমতি অ ঢুকলেন।

শ্রীমতি অ—আরে মিলি, তুমি এখানে চুপ করে বসে! আচ্ছা মেয়ে বাপু তুমি। বড়দিন এসে গেছে আর তুমি একলাটি আইবুড়োর মতো বসে আছ!

(শ্রীমতি ই মুখ তুলে হাসেন। তারপর আবার পত্রিকা দেখতে থাকেন।)

শ্রীমতি অ—সত্যি কথা বলি। তোমাকে এইরকম একলাটি বড়দিনের সময় চুপ করে বসে থাকতে দেখে আমার সত্যি কষ্ট হচ্ছে। সেই কি রকম জান—বিয়ের দিন বর গিয়েছে খেলা করতে—আর কনে গল্পের বই-এ ডুবে আছে। ভাব দেখি—বিয়ের দিনে একজনা খেলা করছে, অন্যজনা বই পড়ছে। সে বিয়ের ফল যা হবে তা আর বলে দিতে হয় না।

(লোক এসে 'অ'-কে এক কাপ কফি দিয়ে গেল।)

শ্রীমতি অ—(কাপে চুমুক দিয়ে) আমি ছেলে মেয়েদের জন্যে কি কিনেছি দেখবে? এই দেখ, এই পুতুলটা মেয়ের জন্যে।

আর এই বন্দুকটা কিনেছি ছেলের জন্যে। অবশ্য ছিপি বন্দুক। কেমন—ভাল হয় নাই ?

(বন্দুকটা টেনে কটাস্ করে আওয়াজ করেন। শ্রীমতি ই চমকে ওঠেন।)

—ওকি তুমি ভয় পেলে নাকি ? তোমার বুঝি মনে হল, আমি তোমাকে মেরে ফেলব ? কি মেয়ে বাবা ! তবে হ্যাঁ, তুমি যদি আমাকে গুলি করে মারতে চাও, সেটা আমি বিশ্বাস করব। আমার জন্যেই না তোমার ইচ্ছাটা পূর্ণ হল না। তা' কি করব বল ভাই—ইচ্ছা করে তো আর আমি তোমাদের মাঝে পড়িনি। তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না জানি। কিন্তু সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর ভাই, তোমাকে রয়াল থিয়েটার থেকে তাড়াবার ভেতর আমি ছিলাম না। আমি দিব্যি পর্যন্ত করতে পারি। জানি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না। তা'হলে কিছু বলা বৃথা।······

(ঝুড়ি থেকে একজোড়া চটি বার করে)

—এই দেখ। এই চটিজোড়া আমার কত্তার জন্যে কিনেছি। বেশ সুন্দর, না ? কেবল ঐ ফুলগুলো। আমি যত ফুলতোলা জিনিস অপছন্দ করি—আমার কত্তাটির তেমনি ফুলতোলা জিনিষ পছন্দ—মায় চটিটাও ফুলতোলা হওয়া চাই।

(শ্রীমতি ই মুখ তুলে তাকান। মুখে জিজ্ঞাসা আর শ্লেষ।)

শ্রীমতি অ—(হাত দুটো চটির মধ্যে ভরে দিয়ে) কি ছোট্ট ছোট্ট পা ওর, না ? দেখ ! কিন্তু যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে—বেশ লাগে। তুমি তো আর কখন ওর খালি পা দেখনি, ওর পা যে কতো ছোট্ট জানবে কেমন করে !

(শ্রীমতি ই জোরেই হাসেন)

—এইবার বাবু আসছেন। (শ্রীমতি ই আবার হাসেন।)

—এইবার ও চটে গেছে। মাটিতে লাথি মেরে বলছে 'কেন ঠাকুরটা এতদিনেও একটু ভাল করে কফি বানাতে শিখলনা!' কিংবা বলছে 'তোমার ওই বোকা ঝিটা রোজ আমার টেবিলের আলোটাকে উল্টো করে রেখে যাবে।' তারপরেই ধর দরজার তলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এল, 'উ' কি ঠাণ্ডা হাওয়া। গাধাগুলো দরজা বন্ধ করে যে বাড়ীটাকে গরম রাখতে হয় এটুকুও জানেনা।'

(একটা চটিকে অন্যটায় ঘসে যথাযথ অভিনয় করেন।

শ্রীমতি ই অনেকক্ষণ ধরে হাসেন।)

শ্রীমতি অ- বাইরে থেকে বাড়ী ফিরে ও বলে চটিটা কোথায় গেল। চটিটাকে তো আমাদের ঝি টেবিলের তলায় ঠেলে দিয়েছে।..... না সত্যি নিজের স্বামীকে নিয়ে এই রকম ফাজলামো করা উচিত নয়। ও কিন্তু সত্যি খুব ভাল এমনিতে। জান, তোমার ওইরকম একটা স্বামী থাকা উচিত ছিল। হাসছ যে? হাসছ কেন বলনা। তারপর আমার স্বামী খুব বিশ্বাসী, কখনও কোন মেয়ের দিকে তাকায় না। সে আমাকে নিজে বলেছে। হাসছ কেন মুখে কাপড় দিয়ে। হাসির এতে কি হল?.. ...সেবার আমি যখন বেড়াতে গিয়েছিলাম এক বেটি ওকে নষ্ট করতে চেষ্টা করেছিল। ভাগ্যিস আমি ছিলাম না। থাকলে আমি তার চোখ দুটোই গাবলে তুলে নিতাম। আমি ফিরে আসা মাত্র ও আমাকে সব বলল। ও আগে বলল তাই—অন্যের কাছে প্রথম শুনলে আমি বিশ্বাসই করতাম না যে ও নষ্ট হয়নি।......(একটু থেমে) কেন জানি না যত মেয়েগুলো

সব আমার স্বামীটাকে নষ্ট করার জন্যে হাঁ করে আছে। বোধহয় ও একজন সরকারী চাকুরে সেইজন্যে। সবাই মনে করে ওকে ধরে খানিক সুবিধা করে নিতে হবে। ......কি জানি বাবা হয় তো তুমিও ওকে ধরবার জন্যে ফাঁদ পেতেছিলে। তোমাকে বাপু আমি খুব বিশ্বাস করি না। তবে তোমাকে ও কখনও পছন্দ করেনা। তোমার ওর ওপর তার জন্যে রাগ নাই তো?

(কিছুক্ষণ চুপচাপ। দু'জনা দু'জনের দিকে অস্বস্তিকর ভাবে তাকিয়ে থাকেন।)

—বেশ তো চল না আজ আমাদের বাড়ীতে যাবে। অন্তত: আমার ওপর যে তোমার রাগ নেই এটা তো প্রমাণ হবে। সত্যি বাপু তোমার সঙ্গে আমি শত্রুতা করব—ভাবতেও অস্বস্তি লাগে। সেবার যখন তোমার সামনে পড়ে গেলাম, ঠিক জানি না তুমি কি ভাবছ এমন সময়—

(শ্রীমতি অ একটু থামেন। শ্রীমতি ই তাঁর মনোভাবটাকে বুঝতে চেষ্টা করেন। দু'জনাই চিন্তান্বিত।)

শ্রীমতি অ—মনে পড়ে তোমার, কি রকম অদ্ভুতভাবে আমাদের আলাপ হয়েছিল। তোমাকে চোখের আড়াল করতে পারছি না। তোমার কাছে যেতেও পারছি না। অথচ যেখানে যাচ্ছি— দেখি তুমি আমার বড্ড কাছাকাছি। তোমাব শত্রু হবার সাহস ছিল না, তাই তোমার বন্ধু হলাম। কিন্তু যখনই তুমি আমাদের বাড়ীতে আসতে, কোথায় যেন তাল কেটে যেত। আমার স্বামী তোমায় পছন্দ করত না। গায়ের থেকে বড় পোষাকের মত তোমাদের সম্পর্ক ছিল। কিছুতেই সে তোমাকে

সহ্য করতে পারত না। তারপর যখন সে তোমাকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে গেল, তখন তোমাদের দেখে মনে হত—এতদিন বোধহয় ইচ্ছা করেই তোমরা নিজেদের আসল রূপ ঢেকে রেখেছিলে। কিন্তু আশ্চর্য কি জান? আমার একটুকুও হিংসা হয় নাই। তারপর আমাদের ছেলের অন্নপ্রাশনে যখন তুমি এলে—তোমাদের দেখে মনে হচ্ছিল তোমরা যেন মস্ত একটা অপরাধ করেছ।...সত্যি এ কথাটা তো আমার মনে হয় নাই।...কি চুপ করে আছ যে? এতক্ষণ ধরে আমি খালি বকে যাচ্ছি, কিন্তু তুমি তো একটা কথাও বল নাই। তুমি চুপ করে বসে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছ। গুটিপোকার ভেতর থেকে যেমন সিল্ক বেরোয় তুমিও তেমনি ওইখানে বসে বসে আমার যত ভাল ভাবনা, খারাপ ভাবনা সব টেনে বার করছ। হুঁ দাঁড়াও ভাবি। ও তোমাকে বিয়ে করার কথা আর একদিনও বল্‌ল না কেন? তুমি তারপর থেকে আমাদের বাড়ীতে আর কখনও যাও না কেন? এমন কি আজও যেতে তোমার কেন ইচ্ছা নাই?

(শ্রীমতি ই এইবার কিছু বলতে যান)

শ্রীমতি অ—থাক তোমায় আর কিছু বলতে হবেনা। সবই স্পষ্ট বোঝা গেছে। এই হচ্ছে তোমাদের ব্যাপার। হ্যাঁ হ্যাঁ সব ঠিক ঠিক মিলছে। ছিঃ ছিঃ তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। তোমার সঙ্গে এক টেবিলে বসতেও ঘেন্না করে। (অন্য টেবিলে গিয়ে বসলেন) যেহেতু তুমি ফুলতোলা জিনিস পছন্দ কর তাই আমাকে সব জিনিসে ফুল তুলতে হবে। (চটি জোড়া ছুঁড়ে ফেলে দিলেন) তুমি সমুদ্রের গন্ধ সহ্য করতে পারনা বলে প্রতি গ্রীষ্মে আমাদের পাহাড়ে যেতে হবে। তোমার বাবার নামে,

আমার ছেলেব নাম রাখতে হবে। বুঝেছি সব বুঝেছি। সেইজন্যেই তুমি যে রঙের কাপড় ভালবাস আমাকে তাই পরতে হবে, তোমার ভাললাগা বই রাখতে হবে, তোমার পছন্দসই খাবার খেতে হবে। যেমন এই কফিটা! সেইজন্যে! কি ভীষণ, উঃ কি ভীষণ! তোমার সব কিছু আমার ঘাড়ে চাপিয়েছ—এমন কি তোমার প্রেম তোমার কামনা পর্যন্ত। ছিঃ।......পোকা যেমন কবে আপেলের ভেতরটাকে কুরে কুরে খায় তুমি তেমনি নিজেকে আমার ভেতর ভরে দিয়ে ভেতরটাকে খেয়ে ফেলেছ। ভেতবে আমার আজ তুমি, আমি শুধু আমার বাইরের খোলসটা নিয়ে বেঁচে আছি। আমি পালাতে চেষ্টা করেছি—কিন্তু তোমার সর্বনাশা সাপের চোখ থেকে পালাতে পারিনি। আমি বুঝেছি, তুমি যেন আমার পাখা কেটে দিয়ে, পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছ, যত আমি ছটফট করেছি তত আমি তলিয়ে গিয়েছি। তুমি অপেক্ষা করে আছ একটা রাক্ষুসে কাঁকড়ার মত। আমি তোমার সামনে আজ এসে দাঁড়িয়েছি।... লজ্জা নাই তোমার! আমি তোমাকে ঘৃণা করি। অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি। কিন্তু তুমি ওইখানে শান্ত হয়ে বসে থাক। এই সব ব্যাপারে যেন তোমার মনোযোগই নাই! হোকনা অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমা, পূজো কিংবা বড়দিন, অন্যে সুখী কিংবা অসুখী—তোমার কোন ভাবান্তর নাই। তুমি ঘৃণা পর্যন্ত করতে পারনা—কি করে ভালবাসতে হয় সেও তুমি জাননা। তুমি শুধু শিকার ধরার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতে পার—বেড়াল যেমন ইঁদুরের গর্তের সামনে বসে থাকে। বসে থাকতে তুমি খুব পার—টেনেও বার করতে পারনা,

পেছনেও ছুটতে পারনা, কিন্তু ওই কোণাটাতে এসে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে পার। এইখানে বসে তুমি দেখ, হিসেব কর, কিসে তোমার সুবিধা হবে।…

…সত্যি মিলি তোমাকে দেখে আমার করুণা হয়। কারণ আমি জানি যাই তুমি কর না কেন—তুমি অসুখী। মনে তোমার একটুকু সুখ নাই। সুখ নাই, কারণ তুমি ঘা খেয়েছ। আর ঘা খেয়েছ বলেই তোমার মন হিংসায় ভরে গেছে। জান তোমাব ওপর আমি সত্যি সত্যি রাগও করতে পারিনা—তুমি এত নীচে নেমে গেছ! আর আমার স্বামীর সঙ্গে যা ঘটেছে—তার জন্যে আমার মনে আজ এতটুকুও দুশ্চিন্তা নাই।

…..তোমাব জন্যে যদি আমার কফি খাওয়া শিখতে হয়ে থাকে, তাতে আমার ক্ষতি কি। কি আমার তাতে এল গেল। সবাই জানে কফি খাওয়া খুব ভাল। (চামচটা তুলে নিয়ে কফিটা নাড়েন) আমি যদি তোমার মত কাপড় পরা শিখে থাকি—তাতে আমারই লাভ হয়েছে, আমার স্বামীকে আমার আরও কাছে পেযেছি। তুমি হারিয়েছ, আমি লাভ করেছি।… হ্যাঁ এবার তুমি তাকে সত্যিকার হারিয়েছ, আমি তার অনেক চিহ্ন দেখেছি। তুমি ভেবেছিলে তোমার কীর্তি যেদিন আমি বুঝব, সেদিন ওর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবে। সম্পূর্ণ ভুল—আমি কখনও তা করব না। এখন মনে হচ্ছে তোমার থেকে আমারই জোর বেশী। তুমি আমাব কাছ থেকে কখন কিছু পাওনি—উপরন্তু তোমার অনেক কিছু দিয়েছ। তোমার যা গেল—তা' রাতারাতি আমার হয়ে গেল ; সেই চোবের গল্পের মতো। তুমি কখনও কোন পুরুষের ভালবাসাকে রাখতে পারনি। তোমার

হাতে যা পড়েছে তাই অকেজো—মূল্যহীন হয়ে গেছে। তুমি বই পড়েছ—কিন্তু তার থেকে জীবনকে কিভাবে ভোগ করতে হয় শেখনি—এমন কি তোমার ফুলতোলা ভালবাসা তোমার কামনা—সব নিরর্থক হয়ে গেছে। আমার ছেলের তোমার বাপের নাম হলে কি হবে, আমিই তার জন্ম দিয়েছি—তুমি নও। ······সব সময়ে সব জাযগাতে তুমি অমন নিঃশব্দ হয়ে থাক কেন ? প্রথম প্রথম ভাবতাম তোমার জোর আমার থেকে বেশী তাই। এখন বুঝেছি কেন। বুঝেছি তোমার কখনও বলার কিছু ছিল না, তাই তুমি সর্বদা নিঃশব্দ থেকেছ। তোমার চিন্তাশক্তি পযন্ত নাই যে কিছু বলবে।

(উঠে টেবিলের তলা থেকে চটিজোড়া বার করে ঝেড়ে তোলেন।)

—আমি এবার বাড়ী চললাম। এই তোমার পছন্দমত ফুলতোলা চটি নিয়ে আমার বাড়ী চললাম। শোন কাজের কথা বলি—তুমি অন্যের কাছ থেকে কখনও কিছু শিখতে পার না। তুমি নীচু হতে পার না—তাই ঝড় এলে শুকনো ডালের মত টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়। যাবার আগে তোমাকে ধন্যবাদ দিই। তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি—তুমি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছ। এমন কি কেমন করে আমার স্বামীকে ভালবাসব তাও। আবার সেইজন্যই ধন্যবাদ দিচ্ছি। মিলি—এবার আমি বাড়ী চললাম। চললাম আমার স্বামীর কাছে। (প্রস্থান)

একটি সভা

চরিত্রলিপি

হরিবাবু— শ্রমিক সংঘের সম্পাদক

শান্তুদা— শ্রমিক নেতা

অধিরথ— বেগারের মাস্টাব

সুভদ্রা— তার স্ত্রী

ডাক্তাব— কোম্পানির ডাক্তার

দালাল— নামেই প্রকাশ

প্রকাশ— ছোক্‌রা কর্ম্মচারী

জমিদাব
উকিল
ম্যানেজার } — কোম্পানীর ডিরেক্টার

শশীনাথ— বৃদ্ধ কর্মচারী

সুনন্দা— প্রকাশের বোন

অমিত— সুনন্দার বন্ধু

*বঙ্কুবাবু— শ্রমিক সংঘের সভাপতি

নানাদলেব শ্রমিকগণ।

একটি সভা

এই নাটিকের অভিনয়ে কোন দৃশ্যপট থাকবে না। কেবলমাত্র আলোর ব্যবস্থায় বিষয়বস্তুকে বোঝাতে হবে। যখন শ্রমিকসভা বোঝাতে হবে তখন সাধারণ ভাবে সমস্ত জায়গাতেই আলো পড়বে। কিন্তু বক্তৃতারত লোকদের পেছনের জীবন যখন দেখান হবে তখন কেবলমাত্র দৃশ্যের মধ্যেটায় গোলমত আলো পড়বে এবং তখন সেই আলোর ভেতর অভিনয় হবে।

দৃশ্যসজ্জার মধ্যে কতকগুলো চেয়ার আর একটি টেবিল ছাড়া আর কিছু থাকবে না।

শ্রমিক সংঘের সভা

চেয়ারে কতকগুলি লোক বসে আছে। হয় এরা বক্তা নয়তো শ্রমিক সংঘের কর্মকর্তা। সংঘের সম্পাদক বক্তৃতা করছেন। সংঘের সভাপতি অনুপস্থিত। তিনি বৃদ্ধ, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। সম্পাদক অন্যপক্ষ। ভালো খেতে পাওয়ার চিহ্ন সর্বাঙ্গে। অনেক শ্রমিক বিশ্বাস করে যে সম্পাদক কোম্পানীর কর্তাদের পয়সায় লালিত। কথাটা সম্ভবতঃ সত্য। তারও একটা দল আছে—যারা হাবে-ভাবে নিজেদের উপস্থিতি জানাচ্ছে। এরা দলে ভারি না হলেও গায়ের জোরে বেশী। শ্রোতারা অর্থাৎ যারা সাধারণ শ্রমিকদল—তারা নেপথ্যে। সমস্ত সভাটায় তারাই মুখ্য। তাদের দলে টানার চেষ্টায় এই সভার আয়োজন।

(সম্পাদক হরিবাবু বক্তৃতা করছেন)

হরিবাবু—আপনাদের ভুলপথে চলতে দেখে আমি হাসতেও পারি না, কারণ আমি আপনাদের একজন। কিন্তু দুঃখ পাই—যখন দেখি অসম্ভবের পেছনে আপনারা ছুটছেন—কিম্বা আসল কথাটাই বলি—আপনাদেরকে ভুল বুঝিয়ে ছোটান হচ্ছে। দেখুন ঐ পাটকলের শ্রমিকদের। সব সিংহের মত বুক ফুলিয়ে কল থেকে বেরিয়ে এসেছিল—এখন ভেড়ার মত সুড় সুড় করে ফিরে গেছে। কেবলমাত্র ওরা যে নিজেদের ক্ষতি করেছে তা নয়—সমস্ত শ্রমিক সংঘের জোর কমিয়ে দিয়েছে। সেইজন্যে আজ কিছু স্থির করার আগে আমাদের বেশী করে ভাবতে হবে। প্রয়োজন হলে বেশীদিন ধরে ভাবতে হবে। আমি ধরুন দিনরাত্রি ভাবছি—

শ্রমিক শ্রোতাদের একজন—মালিকদের কি করে বাঁচান যায়!

হরিবাবু—(শ্লেষটাকে গায়ে না মেখে) সত্যিই তাই। কি করে সহজে আমাদের দাবী তাদের মানান যায়। ধর্মঘট হলে তাদের ক্ষতি যে কম হবে মনে করবেন না।

শ্রঃ শ্রোঃ একজন—ন্যাটার বুক ফেটে যাচ্ছে।

শ্রঃ শ্রোঃ অন্যজন—আমাদের সভাপতি কই? তিনি কখন আসবেন?

হরিবাবু—আমাদের সভাপতি বুড়ো মানুষ। সেইজন্যে বোধহয় তাঁর আসতে দেরী হচ্ছে। বন্ধুগণ, আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা যে আমরা আর বিদেশীর তাঁবেদার হয়ে পরাধীন ভারতে বাস করছিনা। আমরা আজ স্বাধীন। স্বাধীনতা পেয়েছি বলেই যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার নাই আমাদের। কিছু করবার আগে তাই আমাদের চিন্তা করতে হবে—আমাদের কাজে আমাদের দেশে কোন ক্ষতি হবে নাকি। আমাদের দেশ—

শ্রঃ শ্রোঃ একজন—যেখানে জিনিসের দাম রোজ রোজ বাড়ছে।

হরিবাবু—ঠিক। বাড়ছে আমাদের দোষেই। আমাদের অন্যায়ভাবে করা ধর্মঘটে, অন্যায়ভাবে জমিয়ে রাখা চাল-ডাল সরষের তেলের জন্যে। যা কিছু ভাল আমরা পছন্দ করিনা—

শ্রঃ শ্রোঃ একজন—যেমন সাপের চর্বি মেশান বনস্পতি।

হরিবাবু—(সে কথায় কান না দিয়ে) দেশের মধ্যে যদি বেশী জিনিস তৈরী হয়, লাভ কার বেশী—আমাদের না মালিকদের? রপ্তানী যখন বেশী হতে থাকবে—বিদেশ থেকে টাকা আসবে, খাবার আসবে। সে খাবার খেয়ে মালিকরা ফুরোতে পারবে—কজন মালিক আছে দেশে? তার দশগুণ হচ্ছে শ্রমিক।

হরিবাবুর লোক—ঠিক বলেছ হরিবাবু।

শ্রঃ শ্রোঃ একজন—কিন্তু সভাপতি আসছেন না কেন?

হরিবাবু—আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম। তোমরা গত সভায় যাঁকে সভাপতি করলে—শ্রমিক সংঘের প্রথম বড় সভায় তিনি নাই কেন?

হরিবাবুর লোক—বোধহয় মালিকদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন কি করা উচিৎ।

শ্রঃ শ্রোঃ একজন—চুপ কর। বঙ্কুবাবু তোমাদের মতো নয়।

হরিবাবুর লোক—আমাদের মতো মানে?

হরিবাবু—আঃ চুপ কর। বন্ধুগণ, আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় সবদিক বিবেচনা করে চিন্তা করতে হবে, ধর্মঘট করা আমাদের উচিৎ কি না। এবং করলে আমাদের তাতে কি লাভ হবে—আমাদের দেশের কি লাভ হবে। আপনারা জানেন আমাদের দেশের এটা সংকট সময়—

শ্রঃ শ্রোঃ একজন—পেটে যাদের ভাত নাই তাদের পক্ষে সবই সমান।

হরিবাবু—(চটে) কে বললে একথা উঠে দাঁড়াও। উঠে দাঁড়াও যদি সাহস থাকে। (কেউ দাঁড়াল না) বন্ধুগণ, আমি হলপ্ করে বলতে পারি ও একজন কম্যুনিষ্ট। দেশটাকে বিভ্রান্ত করছে। ধরুন না। কদিন আগেকার কথা—ষ্টালিন্‌কে পূজো করত দেবতার মতো—যেই রাশিয়ার বর্তমান কর্তারা বলল—না ষ্টালিন ছিল বিশ্বাসঘাতক, অমনি ষ্টালিনের ছবি টবি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে নয়া কর্তাদের পূজো করতে আরম্ভ করেছে। ওদের দৃষ্টি রাশিয়ার দিকে—সুযোগ পেলে ওরা আমাদের দেশটাকে রাশিয়ার পায়ের তলায় ফেলে দেবে। আমাদের সংঘেও এদের চারপাঁচটিকে আমি লক্ষ্য করেছি,—সময় হলেই তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দেব। (সবাই চুপ) বলুন বন্ধুগণ, ধর্মঘট এই অবস্থায় আমাদের করা উচিৎ কি না ?

শ্রঃ শ্রোঃ একজন—বঙ্কুবাবু কোথায় ?

হরিবাবুর লোক—সম্ভবতঃ কলঘরে। তার জন্যে অপেক্ষা করে কি হবে ?

কাতুদা—বন্ধুগণ, আপনারা সব কথা শুনলেন। আমাদের সম্পাদক মশাই পরিষ্কার করে সব কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তার ওপর আমাদের সভাপতি অনুপস্থিত। আমার মনে হয় আপাততঃ ধর্মঘট বন্ধ রেখে দেখা যাক। প্রয়োজন হলে আবার আমরা সভা ডেকে স্থির করব। ধর্মঘট করতে তো আর বেশী সময় লাগবে না।

হরিবাবুর লোক—আমি বলি ধর্মঘট বন্ধ থাক। সকলেরই সংসার আছে।

হরিবাবু—আমি ধর্মঘট বন্ধ করতে বলি না। আমি বলি আপাততঃ মুলতুবি থাক। রাত হয়ে যাচ্ছে, এবার বাড়ী যাওয়া যাক, খাবার দাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এরপর গেলে।

হরিবাবুর লোক —আমরা রাজী।

শ্রঃ শ্রোঃ একজন—ডাক্তার বাবু—ডাক্তার বাবু কিবলেন—

শ্রঃ শ্রোঃ অন্যজন—অধিরথ বাবু কি বলেন—

হরিবাবু—নিশ্চয় নিশ্চয় সকলের মতামত শুনে আপনারা মন স্থির করুন—নইলে পরে বলবেন সম্পাদক মশাই জোর করে নিজের মত জাহির করেছেন। (পেছনে তাকিয়ে) কই ডাক্তারবাবু আসেন নি দেখছি। এই অধিরথ বাবু আছেন। উঠে আসুন মশায়। বক্তৃতা করুন। বুঝিয়ে দিন ব্যাপারটা আমাদের ভালো না মন্দ। বাজে কথায় ধাঁধা লাগিয়ে দেবেন না যেন আবার।

(অধিরথ বাবু উঠে এলেন। কোম্পানীর নীচু স্তরের কর্মচারী। অল্প বয়সে বুড়ো হয়ে গেছেন। মাথার সমস্ত চুল সাদা—উস্কোখুস্কো। মুখে চিন্তার রেখা। দেহটা ভেঙে পড়েছে। জীবনের আশাভঙ্গ ওর সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট)।

অধিরথ—বন্ধুগণ, বক্তৃতা আমি দিতে পারবনা কখনও। আমি হ'লাম ঘরকুনো লোক—কাজ করি, বই পড়ি। অবসর পেলে—অবকাশ হলে আমার ভালো লাগে অনেক কথা জানতে। আপনাদের ছেলেরা যখন আমার কাছে ইস্কুলের পড়া দেখে নিতে আসে—আমার যতটুকু সাধ্য সাহায্য করি। তাই বোধহয় আপনাদের মনে হয়েছে এই সময়েও আপনাদের কিছু বলতে পারব। আমার বিদ্যে ওই ইস্কুলের নীচু ক্লাসের ছাত্রতেই শেষ। এখানে হরিবাবুর মত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ লোক আপনাদের নির্দেশ দেবেন।

কাতুদা—বেশ বলেছ অধিরথ।

হরিবাবু—অধিরথ ছেলেটি দেখছি সত্যি পড়াশোনা করে।

অধিরথ—(বলে যেতে লাগল) আমি আপনাদেরকে কি বলতে পারি? বলতে পারি বারে বারে—হরিবাবু খুব বুদ্ধিমান লোক। দেখুন

না সেবার হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হল। আমার ইস্কুলের সঙ্গী ছিল ইসলাম মিঞা। সে আশ্রয় নিল আমার বাড়ী। তাকে আমি বললাম, 'জান কবুল—তোমাকে কেউ ছোঁবে না।' হরিবাবু এসে আমায় বারণ করলেন। আমি শুনলাম না। রাত বারটায় গুণ্ডায় দল এল। হরিবাবু আমাকে আগেই খবর দিলেন—কেননা তিনিই গুণ্ডাদের কাছে ইসলামেব খবর দিয়েছিলেন—বুদ্ধিমান লোক কি না! গুণ্ডারা আমার চোখের সামনে ইসলামকে মারল—আমার দু'বছরের মেয়েটাকে মারল—। আমার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি। আমার সর্বস্ব লুঠ করে পুড়িয়ে দিল। হরিবাবুব কথা শুনলে এসব কিছুই হত না। তাই তো আপনাদের আবার বলছি আপনারা ওঁর কথামত চলুন। উনি ভুল পথে চলেন না।

কাতুদা—কি বলছ হে আবোল তাবোল।

হরিবাবু—শেষ করতে দাও।

অধিরথ—আমি আপনাদের আর কি বলতে পারি? বলতে পারি আমার ঘরের কথা। কি দিয়ে ভাত খাই। তবে এটা ঠিক রাতে গরম খাবার প্রায়ই আমাব ভাগ্যে জোটে না। কোন কোনদিন কিছুই জোটে না। রাতে গরম খাবার রোজ জোটে কার, আপনাদের মধ্যে—হাত তুলুন তো।......অথচ হরিবাবু বলছেন খাবার ঠাণ্ডা হবে—কাজেই ওঁর নিশ্চয়ই জোটে। জোটে কেন না উনি বুদ্ধিমান লোক, ভুল পথে চলেন না। সেদিন বাড়ী ফিরে দেখি শূন্য ঘর—একটাও আসবাব পত্র নাই। বউকে জিজ্ঞেস করলাম—

(বাইরের বড় আলো নিভে গেল। গোল আলো জ্বলে উঠল। অধিরথের স্ত্রী সুভদ্রা দাঁড়িয়ে। ফেলে-আসা সৌন্দর্যের

ছাপ আছে ক্ষয়িষ্ণু দেহে। সেদিনের সজ্জাটা যেন একটু যেন চাকচিক্যপূর্ণ।)

অধিরথ—(আলোর মধ্যে এল) একি—কি হয়েছে—

সুভদ্রা—বাড়ীওয়ালা জিনিসপত্র নিয়ে গেল।

অধিরথ—কখন ?

সুভদ্রা—তিনটেয়। বল্লে দুমাসের ভাড়া শোধ হল—এখনও তিনমাসের বাকী।

অধিরথ—তা' আমার জন্যে অপেক্ষা করলে তো পারত।

সুভদ্রা—বলে—তাকেও তো জিনিসগুলো বিক্রী করতে হবে—সে তো আর তোমার চৌকী আলমারী খাবেনা।

(মাটিতে ফেলে রাখা বইগুলো সযত্নে তুলে ঝাড়তে লাগল।)

অধিরথ—বিয়ের বুককেশটা পর্যন্ত নিয়ে গেল !

সুভদ্রা—তোমার বিয়ের কথা মনে হবার আর কিছুই থাকল না।

(অধিরথ বইগুলোর পাশে বসে পড়ল)

তোমাকে সাতদিনের সময় দিয়েছে, তারপর বলেছে পথে বার করে দেবে। (প্রথমে ধীরে—পরে জোরে কেসে উঠল)

অধিরথ—ইস্—আজ দেখি বেজায় কাসছ ! ওষুধ খেয়েছ তো না কি ?

সুভদ্রা—না।

অধিরথ—সে কি !

সুভদ্রা—খেয়ে কি হবে। আমার বেঁচে থাকার কি দরকার বোঝাতে পার। ছেলে নাই, বাপ নাই, শ্বশুর নাই—কোথায় দুজনার সংসারে তোমাকে একটু শান্তি দেব—তা না ধরল এক রাজরোগ। তোমার সমস্ত রোজগার যাচ্ছে আমার পেটে। ফল যা হচ্ছে তা আমিই জানি। (কেসে উঠল)

অধিরথ—কিন্তু এটাকে তো সারিয়ে ফেলতে হবে। সারছেও আজকাল।

সুভদ্রা—আচ্ছা সত্যি করে বলত গো—তুমি বিশ্বাস কর এ রোগ সারবে?

অধিরথ—সারছে তো আজকাল।

সুভদ্রা—যাদের সারছে তাদের কত পয়সা খরচ করে সারছে বল দেখি। তত পয়সা তুমি সারা জীবনে রোজগার করতে পারবে? আর ধার দেনা করে যদি পার—আমি সেই পয়সায় ওষুধ খেতে পারব?

অধিরথ—তাই বলে এমনি নিঃশব্দে মরলে তো চলবেনা। বাঁচার আমাদের অধিকার আছে—জোর করে সেই অধিকার আদায় করতে হবে আমাদের।

সুভদ্রা—আমিও তাই বলি বাঁচার অধিকার আদায় করতে হবে। দেখছনা সেই জন্যে ভালো শাড়ীটা বের করে পরেছি। সুন্দর করে খোঁপা বেঁধেছি—না কি এতক্ষণ দেখই নাই?

অধিরথ—সত্যি দেখি নাই। কি ব্যাপার? আমার কিন্তু ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে এ তোমার যুদ্ধে যাবার সাজ।

সুভদ্রা—আমাদের আবার যুদ্ধ! আমাদের যুদ্ধ নিজের সঙ্গে। না খেয়ে, ধার করে, অসুখে পড়েও বেঁচে থাকা এই বা কম কি? ...... তোমাদের যুদ্ধের খবর কি বল?

অধিরথ—আমাদের নতুন সভাপতি বঙ্কুবাবুর ইচ্ছা ধর্মঘট হোক। কিন্তু অনেকের আপত্তি। যা মাইনে তাতে তো অনেকের দুবেলা খেতেই কুলোয় না। তারপর যদি ধর্মঘট চলে—সাতদিন দশদিন, তাহলে তো কথাই নাই। মালিকদের পক্ষে দিন পনের পর্যন্ত কল বন্ধ রাখা সম্ভব। কিন্তু আমাদের ততদিন পর্যন্ত চালাবার সুবোদ নেই। আমি বঙ্কুবাবুকে বলেছি আমি ধর্মঘটের বিপক্ষে।

সুভদ্রা—বঙ্কুবাবু কি বললেন ?

অধিরথ—উনি বললেন যে তুমি ভালো ব্যবহার করবে। জান অদ্ভুত লোক বঙ্কুবাবু, কখনও জবরদস্তি করেন না—কিন্তু সবাই মনের মধ্যে ওর কথার জোরটা অনুভব করে।

সুভদ্রা—বঙ্কুবাবু কিন্তু ঠিক কথাই বলেছেন। আমাদের মত সংসার—যাদের বাঁচার অধিকার নাই একটুকু, তারা যদি মরতে ভয় পায়—তাহলে কোন কালেও কেউ বাঁচার চেষ্টা করবে না।

অধিরথ—আমাদের বাঁচার অধিকার নাই একথা কেন বললে ?

সুভদ্রা—তাই সত্যি বলো। কি দাম আমাদের, কি প্রয়োজন ! সংসারের ঘাড়ে তুমি একটা বোঝা—তোমার দরকার কি !

অধিরথ—তুমি বলতে চাও আমার মৃত্যুতে কারো ক্ষতি নাই।

সুভদ্রা—ঠিক তাই। ক্ষতি যদি কারো হয় সে তোমার। কিন্তু আমিও মরণ পথের যাত্রী—একটা বোঝা সরে গিয়ে আরেকটা বোঝাকে টেনে নেবে অদৃশ্যের ডাকে।

অধিরথ—তবে—

সুভদ্রা—তবে নয়। তবে শেষ হয়েছে। আমাদের মত সর্বহারা যদি না দাঁড়াতে পারে বুক ঠুকে মৃত্যুর সঙ্গে হাতাহাতি করতে, তাহলে কে পারবে ? আমরা ভয় পেলে—ভয় যে কখনও কাটবেনা।

অধিরথ—আমি ভাবছি তোমার কথা সুভদ্রা। তোমায় সারিয়ে তুলব—

সুভদ্রা—তোমার কবিরাজ আজও এলেন। শোন—ভেবেছিলাম তোমায় না বলে চলে যাব—যাবার সময়কার দুঃখ তোমায় দেবনা। কিন্তু তোমায় না বলে যাওয়া আমার হল না।

অধিরথ—কোথায় চলেছ তুমি ?

সুভদ্রা—তোমার যদুবাবুকে মনে আছে নিশ্চয়ই। আমার বিয়ের আগে আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন। তিনি আজ কতদিন

হোল রোজ আসছেন। রেলে কাজ করেন। তোমার থেকে মাইনে কম হলে কি হবে—উপরি পাঁচগুণ।

অধিরথ—(উত্তেজিত) তার কাছে থাকবে তুমি তার রক্ষিতা হয়ে! একথা শোনার আগে আমার মৃত্যু হওয়া উচিৎ ছিল।

সুভদ্রা—তোমার কি এখনও ধারণা আমরা বেঁচে আছি? এই কি বেঁচে থাকা! বেঁচে থাকার অধিকার আছে আমাদের? নাই। আজকের সমাজ ব্যবস্থায় বেঁচে থালি তারাই থাকবে—যারা জানে অন্যের রক্তমজ্জা কি ভাবে খেতে হয়। (কাসি) তোমার-আমার জীবনে আজ কি আছে—যক্ষ্মা, তিন মাসের বাকি বাড়ীভাড়া—আর একটু পুরানো ভালোবাসার ছিটেফোঁটা। —এতে কি বাঁচা যায়!

অধিরথ—কিন্তু আত্মসম্মান! আমাদের মানবতার অধিকার!

সুভদ্রা—সেও তো যেতে বসেছে। ভিখারীর আবার অধিকার কি? কোথায় তার আত্মসম্মান! তাই তো বলি ওইটুকু তোমরা বজায় রাখতে চেষ্টা কর—মরতে হয় মর—কি অন্যের পথ তৈরী করে দিয়ে যাও।

অধিরথ—ঠিক বলেছ সুভদ্রা, অসমতার বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করে যেতে হবে।

সুভদ্রা—যে তোমার এক গালে চড় মারে তাকে অন্য গাল ফিরিয়ে দেবার দিন চলে গেছে।

অধিরথ—তোমার কথা শুনে মনে হয় কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তোমার যোগ আছে।

সুভদ্রা—ঠিক বলেছ। কোন দল জান? ম্যয় ভুখা হুঁ!

অধিরথ—কিন্তু তার জন্যে তোমার ঘর ছাড়ার কি দরকার?

সুভদ্রা—আমার কাছে সেটাই আমার বেঁচে থাকার অধিকার।

অধিরথ—লোকে কুৎসা রটাবে।

সুভদ্রা—তাতে আমার মরণকে তো আটকাতে পারবেনা।

অধিরথ—অসতর্ক মুহূর্তে আমার যখন মনে হবে তুমি বাড়ী ছেড়েছ কেবল আনন্দ উপভোগের জন্যে—?

সুভদ্রা—মনে রেখ আমার যক্ষ্মা হয়েছে—বুকের দুদিকেই—

অধিরথ—কিন্তু না—এই ভাবে আমাদের সব শেষ হয়ে যাবে—তা হতে আমি দেবনা। সুভদ্রা, বল আমরা বাঁচব ?

সুভদ্রা—না—আমরা মরব। কিন্তু মরার আগে চেষ্টা করব ভবিষ্যতে যারা আসবে তাদের যেন আমাদের অবস্থা না হয়। আমি সপ্তাহে যা টাকা পারি তোমায় পাঠিয়ে দেব! দুঃখ পাচ্ছ কেন ? প্রথম জীবনে আমরা দুজনে ভালোবাসার পাল্লা দিয়েছি। এখন এস মরণের পাল্লা দি। কে আগে মরতে পারে। ধর্মঘট তোমাদের করতেই হবে।

অধিরথ—ঠিক বলেছ সুভদ্রা—আমি চললাম বঙ্কুবাবুর কাছে, বলব ! তার কথাই ঠিক। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেওনা লক্ষীটি।

(গোল আলো নিভে বড আলো জ্বলে উঠল। অধিরথ তার বক্তৃতার শেষ লাইন বলে ভীড়ে মিশে গেল।)

তারপর কি হয়েছে আপনারা সবই জানেন। (প্রস্থান)

কাতুদা—কি সাংঘাতিক লোক! কি রকম ইনিয়ে বিনিয়ে কতকগুলো বাজে কথা বলে গেল। এই জন্যেই আমাদের ছেলেরা পাশ করতে পারেনা। ওর কাছে এই সব শিখলে কি আর—

হরিবাবু—(উঠে দাঁড়াল) বন্ধুগণ, অধিরথবাবু যা বলে গেলেন তাতে একটা ভুল ধারণা আপনাদের মনে আসা বিচিত্র নয়। এক নম্বর উনি বলেছেন—ইসলাম মিঞার মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি উনি আর ওঁর স্ত্রী বাড়ী ছেড়ে কোন বাদাড়ে

লুকিয়েছিলেন ? স্ত্রীর যক্ষ্মার জন্যেও উনি কত নাকে কান্না কাঁদলেন। জিজ্ঞাসা করি কোম্পানীর ডাক্তারকে কদিন উনি দেখিয়েছেন ? ওঁর বৌ যদি বেশ্যাবৃত্তি নিয়ে থাকে তার জন্যেও কি কোম্পানী দায়ী ? স্ত্রীর পাঠান টাকা উনি নেন কি করে ? বন্ধুগণ, সহজ সত্যিকথায় আমার আপত্তি নাই। আমার আপত্তি পেঁচান কথায়—নানা রঙের কথায়—

শ্রঃ শ্রোঃ একজন—ওই যে ডাক্তারবাবু এসেছেন—ডাক্তারবাবু—।

হরিবাবু—এই যে ডাক্তারবাবু আসুন। এরা জানতে চাইছে অখিরথবাবু কদিন তার স্ত্রীকে আপনার কাছে দেখিয়েছেন।

ডাক্তার—মাত্র দুদিন। প্রথম যেদিন অসুখ সন্দেহ হল—এবং পরে যখন আমি একটা ওষুধ লিখে দিলাম অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে।

হরিবাবু—শুনুন আপনারা।

কাতুদা—কোম্পানীর দোষ অনেক আছে কিন্তু গুণগুলোও স্বীকার করতে হবে। যেমন ধরুন ডাক্তারকে পয়সা দিতে হয় না। কতকগুলো ওষুধ বিনা পয়সায় দেওয়া হয়।

ডাক্তার—কতকগুলো ওষুধে কি হবে কাতুদা, রোগ যে সবারই।

কাতুদা—হেঁ-হেঁ ডাক্তার রসিকতাও জানে। ঠিক বলেছে রোগ তো সবারই। মাথার রোগ। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

হরিবাবু—(ডাক্তারের কথার সুর পছন্দ হয় না) তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে ডাক্তার। বাড়ী গিয়ে একটু বিশ্রাম করগে। কখন কে ডাকবে ঠিক তো নেই। তোমাদের অদ্ভুত জীবন। কি তোমাদের ত্যাগ !

ডাক্তার—ঠিক বলেছেন আমাদের অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়—তাই তো আশা করি এই সেবার জন্যে সামান্য কিছু সম্মান পাব।

তাও যখন পাই না তখনই মনে প্রশ্ন জাগে আমরা কোথায় চলেছি।

শ্রঃ শ্রোঃ একজন—আমরা কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

শ্রঃ শ্রোঃ অন্যজন—ডাক্তারবাবু জোরে বলুন।

ডাক্তার—হরিদা আপনি বলুন। বক্তৃতা করা আমার অভ্যেস নেই।

হরিবাবু—ডাক্তারবাবু বলছেন—আপনাদের কাছ থেকে তিনি যথেষ্ট সম্মান পান না। তিনি যে পরিশ্রম—

শ্রোঃ একজন—আমরা ডাক্তারবাবুর কথা শুনব। ডাক্তারবাবু!

অনেকে—হ্যা হ্যা—ডাক্তারবাবু।

হরিবাবু—যাও ভাই দু'কথা বলে এস।

ডাক্তার—ভাইসব—আমাকে কেন আপনারা বক্তৃতা দিতে ডাকছেন? আপনাদের সঙ্গে থেকে আমি ভালই ছিলাম। বোধ হয়েছিল বুঝি বুড়ো হওয়া পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে কাটবে। কিন্তু—

হরিবাবু—কি ব্যাপার ডাক্তার, কি হয়েছে?

ডাক্তার—কাল রাতে একজন আমার কাছে এসেছিল—

(বড় আলোটা নিভে গেল। ছোট আলোটা জ্বলল। একজন দালাল এল।)

দালাল—এই যে ডাক্তার কেমন আছ? তোমার কাছেই এলাম।

ডাক্তার—আরে দাদা যে—কি খবর, এমন অসময়ে!

দালাল—আমাদের কি আর সময় অসময় আছে? এলেই হল।

ডাক্তার—কারো অসুখ বিসুখ করেনি তো?

দালাল—এখন তোমার কাছে কেউ আসবে নাকি?

ডাক্তার—মনে তো হয় না। তবে কখন যে কার কি হয় বলা যায় কি?

দালাল—তুমি খুব কাজের লোক ডাক্তার। সবাই তোমাকে ভালোবাসে। কোম্পানীর ম্যানেজারও খুব খুসী তোমার ওপর। শোন একটা

সুখবর দিই—সামনের মাস থেকে তোমার কুড়ি টাকা মাইনে বাড়ছে।

ডাক্তার—তাই নাকি? ভালো। আপনার তো তাহলে একটা খাওয়া পাওনা হল সুখবরটা আনার জন্যে।

দালাল—সে তো হলই। আচ্ছা তোমার লাগছে কেমন এখানে বলতো?

ডাক্তার—আমার তো ভালোই লাগে। মাইনে ভালো। নানা রকম রুগী পাই।

দালাল—আমি তো তাই ম্যানেজারকে বলছিলাম। M. B. ডাক্তার অনেক পাবেন। কিন্তু এমন ভালো ছেলে পাবেন না।

ডাক্তার—কি যে বলেন। কত অভাবী ডাক্তার আজ পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাকরী পাওয়া সহজ নাকি আজকের দিনে!

দালাল—সে তুমি যতই বিনয় কর বাপু। তোমার মত ডাক্তার পথে-ঘাটে পাওয়া যায় না! তোমার হাতযশ আছে—প্রত্যেকে তোমাকে তাদের বাড়ীর ছেলের মত ভালবাসে।

ডাক্তার—এর জন্যে আমি সত্যি কোম্পানীর কাছে কৃতজ্ঞ। পয়সা নেওয়া ডাক্তার হলে বোধহয় এত চট করে এদের ভালবাসা পেতাম না। এখন আমি যে কোন সময়ে এদের বাড়ী যাই—তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনি। আমি ওদের একজন হয়ে গেছি—ভাবতে বড় ভালো লাগে।

দালাল—অথচ দেখ কোম্পানীর সঙ্গে তোমার বিরোধ নাই।

ডাক্তার—না। এক আমার আপত্তি শুধু ওই জল-দেওয়া রং-করা ওষুধগুলোর জন্যে। সে তো আপনাদের গভর্নমেণ্টকে ফাঁকি দেবার জন্যে রাখতে হয়। আমিও তাই সে ওষুধ কাউকে দিই না।

দালাল—তাই তো প্রথম প্রথম তোমার এঁরা নাম দিয়েছিলেন নাক উঁচু ডাক্তার।

ডাক্তার—(হেসে) জানি। কেউ কেউ পাগলা ডাক্তারও বলত। আমি কিছুদিন পর পর ওই রং-করা জলগুলো মাটিতে ঢেলে দিতাম কি না।

দালাল—কিন্তু ওষুধ পত্র বাড়ান উচিৎ। তোমার কি মনে হয়?

ডাক্তার—সে কথা যদি বলেন তো প্রচুর ওষুধ বাড়ান উচিৎ। কতকগুলি তো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখন অবস্থা দোয়াত আছে কালি নাই। অর্থাৎ ডাক্তার আছে ওষুধ নাই। নাই ওষুধ কেনবার পয়সা। গত বছর লিখেছিলাম ম্যানেজারকে, তিনি বল্লেন লোকসান হচ্ছে এখন কি আর খরচ বাড়ান চলে?

দালাল—তারপর?

ডাক্তার—তারপর চুপ করে আছি। দয়া করে ওষুধ দিচ্ছেন। জুলুম করা চলেনা।

দালাল—যা বলেছ। এই কথাটাই ওই লোকগুলো বোঝেনা। মনে করে গলার জোরে বোধহয় সব করা যায়।

ডাক্তার—ওদের দোষ কি বলুন। কথায় বলে পেটে খেলে পিঠে সয়। ওরা পেটে খেতে পায়না, তাই পিঠে সয়না।

দালাল—হাঁ-হাঁ-হাঁ। বেশ বলেছ ডাক্তার পেটে খেলে পিঠে সয়। ও হাঁ—তোমার বলাই হয়নি সামনে মাস থেকে তোমার মাইনে ত্রিশ টাকা বাড়ল।

ডাক্তার—ত্রিশ? এই যে বললেন কুড়ি।

দালাল—বললাম বুঝি। দেখ ভাই কেমন ভুলো মন হয়েছে আমার। ম্যানেজার বলেছিল—আর আমি পথে আসতে আসতে ভুলে গেলাম। একটা মনে রাখার ওষুধ দিও তো আমায়।

ডাক্তার—কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো? হঠাৎ আমার এতটা মাইনে বাড়ছে।

দালাল—তোমার কাজও কিছু বাড়বে কি না।

ডাক্তার—ও তাই বলুন। কি রকম কাজ?

দালাল—আহা। তেমন কিছু নয়। অত্যন্ত সোজা।

ডাক্তার—যেমন?

দালাল—যেমন তুমি প্রতি সপ্তাহে ম্যানেজারকে জানাও কতগুলি লোক অসুস্থ এবং তাদের কি অসুখ—তেমনি প্রতি সপ্তাহে আর একটি লিখিত রিপোর্ট খামে পুরে ম্যানেজারের হাতে দিয়ে আসবে।

ডাক্তার—কি বিষয়ে—

দালাল—যেমন কে কি কাজ করছে, ফাঁকি দিচ্ছে কি না—

ডাক্তার—তার জন্যে তো সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌রা আছেন। আমি তাদের কাজ কি বুঝি যে রিপোর্ট দেব?

দালাল—আহা সে কাজ নয়। এই যেমন ধর বাড়ীতে কে কি ভাবছে, কে কি ঘোঁট পাকাচ্ছে, কারা কোম্পানীর ক্ষতি করতে চাইছে এই রকম।

ডাক্তার—ও-ও বুঝেছি। আমাকে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে।

দালাল—ওই নামটা না দিলেই কাজটা খারাপ লাগবেনা। বলতে পার এদের মানসিক অবস্থার খবর তুমি দেবে। সেও তো একরকম ডাক্তারী। হেঃ হেঃ হেঃ।

ডাক্তার—আমাকে সকলে ভালোবেসেছে এই সুযোগটা নিতে হবে আপনাদের। কি ভীষণ!

দালাল—আরে ভাই কাজ সুরু করে দাও। অত ভাবনা করলে কি আর বাঁচা চলে।

ডাক্তার—বঙ্কুবাবু সেদিন ঠিকই বলছিলেন তবে।

দালাল—কি বলছিলেন বঙ্কুবাবু ?

ডাক্তার—তিনি বললেন এটা হানাহানির যুগ। নখ-দাঁত যার নাই তার মৃত্যু অবধারিত। বললেন 'হ্যাঁ না'র মাঝে যেমন কিন্তু নেই —মালিক আর কর্মিদের মধ্যেও তেমনি নিরপেক্ষতার সুযোগ নেই। দুজনাই দুজনকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ছে। এ নিয়ম বেশীদিন চলবেনা। দুটোই ভেঙে পড়বে।

দালাল—তার মানে কি হল ?

ডাক্তার—অর্থাৎ আমি যে ভেবেছিলাম কোন পক্ষ নেবনা—আপন মনে নিজের কাজ করে যাব। তা অসম্ভব। হয় শ্রমিক নেতা হতে হবে—নইলে মালিক পক্ষের গোয়েন্দাগিরি করতে হবে।

দালাল—ওই গোয়েন্দা কথাটায় আমার আপত্তি। সে যাকগে তোমার কথাই রইল। মাসে চল্লিশ টাকা বেশী পাবে।

ডাক্তার—না-না। আমি কি আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে পারবনা ?

দালাল—তোমার আত্মসম্মানের দাম দেব আমরা—পঞ্চাশে রাজী ?

ডাক্তার—আমি কি জানোয়ার !

দালাল—পঁচাত্তর। পেটে খেলে পিঠে সয়। না ?

ডাক্তার—আমি যদি এক পয়সা বেশী না চাই—আমায় কাজ করে যেতে দেবেন নিজের মনে ? যেমন আমি ছিলাম ?

দালাল—তুমি খুব খেলোয়াড়ী ছেলে—বল একশোতে রাজী—মাসিক একশো টাকা উপরি পাবে।

ডাক্তার—আমার কথার জবাব দিন।

দালাল—খেপেছ। তোমার চাকরীই থাকবেনা। যাকগে আমার তাড়াতাড়ি নাই, কালকে ভেবে বোলো। (প্রস্থান)

(ছোট আলোটা নিভে গেল। বড় আলো জ্বলল)

ডাক্তার—ভাই সব। আমি এই মাত্র চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এলাম। কাল এখান থেকে চলে যাব। আমাদের কি আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচবারও অধিকার নাই !

(ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। চারিদিকে উঠল মৃদু গুঞ্জন)

হরিবাবু—আমি ডাক্তারের কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। একি অন্যায় ! বেচারা নিজের মনে থাকে, কোন কথায় থাকেনা—তাকে এই ভাবে অপদস্থ করার কি কারণ থাকতে পারে ? বন্ধুগণ, আমি প্রস্তাব করি আপাততঃ আমবা সভা মুলতুবী রাখি।

কাতুদা—আমি সম্পাদকের প্রস্তাব সমর্থন করি।

শ্রঃ শ্রোঃ একজন—কিন্তু বঙ্কুবাবু এখনও আসছেন না কেন ?

শ্রঃ শ্রোঃ অন্যজন—আমরা বঙ্কুবাবুকে চাই।

অনেকে—সভাপতি মশায় কোথায ?

কাতুদা—এখন কেন ? গত সভায় পৈ পৈ কবে বারণ কবিনি—ওকে ভোট দিওনা। এখন চিংকার করলে কি হবে ?

হরিবাবু—আঃ কাতুদা। বন্ধুগণ, আপনারা শান্ত হোন। সভাপতির না আসার নিশ্চয়ই কারণ আছে—আমি সেটাও খোঁজ করতে চাই। আর আমাদের ডিরেক্টারের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাই—ডাক্তারকে কেন তাড়ান হল ?

অনেক—ঠিক কথা।

(প্রকাশ দৌড়ে এসে ঢুকল। কোম্পানীর নতুন ঢোকা কর্মচারী। বয়েস অল্প, তাই চোখের ভাবস্বপ্ন এখনও মেলায় নি।)

প্রকাশ—আমি এই মাত্র কোম্পানীর কর্তাদের সংগে দেখা করে এলাম। শুনবেন কি হয়েছে—

কাতুদা—আজকের সভা মুলতুবী হয়ে গেছে।

প্রকাশ—আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি—

কাতুদা—আচ্ছা বেয়াড়া ছোকরা তো! চুপ করবে কি না।

প্রকাশ—আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছিনা। বলুন আপনারা—

সকলে—হ্যাঁ শুনব। বলুন প্রকাশবাবু। হরিবাবু প্রকাশবাবুকে বলতে দিন।

হরিবাবু—বল হে তোমার দিগ্বিজয়ের কাহিনী।

প্রকাশ—আপনারা জানেন নিশ্চয় আমাদের কোম্পানীর সাতজন ডিরেক্টার আছেন। আমি প্রথমে গেলাম ডিরেক্টারদের সভাপতি জমিদার মশায়ের কাছে।

(বড় আলো নিভে ছোট আলো জ্বলে উঠল। জমিদার মহাশয়ের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। চোখে চশমা। ধীর শ্রদ্ধাস্পদ লোক।)

প্রকাশ—আপনি স্যার যদি এই চুরি না আটকাবেন তো কে আটকাবে? আর যাই করুক ম্যানেজার আপনাকে ভয় করে খুব।

জমিদার—ভয় করার অভিনয় করে। ওতে ওর দুটো সুবিধে হয়—প্রথম, আমার আত্মম্ভরিতা তুষ্ট হয় আর দ্বিতীয় হচ্ছে অনেক দোষ আমার ঘাড়ে চাপানো যায়।

প্রকাশ—কিন্তু স্যার আপনি ইচ্ছা করলে ওর মুখোস খুলে দিতে পারেন। দেশের লোক এখনও আপনাকে সম্মান করে।

জমিদার—পারি কিনা আমার সন্দেহ আছে। আজ সাত-আট বছর ওরা কোম্পানী চালাচ্ছে। সেখানে তাদের ছেলে, ভাই, ভাইপো, সব বড় বড় অফিসার হয়ে আছে। বুঝি তো সব, করতে পারি কি! দেখুন না গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে এরা মাল কেনে আড়াই আনায়—অথচ কেবল ঝেড়ে পুঁছে সেই মাল সাধারণকে দিচ্ছে সাড়ে সাত আনায়। অথচ কোম্পানীর balance sheet দেখুন, একলাখ টাকা করে বছরে লোকসান দেখান হচ্ছে

dividend দেবার ভয়ে। আমার ব্যক্তিগত লোকসান বাদ দিলেও সাধারণ shareholderদের প্রতি একটা কর্তব্য আছে মনে করি।

প্রকাশ—তাহলে স্যার একটা বিজ্ঞপ্তি বার করে দিন কাগজে। Shareholderরা তখনই আপনার পক্ষে ভোট দেবে।

জমিদার—ওদের অত বোকা ভাবছেন কেন? Shareholderদের majority না নিয়ে একটা কাজও করে ভেবেছেন? ওসব হবেনা। দেখুন যদি হৈ চৈ করে কিছু করতে পারেন। আমিই তো ভাবছি সামনের বছর ছেড়ে দেব ডিরেক্টরী। ভালো লাগেনা লোকের অভিশাপ কুড়োনো।

প্রকাশ—তা হলে আমাদের উপায় কি হবে?

জমিদার—আপনার প্রশ্নটা খুব কঠিন। আমার বিদ্যেতে ওর জবাব নেই।

প্রকাশ—তাহলে এর পর আমরা অভিযোগ জানাব কোথায়?

জমিদার—সরকারের কাছে—তারাই তো এখন সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

প্রকাশ—কিন্তু ম্যানেজার যে ইলেক্‌সনে লাখ লাখ টাকা খরচ করে—

জমিদার—আপনার আবেদনের কি ফল হবে সেই কথাই তো বল্লেন।

প্রকাশ—আমাদের সুদিন আসবে কবে?

জমিদার—সুদিন একদিন আসবে। এই আসাতেই তো বেঁচে থাকা।

প্রকাশ—আমাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি।

জমিদার—তাই আজ জমিদারের সঙ্গে সাধারণ লোকদের হাত মিলিয়ে দিয়েছে। তাদের চলতে আর বাধা নেই।

প্রকাশ—কিন্তু কোম্পানীর ম্যানেজার—

জমিদার—তারা নীতির বাইরে—কারণ তারই নিয়ম।

প্রকাশ—তাহলে আমি এখন কি করব?

জমিদার—আপনি বরঞ্চ আমাদের অন্য ডিরেক্টার প্রসিদ্ধ উকিলের কাছে

যান। তিনিই আবার ম্যানেজারের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা—তার কথা হয়তো শুনতে পারে। নমস্কার। (প্রস্থান)

(তারপর মধ্যে এলেন প্রসিদ্ধ উকিল। ঈগল পাখীর মত নাক, তীক্ষ্ণ চোখ। বিরল কেশ। নাকে কানহীন চশমা)

উকিল—কে হে ছোকরা, এমন অসময়ে কি মনে করে ?

প্রকাশ—আজ্ঞে স্যার—আমাদের কোম্পানীর কথা বলতে এসেছিলাম।

উকিল—তোমাদের অভিযোগগুলো তো আর নতুন নয় তার আর বলবে কি ? আমি তো তিন বছর থেকে শুনে আসছি।

প্রকাশ—আপনি যদি একটু বলেন ম্যানেজার বাবুকে। আপনার কথা স্যার কিছুতেই ঠেলতে পারবে না।

উকিল—তুমি বাপু এখনও ছেলেমানুষ আছ। তুমি কি মনে কর পয়সা পাওয়ার ব্যাপারে কেউ আর কারো কথা শুনে চলে ? বাইরের কথা বাদ দাও। আমার দেখ উকিল হিসেবে সুনাম হয়েছে। কিন্তু মামলার সময় আমায় যদি দেখতে হত আমার মক্কেল সত্যি দোষী কি না তা হলে আর যাই হোক পয়সা হত না। ন্যায় অন্যায়ের বিচার করবেন বিচারক। আমরা নিজেদের পক্ষে সব যুক্তি তর্ক দেব। তা সে খুনীই হোক আর জোচ্চোরই হোক। এই হল ব্যাপার।

প্রকাশ—আপনার কথা উনি খুব শোনেন।

উকিল—হ্যাঁ—শোনেন, যখন খুব বিপদে পড়েন বা আইনের প্রশ্নে নিজের বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠতে পারেন না। তোমাদের মাইনে বাড়ানর কথা আমার বলা সঙ্গতই হবে না। বল্লেও সে রাখবে না।

প্রকাশ—তবে স্যার আমাদের উপায় কি হবে ?

উকিল—উপায় তো অতি সহজ। আবেদন-নিবেদন, অনুরোধ-উপরোধ, শেষে তর্জন-গর্জন, আস্ফালন-আক্রমণ।

প্রকাশ—সেটা কি সহজ হবে ?

উকিল—সহজ তো হবেই না। সেই জন্যেই তো এত কথা। যেই তোমরা বলবে মাইনে বাড়ানর কথা—কর্মীদের ভালভাবে থাকার ব্যবস্থার কথা—ম্যানেজারও একহাজারটা কারণ দেখিয়ে দেবে, কেন তোমাদের মাইনে বাড়ান চলতে পরে না। তর্ক হবে তো সংখ্যা পেলে। সংখ্যাই তোমরা পাবে না। আমি চাইলে পাব—কিন্তু সবই ভুল সংখ্যা। সুতরাং তর্ক যেখানে নিষ্ফল —সেখানে গায়ের জোর ছাড়া উপায় কি ?

প্রকাশ—তাহলে আমরা এখন কি করব ?

উকিল—সহজ কথা, মামলা কর—আমাকে মোটারকম ফি দাও। মামলায় হারলেও ব্রাহ্মণ ভোজনের পুণ্যটা লাভ হবে।

প্রকাশ—আপনি স্যার ঠাট্টা করছেন।

উকিল—এতক্ষণে তুমি ছোকরা বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছ।

প্রকাশ—স্যার—আমাদের জীবনমরণ সমস্যা। আমাদের ইউনিয়নে পর্যন্ত দুটো তিনটে দল—সবাই চেষ্টা করছে ক্ষমতা পেতে।

উকিল—গোটা পৃথিবীতেই তাই। আর জীবনমরণ সমস্যা না হলে বেঁচে থাকা এত মজার হত কি করে? দেখছ না শুধু বেঁচে থাকাটাই কি রকম কঠিন হয়ে উঠেছে। সুখের সাধ তো পরেকার কথা।

প্রকাশ—আচ্ছা আমাদের ব্যবসায়ী ডিরেক্টার যিনি আছেন—তাঁকে বললে কিছু হবে ? তিনি তো ম্যানেজারের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে নানা কথা বলে থাকেন।

উকিল—পাগল না কি ! ওটা তো সব থেকে পাজি। ওই তো ম্যানেজার ছিল এই কোম্পানীর আটবছর আগে ! চুরি করে যখন সামলাতে পারল না তখন নিয়ে এল ওই বিদেশীদের। এখন

ঘরে করে তার মোসাহেবী আর বাইরে করে তার নিন্দে। ওর বিশ্বাসঘাতকতা একেবারে classical. আজ বাঙ্গালীরা যদি ওই পর্যায়ে নেমে না যেত তাহলে বাংলার ব্যবসাতে এমনি করে বাইরের লোক ভীড় জমাতে পারত না।

প্রকাশ—আমাদের ভয়ানক অভাব, না মিটলে সব মরে যাবে।

উকিল—দেখতে তো পাচ্ছি বাপু। সবই তো দেখছি চোখের সামনে। কিন্তু করতে পারি কি? বিনা পয়সায় করতে পারি মকদ্দমা? তাহলে দুদিনে তোমাদের অবস্থা হবে। বাড়ীতে চলবে উপবাস—জুটবেনা ছেলেমেয়েদেব ইস্কুলের খরচ। অথচ আশা কি আমাদের কম ছিল? মহাত্মাজীর সঙ্গে অসহযোগ করেছি যে স্বাধীনতার জন্য—সেই স্বাধীনতা আমাকে করল আদর্শচ্যুত; আর আমার দেশের লোকদের করল ঠগ, জোচ্চোর, দাঙ্গাবাজ আর ভিখারী। যাও বাপু বাড়ী যাও, মিছে কেন দুঃখ দিচ্ছ।

প্রকাশ—স্যার—

উকিল—এক কাজ কর, ওই ম্যানেজারকেই ধর। অনুনয় বিনয় কর। ভয় দেখাও। সেই সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিছু যদি করতে পারে সেই পারবে।

প্রকাশ—স্যার আমাদের কি তাহলে ভবিষ্যতের কোন আশাই নেই? মানুষ কি কখনও আর সৎপথে চলবে না?

উকিল—(আদর করে) বোকা ছেলে। তাহলে আমাদের মত উকিলেরা না খেয়ে মারা পড়বে। পুলিশ-মিলিটারীর চাকরী যাবে। সৎপথে চলার ঝামেলা কি কম? এখন যা বললাম কর দেখি। (প্রস্থান)

(আলোর মধ্যে টুপি-পরা ম্যানেজার এল—অবাঙ্গালী)

ম্যানেজার—আরে প্রকাশবাবু এমন অসময়ে কি মনে করে।

প্রকাশ—স্যার, আমাদের মাইনের ব্যাপারটা আপনাকে একটু দেখতে হবে।

ম্যানেজার—আরে ভাই সেটা আপনার ইউনিয়ন দেখবে। তার জন্যে আপনি দৌড়ে আসেন কেন ?

প্রকাশ—আমার মাইনে বাড়ানটা বিশেষ প্রয়োজন। আমি সংসার চালাতে পারছি না। কি যে দুঃখে কাটছে দিন! এমনি অবস্থা সকলের।

ম্যানেজার—তা আমি কি করব বলুন। যদি একজনার মাইনে বাড়াই তো আপনাদের ইউনিয়ন চেপে ধরবে—বলবে সকলের মাইনে বাড়ান। অত পয়সা আমি পাই কোথায়! এই ব্যবস্থাতে বছর বছর খালি লোকসান হচ্ছে। নইলে আপনার মাইনে বাড়াবার তো ইচ্ছে আমার ছিল।

প্রকাশ—দেখুন আপনি যদি ইচ্ছে করেন—। বেশী তো চাইছি না আমরা।

ম্যানেজার—খালি কি আপনারা ? অন্য অন্য কোম্পানী জোট বেঁধেছে। আমি বাড়ালেই তখন সব বলবে—কেন বাড়ালে ? তখন আমি কি উত্তর দেব বলুন ?

প্রকাশ—তর্ক করতে চাই না, কিন্তু আমার মনে হয় একটু উপায় আপনি করতে পারেন।

ম্যানেজার—আরে মশাই উপায় থাকলে কি আর আমি করি না ? আমার কি দরদ নেই আপনাদের ওপরে ? আরে আমরা তো জমিদার নই যে খালি নাচ-গান করব, ঘুমোব আর গরুর গাড়ী ভর্তি হয়ে টাকা চলে আসবে। আমাকেও তো খেটে খেতে হয়। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়।

প্রকাশ—দেখুন স্যার আপনাকে বেশী কি বলব। যদি কোনরকম করে—

ম্যানেজার—আচ্ছা দেখি কি করতে পারি। (মানি ব্যাগ থেকে দু'খানা দশটাকার নোট বার করে ধরল।) আসুন।

প্রকাশ—কি ?

ম্যানেজার—এটা আমি আপনাকে সাহায্য করছি।

প্রকাশ—না স্যার।

ম্যানেজার—আরে আসুন ভায়া। মনে করবেন দাদা দিচ্ছে ভাইকে। আমিও অন্ততঃ এইটুকু শান্তি পাব একজনকে কিছু সাহায্য করতে পেরেছি।

প্রকাশ—ক্ষমা করবেন স্যার। বঙ্কুবাবু বলেছেন এইরকম টাকা নেওয়া অন্যায়।

ম্যানেজার—(টাকাটা ব্যাগে রাখল। মেজাজ চড়তে থাকে।) তাহলে তো বঙ্কুবাবুর কাছে গেলেই পারতেন—আমার কাছে এসেছেন কেন ?

প্রকাশ—তার তো টাকা নাই স্যার।

ম্যানেজার—টাকা নাই কিন্তু ফিকির আছে। কোম্পানীর প্রতি আপনাদের আনুগত্য তিনি কমিয়ে দিচ্ছেন।

প্রকাশ—না স্যার। তিনি বরঞ্চ সেটা বাড়িয়েছেন। তিনি বলেন আমরা কোম্পানীর চাকর, তার ম্যানেজারের চাকর নই।

ম্যানেজার—কথাটা তো সুন্দর।

প্রকাশ—হ্যাঁ স্যার খুব সুন্দর কথা।

ম্যানেজার—আর কি বলেন বঙ্কুবাবু ?

প্রকাশ—কোম্পানী শেয়ারহোল্ডারদের, কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।

ম্যানেজার—আরে মশাই, আমিও তো তাই বলি।

প্রকাশ—তাহলে আপনার আর বঙ্কুবাবুর ভাবনায় কোন তফাৎ নাই। তবে স্যার আমাদের মাইনে বাড়ানটা—

ম্যানেজার—সেটা তো শেয়ারহোল্ডারদের হাতে। এবছর তাঁরা বলেছেন মানেজার সেটা ঠিক করবে। আপনারা যান—বাড়ী বাড়ী

ঘুরে আগে শেয়ারহোল্ডারদের majority জোগাড় করুন, তারপর এই পাজি ম্যানেজারকে তাড়িয়ে দেবেন। যতদিন আমি আছি কিছু বাড়বেনা বলে দিলাম—সাফ কথা। আমাকে আগে এখান থেকে তাড়াতে হবে, তবে যদি কিছু হয় আপনাদের আর আপনার বন্ধুবাবুর। (প্রস্থান)

(ছোট আলো নিভে গেল, বড় আলো জ্বলে উঠল। প্রকাশ তার বক্তৃতা শেষ করতে লাগল।)

প্রকাশ—যা ঘটেছিল সবই আপনাদের বললাম। আপনারা কি এর পরেও আশা করেন ডিরেক্টাররা কিছু করতে পারবেন। চারজনার কথা আপনাদের বললাম—অপর তিনজনই ম্যানেজারের আত্মীয়। এখন আপনারা স্থির করুন কি করবেন।

(পিছনে গিয়ে বসে পড়ল।)

শ্রঃ শ্রোঃ একজন—বন্ধুবাবু কোথায় ?

শ্রঃ শ্রোঃ অন্যজন—আমরা বন্ধুবাবুকে চাই।

কাতুদা—বন্ধুগণ, আমি হলফ করে বলতে পারি যে ওই ছোকরার জন্যে আমাদের ভুগতে হবে। ও গিয়ে আবোল-তাবোল বকে এমন সকলকে খিঁচিয়ে রেখেছে যে কেউ আর আমাদের কথায় কান দেবেনা। সত্যি করে কি ও বলেছে সে ও-ই জানে। কিন্তু এখানে এতক্ষণ যে সব কথা বলছিল, সত্যি কথা বলতে কি আমি তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। আচ্ছা, ওকে কে বলেছিল পাকামো করে ডিরেক্টারদের সঙ্গে দেখা করতে ! কি গো—আমাদের সভাপতি বন্ধুবাবু বলেছিল ?

প্রকাশ—না।

কাতুদা—দেখুন বন্ধুগণ, এমনি করে এই সব বিশ্বাসঘাতক আমাদের সমস্ত আয়োজন নষ্ট করে দিল।

প্রকাশ—মুখ সামলে কথা বলবেন।

কাতুদা—আমাদের সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হয়ে গেল। যে আশা নিয়ে আমরা এগিয়েছিলাম—যে প্রস্তুতি ছিল আমাদের মধ্যে—ও তার মূল পর্যন্ত তুলে দিল। ভাই সব—যে গাছটাকে আমরা জল তেল দিয়ে মস্ত করেছিলাম—ও তাতে কুড়ুল মারল। এই রকম সব লোক যতদিন ইউনিয়নে আছে ততদিন আমাদের কিছু করা উচিৎ নয়। প্রথমে এদের একটি একটি করে বেছে এদেশ থেকে তাড়াতে হবে—তারপরে—

প্রকাশ—(একলাফে এগিয়ে এল) আপনি আর একটা কথা বলুন—এক ঘুসিতে আপনার মুখ ফাটিয়ে দেব।

কাতুদা—দেখুন—দেখুন আপনারা। শুনুন ওর কথা। এরাই টাকা খেয়ে সব ভেতরকার কথা দিয়ে আসে—আর সভায় এসে সতীপনা করে, 'কুড়ি টাকা দিতে এসেছিল আমি নিইনি'। যত সব ঘরের শত্রু।

প্রকাশ—এখনও সাবধান করছি, এর পর আর খাতির করব না।

কাতুদা—(মার খেতে হবে তার জন্যে ভীত—কিন্তু তাতে মিটিং ভেঙ্গে যাবে তার জন্যে উল্লসিত) এই সব একালের ছেলে। বয়স মানেনা—খাতির জানেনা, কেবল জানে কি করে পেট ভরাতে হয়। (হরির দিকে তাকায়—সে চালিয়ে যেতে ইঙ্গিত করে।) এরা মাতাল, দুশ্চরিত্র—নিজের মা-বোনকে যেমন ঠেলে দেয় অন্যায়ের পথে—নিজেরা তেমনি অপরের মা-বোনকে কলুষিত করতে দ্বিধা করে না।

(সমস্ত সভাটা চঞ্চল হয়ে ওঠে।)

শ্রঃ শ্রোঃ দু'একজন—মার শালাকে—

শ্রঃ শ্রোঃ একজন—ওই কাতু শালা আসল সয়তান।

শ্রঃ শ্রোঃ অন্যজন—এখনও বঙ্কুবাবু আসছেন না কেন?

কাতুদা—(বলে চলেছে) এদের মনে পাপ—দেহে পাপ—জন্মানোতে পাপ—

প্রকাশ—তবে রে শূয়োর— (গলা টিপে ধরল)

(দৌড়ে এলেন শশীনাথ। কোম্পানীর অতিবৃদ্ধ কর্মচারী। বয়স ৫৯। রোগাক্রান্ত জীর্ণ দেহ। দীর্ঘজীবী এক বাঙালার যোগ্য প্রতিনিধি।)

শশীনাথ—কি করছ প্রকাশ ছেড়ে দাও।

প্রকাশ—ওকে আমি খুন করব। বদমায়েস—(সভায় গণ্ডগোল)

শ্রঃ শ্রোঃ একজন—মেরে ফেল কাতু শালাকে—

শ্রঃ শ্রোঃ অন্যজন—কেন তোর বখরার সঙ্গী নাকি—

শ্রঃ শ্রোঃ একজন—মুখ সামলে কথা বলবি—

শ্রঃ শ্রোঃ অন্যজন—তুই আগে সামলাবি—

শশীনাথ—ছিঃ ছেড়ে দাও।

প্রকাশ—(ছেড়ে দিয়ে কেঁদে ফেলল) আপনি শোনেন নি কাকাবাবু ও কি বলেছে—

শশীনাথ—শুনেছি। সব শুনেছি। ওরা এমনিই বলে থাকে। ওটাই ওদের পেশা। (প্রকাশ বসে বসে কাঁদতে লাগল)

হরিবাবু—এ কথাও কিন্তু আপনাকে স্বীকার করতে হবে শশীদা—প্রকাশও অন্যায় করেছে।

শশীনাথ—আর কার্তিক যা করেছে। এতগুলো লোক তার সাক্ষী আছে—

কাতুদা—আমি অন্যায় কিছু বলিনি—

শশীনাথ—বলনি। তবে পরশু রাতে শ্রীনাথের স্ত্রীকে ম্যানেজারের বাসায় নিয়ে যাচ্ছিলে কেন ?

হরিবাবু—দেখুন শশীদা—

শশীনাথ—চুপ কর। আজ কয়দিন দেখছি না আমি তোমাদের। '৪২ সালে কাতু কি করত জানিনা আমি? তার কোঠা বাড়ী উঠল কি করে সে খবর লুকোবে কার কাছে? '৪৭ সালে গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে আর পাকিস্তানে মাল পাচার করার জন্যে কে ধরা পড়েছিল—? ওই কাতু। তাকে ছাড়িয়ে আনলে কে দু'হাজার টাকার জামিন দিয়ে—ওই ম্যানেজার নয়? কেন—সে কথা কি আমাকে বলে দিতে হবে?

হরিবাবু—কিন্তু এখন কাতুদা শ্রমিক সংঘের একজন পাণ্ডা। সে এখন পেছনের জীবন ভুলে গেছে—

শশীনাথ—আমি শ্রীনাথের স্ত্রীকে সঙ্গে করে এনেছি। সে নিজেদের মুখে সব কথা বলবে—শুনতে চাও।

হরিবাবু—শ্রীনাথের স্ত্রী এসেছে এখানে? ছি-ছি-ছি!

কাতুদা—আমি তা' হলে এখান থেকে—

শশীনাথ—হ্যাঁ—এই মুহূর্তে দূর হয়ে না গেলে, তোমার কীর্তি আরো প্রকাশ পাবে।

কাতুদা—চললাম হরি। (প্রস্থান)

হরিবাবু—এটা কিন্তু তোমার অন্যায় শশীদা। একটা নষ্ট মেয়েমানুষকে সভায় আনার কোন মানে নাই।

শশীনাথ—মানে নেই—না? কিন্তু সে নষ্ট হল কি করে সে খোঁজ কে নেবে? তোমরা সংঘের সম্পাদক শুধু চিৎকার আর বক্তৃতাই

করবে ? একটু ঘরের খোঁজ কর—কে খেতে পেল, কার ঘরে দালাল লেগেছে মেয়ে-বৌকে টেনে নিতে। আমাদের অভাবটাকে নাড়াচাড়া করে তো খাচ্ছ,—এটুকু খোঁজ রাখ কি আমাদের সভার বাইরের ঘরোয়া জীবন কেমন চলছে !

হরিবাবু—(হঠাৎ বক্তৃতা সুরু করে) বন্ধুগণ, আপনারা দেখলেন কি ভাবে শশীবাবু সকলের সামনে আমায় অপমানিত করলেন। আমি এই মুহূর্ত থেকে সম্পাদকের পদ ত্যাগ করছি।

শশীনাথ—তুমি তা পারনা হরি। একমাত্র সভাপতি তোমার পদত্যাগ গ্রহণ করবেন।

হরিবাবু—কিন্তু সভাপতি কোথায় আড্ডা মারছেন আমার যদি জানা না থাকে ?

শশীনাথ—অপেক্ষা করতে হবে।

প্রঃ শ্রোঃ একজন—বঙ্কুবাবু আসছেন না কেন ?

প্রঃ শ্রোঃ অন্যজন—তিনি কোথায় ?

শশীনাথ—তিনি যে সব কাগজপত্র সংগ্রহ করেছেন সেই সব নিয়ে আসছেন। তাতে কি আছে জানেন ? আছে কাতুর চিঠি, ম্যানেজারের নির্দেশ, ডাক্তারের কাছে যে দালাল গিয়েছিল তার ঠিকানা—এমনি অনেক জিনিস। আমাদের হরিবাবুর মুখ যে শুকিয়ে গেল !

হরিবাবু—(তাড়াতাড়ি) প্রকাশের ডাইরেক্টারদের সঙ্গে দেখা করার কোন অধিকার ছিলনা। আমি কৈফিয়ৎ চাই।

শশীনাথ—ওঠ প্রকাশ। লজ্জা পেওনা—ভয় পেওনা। ওকে ওর কৈফিয়ৎ দাও।

(বড় আলো নিভে গিয়ে ছোট আলো জ্বলে উঠল।)

প্রকাশ—সুনন্দা—সুনন্দা—

সুনন্দা—দাদা ওষুধ এনেছ ?

প্রকাশ—মা কেমন আছে রে এ বেলা ?

সুনন্দা—একটু জ্বরটা কমেছে। সন্ধ্যা থেকে ঘুমুচ্ছে। তুমি শশীকাকার কাছে গিয়েছিলে ?

প্রকাশ—হ্যাঁ। তাঁর আসার সময় হল। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন ?

সুনন্দা—এসেছিলেন। বললেন ওই ওষুধই চলবে। বাব্বা যা দাম।

(দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ)

প্রকাশ—তারপর তুই কি ঠিক করলি ?

সুনন্দা—মায়ের অসুখ সারলেই আমরা চলে যাব।

প্রকাশ—মায়ের অত্যন্ত অমত জানিস্ তো ?

সুনন্দা—অমত তো ওকে দেখে নয়—ওর পয়সা নাই দেখে।

প্রকাশ—ট্যাক্সি ড্রাইভারের বৌ হওয়া খুব গৌরবের ?

সুনন্দা—গৌরব তো চাইনা দাদা—আমি চাই ভালোবাসা—নিজের ছোট্ট সংসার।

প্রকাশ—ট্যাক্সি ড্রাইভারের রোজগারে সংসার চলবে ? দুবছর যেতে না যেতেই ছেলেপিলে নিয়ে এসে উঠবি আমার কাছে। একেই তো আমাদের এমনিতে চলে না—তখন একদিনে সব ভেঙে পড়বে।

সুনন্দা—না দাদা। তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকব না কখনও। তুমি দেখো।

প্রকাশ—মাকে কে দেখবে ?

সুনন্দা—আপাততঃ তুমি। মাঝে মাঝে আমি আসব'খন। তারপর তুমি বিয়ে করলে তোমার বউ দেখবে।

প্রকাশ—ওরে ভাই—তোকে আমি বোঝাই কি করে বল তো ? আমাদের রোজগারে বিয়ে করা চলেনা—স্বপ্ন দেখা চলেনা।

সুনন্দা—না দাদা। পয়সাটাই যদি জীবনে সব কিছু হত—তা হলে পৃথিবীতে এত আলো এত ফুলের কোন প্রয়োজন ছিল না। পৃথিবীটা একটা রসহীন শুকনো জায়গা হয়ে যেত।

প্রকাশ—তোর সংসারে যখন অভাব হবে তখন অমিত তোকে এখনকার মত ভালোবাসবে? চোখ থেকে রং যখন মুছে যাবে এক-দুবছর পরে, তখন তুই দাঁড়াবি কোথায়?

সুনন্দা—আমাদের ভালোবাসা যদি সত্যি হয় তাহলে আমরা শান্তি পাবই —যতই অভাব আসুক। কিন্তু স্থূল জীবনযাত্রায় যদি হারিয়ে ফেলি নিজেদের অনেক লোকের ভীড়ে—তখন অভাবটা এসে চাপবে বৈকি ঘাড়ে। সেটাই হয়ে উঠবে জীবনের একমাত্র সত্য।

প্রকাশ—অমিতের ভালোবাসাটাও কি এমনি কাব্যময় নাকি? সেও কি ভাবেনা তোর পাঁচটা ছেলেপিলে হলে এখনকার রোজগারে আধবেলা করেও পেট ভরবেনা?

সুনন্দা—দাদা—তোমরা টাকা-টাকা, পয়সা-পয়সা করে মনের ভাবনাগুলোকে এমন একমুখী করে ফেলেছ—যে তোমরা ভাবতেই পারনা—অভাবের সংসারেও সুখ থাকে। টাকাটা প্রয়োজন বটে—অত্যন্ত বিকট প্রয়োজন। কিন্তু তার জন্যে জীবনটাকে টাকার পায়ে ঢেলে দিতে হবে একথা আমি মানিনা (বাইরে মোটরের হর্ন বাজল) ওই আসছে। তুমি যেন আবার তর্ক বাধিও না।

প্রকাশ—না রে। আমি যাই কাকাবাবুর কাছে। দেখি তিনি কি বলেন।

(অমিত ঢুকল। ট্যাক্সি ড্রাইভার। খাকি সার্ট, প্যান্ট, ময়লা, ঘেমো। চেহারাটা ঝকঝকে)

অমিত—আরে, দাদা যে আমাকে দেখেই পালাচ্ছেন!

প্রকাশ—না ভাই, একটু কাজ আছে। তোমরা কথা বল। (প্রস্থান)

অমিত—দাদাকে আমার বেশ লাগে। আমাদের গল্প জমে ভালো।

সুনন্দা—তোমাদের গল্প মানেই তো তর্ক।

অমিত—তর্কে জ্ঞান বাড়ে আর দাদা বেশ সিরিয়াস্। আমার মত ছ্যাবলা নয়।

সুনন্দা—তোমায় কিন্তু আজকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। খুব খাটনি হয়েছে নাকি?

অমিত—না। দাড়িটা কামান হয় নি। তাই। (হেসে) আজ আমার নাপিতকে একটা তালুক দিয়ে দিলাম। তাই আনন্দে সে ব্যাটা আসতে ভুলে গেছে।

সুনন্দা—তাই নাকি? তবে তুমি একটু শিসমহলে বসে আরাম কর। আমি তামাক পান আর গোলাপজল আনতে দি। আজ সেতারে কি রাগের আলাপ হবে—খাম্বাজ না বেহাগ?

অমিত—বেহাগই হোক, তার সঙ্গে তোমার সখীদের জলতরঙ্গ চলবে। তারপর আজ কি রান্না হয়েছে?

সুনন্দা—বিরিয়ানী পোলাও—মাংসের কোপ্তা—মাছের কাবাব—আর চিংড়ির কাট্‌লেট্।

অমিত—রোজ এক জিনিস কি খাওয়া যায়? ও সবে আমার অরুচি হয়ে গেছে। ওগুলো চাকরকে দিয়ে দাও। আমি খাব কলায়ের ডাল আর সুক্তো।

সুনন্দা—ততক্ষণ নাগরা জুতো আর ভেলভেটের চাপকানটা খুলে রাখলে হত।

অমিত—না বেশ আছি। এখুনি আবার রাজকাজে বেরুতে হবে। তোমায় কিন্তু মানিয়েছে চমৎকার। এই বেনারসী শাড়ীখানা ট্যাকখালির নবাবের সঙ্গে রেশারেশি করে কেনা। দাম ১০০০৲ টাকা। ওটা পরে তোমায় ভালই দেখাচ্ছে। তার সংগে ৫০০০৲ টাকার ব্রোকেডের জামা। (সুনন্দা নাচের ভঙ্গীতে একবার পাশ

ফিরল; তারপর পেছন।)—এখন আমি ক্যামেরাম্যান—(চোখের সামনে একটা হাতকে গোল করে ধরে অন্যহাতে কাল্পনিক হ্যাণ্ডেল ঘোরাতে লাগল। যেন সিনেমার ছবি তুলছে। দু'জনে হেসে উঠল জোরে।)

সুনন্দা—তুমি এত ফাজিল।

অমিত—দাদা রাজী?

সুনন্দা—দাদা বলে তোরা খাবি কি?

অমিত—যদি না খেয়ে থাকি—তারপর দু'জনে একসঙ্গে মরি।

সুনন্দা—দাদা তোমার কবিত্বের ধার ধারেনা। সে কাগজ কলম নিয়ে হিসেব করে, কতদিন আর ভারতবর্ষ গরীব হয়ে থাকবে। রোজ খবরের কাগজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে খুঁজে দেখে সূর্য ওঠার খবর আছে নাকি কোথাও।

অমিত—ওই জন্যেই তো দাদাকে এত ভালো লাগে। দাদা পৃথিবীটাকে অঙ্কের ফলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। যোগবিযোগের নিয়ম অভ্রান্ত।

সুনন্দা—আমাদের বিয়ে করাটাও তাই দাদা পছন্দ করছে না। কারণ তোমার যা আয়—তাতে ভালো ভাবে বাঁচা যায় না।

অমিত—দাদারা এক জায়গায় ভুল করে—আর সেটা কি জান? পয়সাটা বাঁচবার পক্ষে এক অতি আবশ্যকীয় প্রয়োজন—কিন্তু ওটাই জীবনের একমাত্র জিনিষ নয়—কত ছন্দ কত আশা জাগরণের পথকে আলো করে। খালি টাকার মাপকাঠিতে সেটা মাপা যায় না।

সুনন্দা—আমার দুঃখ, দাদা আমাকে সত্যি ভীষণ ভালোবাসে। আমি জোর করে চলে গেলে দাদার মনে বড় বাধবে।

অমিত—তা ঠিক। কিন্তু পরে যখন দেখবেন আমরা সত্যি করে আনন্দের সংসার পেতেছি—তখন নিশ্চয়ই খুশী হবেন।

সুনন্দা—জান সময় সময় আমার খুব ভয় করে।

অমিত—আমার কি করে না? তখন প্রাণপণে জোর সংগ্রহ করি এই বলে—এটা আমাদের ভালোবাসা প্রকাশের সুযোগ। নিজেদের স্পষ্ট করে দেখার সুযোগ।

(অমিত সুনন্দার হাতটা নিয়ে কপালে বুকে বুলাল তারপর মুখের ওপর চেপে ধরল।)

—আমরা কিছুতেই পেছাব না।

(বাইরে প্রকাশের গলা শোনা গেল)

প্রকাশ—আসুন কাকাবাবু। অমিতও আছে—ওদের একটু বুঝিয়ে বলুন।

শশীনাথ—(এলেন) আমি তো আগেই বলেছি প্রকাশ, যে যার নিজের জীবন গঠন করবে। অন্য কারু মাতব্বরি অচল সেখানে।... এই যে অমিত, কেমন আছ। তোমার গাড়ী চলছে কেমন?

অমিত—ভালই। বড় ট্যাক্সিদের রেট্ কমানোতে কিছু অসুবিধে হয়েছে। তবে যে পরিমাণ লোক বেড়েছে সে তুলনায় কিছুই নয়।

শশীনাথ—এখনও তুমি সেই একখানা ঘর নিয়ে আছ?

অমিত—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তো সারা দিন গাড়ীতে ঘুরি, তাই অসুবিধে হয় না।

শশীনাথ—তোমাকে আমার ভালো লাগে কোন আড়ম্বর রাখ নি জীবনে।

প্রকাশ—এইবার সেই ব্যবস্থা হচ্ছে। বিয়ে করলে কি করবে?

অমিত—যেমন আছি তেমনি থাকবে।

প্রকাশ—না না সে কথা বলছিনা। চালাবে কি করে?

অমিত—(হেসে) যখন জুটবে তখন খাব—না জুটলে আকাশ দেখব, এই ভাবে।

প্রকাশ—শুনছেন কাকাবাবু।

শশীনাথ—তোমার দারিদ্র্যে চিন্তা হয় না?

অমিত—না, শুনতে হয় তো অদ্ভুত লাগবে আমার কথা। কিন্তু আমি মনে করি জীবনে শান্তি যদি থাকে মনের দিক থেকে, তাহলে অর্থে অনর্থ করতে পারেনা।

শশীনাথ—একথা বোধহয় তোমার ঠিক। অর্থকে আমরা একটু উঁচু আসন দিয়েছি। সেইজন্যে সব প্রশ্নগুলোই ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

অমিত—আমি তো বিশ্বাস করি যে, আমাদের মানুষ হিসেবে অধিকারের কথা যখন আমরা বলি তখন শুধু অর্থ বা টাকাপয়সার দিক থেকেই খালি চিন্তা করি। বুদ্ধির দিক থেকে, রূপের দিক থেকে যে সম্পদে আমরা অধিকারী তা ভুলে যাই।

সুনন্দা—তাই দেখুন কাকাবাবু চাওয়া-পাওয়া নিয়ে কত বিরোধ। অর্থ যাদের আছে তারাই কি সুখী?

শশীনাথ—বঙ্কুবাবুও সেদিন বলেছিলেন ওই ধরনের কথা। তিনি বললেন —একজন কর্মীকে যখন আমরা সচেতন করি তার অর্থের অভাব সম্বন্ধে—তখন কিন্তু তার অন্য অভাবগুলো সম্বন্ধে কিছু বলি না। তার শিক্ষার অভাব, জ্ঞানের অভাব, বুদ্ধির অভাব সম্বন্ধে চুপ করে থাকি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। একথা বলতে সাহস থাকেনা যে তোমাদের অভাব নিয়মানুবর্তিতার— অভাব সত্যপথে চলার মানসিক অবস্থার।—তাই খালি ঘুরে ঘুরে পাঁকে পড়ছি।

প্রকাশ—আমাকেও সেদিন বঙ্কুবাবু বলছিলেন—বন্ধ করতে পারবে এদের মদ খাওয়া, চরিত্র হারান, চুরি করা—ঘুষ নেওয়া? তবে চিন্তা কোরো জাতীয় চরিত্র উন্নতির। তবেই সফল হবে তোমার সত্যিকারের শ্রমিক নেতা হবার স্বপ্ন।

অমিত—বঙ্কুবাবুকে আমার প্রণাম জানাবেন। অদ্ভুত তাঁর দৃষ্টি শক্তি।

সুনন্দা—আমি তাঁকে একবার দেখেছি—অদ্ভুত লোক। স্বপ্নময় দৃষ্টি।

অমিত—কাকাবাবু, আমরা তা'হলে আগামী মাসেই শুভকাজ সারতে চাই। আপনি আশীর্বাদ করুন।

শশীবাবু—তোমার চোখে সুন্দরের স্বপ্ন। তোমাদের জীবন সুখের হোক।

প্রকাশ—মায়ের মত কিন্তু আপনাকে করতে হবে।

শশীবাবু—সে হবে। উনি আছেন কেমন।

সুনন্দা—আজ জ্বরটা কম, সন্ধ্যা থেকে ঘুমুচ্ছেন।

অমিত—আমরা তা'হলে কালীঘাটে যাব কাকাবাবু। আপনাকেও থাকতে হবে।

শশীবাবু—আচ্ছা।

প্রকাশ—কালীঘাটে? না। ছি ছি, আমাদের বাড়ীর সবারই বিয়ে বাড়ীতে হয়েছে।

অমিত—কিন্তু সে যে অনেক টাকার ব্যাপার।

প্রকাশ—আমি যেমন করে পারি যোগাড় করব। অমিত আমাকে একটু সুযোগ দাও, তারপর কালীঘাটে যেও, বারণ করব না।

অমিত—না দাদা আমার তাড়াতাড়ি নেই। আপনি চেষ্টা করুন।

(বাইরে হর্ণ বাজল)

—আমার ডাক পড়েছে। চলি দাদা, চলি কাকাবাবু!

(প্রস্থান। সঙ্গে সুনন্দা গেল।)

শশীবাবু—তারপর প্রকাশ—তুমি টাকা পাবে কোথা থেকে?

প্রকাশ—তাই তো ভাবছি। আচ্ছা কোম্পানীর ডিরেক্টারদের ধরলে হয় না?

শশীবাবু—তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার। আমার মনে হয় না কিছু ভালো ফল পাবে। ম্যানেজারই সব।

প্রকাশ—কিন্তু কালীঘাটে আমি ওদের যেতে দেব না।

শশীবাবু—যাও ডিরেক্টারদের সঙ্গে দেখা কর। টাকা না পাও অন্য লাভ হবে।

(ছোট আলো নিভে গেল। বড় আলো জ্বলে উঠল। শশীবাবু বলে যেতে লাগলেন।)

শশীবাবু—আপনাদের মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করতে হবে ধর্মঘট করবেন কি না। এখুনি ধর্মঘট করলে—কোম্পানীর ম্যানেজার মুস্কিলে পড়বে—তাই কাতু আপনাদের সভা মুলতুবী করতে চাচ্ছিল। আবার ধর্মঘট করলে আপনাদেরও অসুবিধে আছে—ঘরে ঘরে অভাব আছে—অনাহার আছে। কাজেই হঠাৎ রাজী হয়ে গেলেও ধর্মঘটে আমাদের বিপদ কম নাই। আমার বুদ্ধিতে এই বুঝি—। বঙ্কুবাবু অনেক বুদ্ধিমান লোক—তিনি কি বলেন আমাদের শোনা উচিৎ। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর কথামত কাজ করব।

শ্রঃ শ্রোঃ একজন—বঙ্কুবাবু কোথায়—

শ্রঃ শ্রোঃ অন্যজন—আর কতক্ষণ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব ?

কয়েকজন—বঙ্কুবাবু —

(অধিরথ দৌড়ে ঢুকল)

অধিরথ—সর্বনাশ হয়েছে বঙ্কুবাবুর মাথা কে ফাটিয়ে দিয়েছে—

শশীবাবু—সে কি ! কে করলে ! (মঞ্চের সব লোক ছুটে গেল)

হরিবাবু—বেঁচে আছেন তো না কি ?

অধিরথ—জানি না। খামারের পেছনে পড়েছিলেন। ডাক্তারবাবু কোথায় ?

প্রকাশ—এইমাত্র তো এখানে ছিলেন। আমি দেখছি (দ্রুত প্রস্থান)

শ্রঃ শ্রোঃ একজন—কি হয়েছে—

অন্যজন—জোরে বলুন—

অনেকে—বঙ্কুবাবু কোথায় —(মঞ্চ শূন্য)

শশীবাবু—বল অধিরথ—

অধিরথ—বন্ধুগণ, এইমাত্র থামাবের পেছনে বঙ্কুবাবুকে পাওয়া গেছে। তার মাথা ভীষণভাবে ফেটে গিয়েছে—

শশীবাবু—বল অধিরথ কোন দিকে—

(সমস্ত সভার মধ্যে গুঞ্জন উঠল। ক্রমে তা বাড়তে লাগল, হঠাৎ ফেটে পড়ল এক সমবেত হুঙ্কারে।)

সমবেত কণ্ঠ—ধর্মঘট ঘোষণা কর।

হরিবাবু—আপনারা শান্ত হোন। এটা আমাদের সঙ্কট সময়।

সমবেত কণ্ঠ—ধর্মঘট ঘোষণা কর।

রক্তের বদলে রক্ত চাই ॥

শশীবাবু—(খুব দাঁড়াল) বন্ধুগণ, স্থির মাথায় চিন্তা করতে হবে—

সমবেত কণ্ঠ—ধর্মঘট ঘোষণা কর।

যত মজুর এক হোক ॥

রক্তের বদলে রক্ত চাই ॥

শশীবাবু—বন্ধুগণ, আমরা এখনও জানি না বঙ্কুবাবু মৃত না জীবিত।

সমবেত কণ্ঠ—বঙ্কুবাবুর মৃত্যুর প্রতিশোধ চাই।

দালালদের রক্ত চাই ॥

শশীবাবু—তুমি এগোও অধিরথ। (অধিরথ চলে গেল)

হরিবাবু—চলে এস শশীদা, ওদের এখন বোঝান যাবে না।

শশীবাবু—তোমরা কি করলে হরি। যে দানবটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খ্যাপালে—জান তার কি প্রচণ্ড শক্তি?

হরিবাবু—তুমি যদি না চলে আস এর পর আমাকে দায়ী কোরো না।

শশীবাবু—দায়ী! না তোমরা দায়ী হবে কেন? যে শক্তিটাকে দিয়ে পাহাড় গুঁড়োনো যেত তোমরা তার ক্ষুধার আহার পর্যন্ত দাও

নাই। আজ সে অত্যাচারে অত্যাচারে ক্ষেপে উঠেছে—শেষ আশা ছিল বঙ্কুবাবু, এই প্রচণ্ড শক্তিকে ঠিক পথে নিয়ে যাবে। তোমরা সে সম্ভাবনাকেও নষ্ট করে দিতে চলেছ। ওই ধ্বংসের স্রোতকে আটকাতে পারবে তুমি? বাঁধ দিতে পারবে ওই জনসমুদ্রের সামনে? ওই দুর্নিবার হিংসাকে বোঝাতে পারবে?

সমবেত কণ্ঠ—রক্তের বদলে রক্ত চাই!

দূষিত কারখানা ধ্বংস কর!!

হরিবাবু—শশীদা কি পাগলামো করছ? দেখেছ ওরা সব ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছে!

শশীবাবু—সেই জন্যেই তো আমাকে থাকতে হবে। শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে। এই শক্তিকে এতটুকু ক্ষয় হতে দেওয়া চলবে না।

হরিবাবু—আমার সাহস হচ্ছে না। আমি চললাম! ওই দেখ ওরা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে!

সমবেত কণ্ঠ—রক্তের বদলে রক্ত চাই!!

(শশীবাবু একা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সমবেত চিৎকারে তাঁর কথার কিছু শোনা যাচ্ছেনা। মুহুর্মুহু চিৎকার উঠতে লাগল—)

সমবেত কণ্ঠ—বঙ্কুবাবুর মৃত্যুর প্রতিশোধ চাই!

হত্যাকারীকে ধ্বংস কর!!

রক্তের বদলে রক্ত চাই!!!

জৈবিক

চরিত্রলিপি

অলকা * বিনতা
* একজন বোবা *
একটি পুলিশ-সার্জেণ্ট *
ও একদল লোক

জৈবিক

সন্ধ্যা সমাগত। রাস্তা দিয়ে নানা রকম লোক যাচ্ছে। প্রায় সবাই অফিস থেকে ফিরছে, তাই স্রোতটা একমুখী। উল্টো দিক দিয়ে একজন লোক ঢুকল। বয়সটা যৌবনের চাপল্য ছাড়িয়েছে কিন্তু এখনও প্রৌঢ়ত্বে পৌছয় নাই। তবে চোখে মুখে একটা সভয় উদ্দেশ্যহীনতা এসেছে। আশাহত জীবনের ক্লান্তি স্পষ্ট বোঝা যায়। লোকটি কাউকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। তার চোখে খুশী আর আশা প্রকাশ পেল। তারপর জনস্রোতকে লম্বালম্বি ভেঙে পেছনে চলে গেল।

জনস্রোতের উল্টোদিক থেকে এসে, চলমান জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে তারপর সেটাকে কেটে পেছনে যাওয়ার ভেতর দিয়ে বোঝাতে হবে যে লোকটি প্রতিদিনের নিয়মিত ধারা হতে স্বতন্ত্র।

জনস্রোত শেষ হয়ে গেল। লোকটিকেও দেখা যায় না। দু'টি মেয়ে কথা বলতে বলতে এল। এরাও লোকটিকে লক্ষ্য করেছে। মেয়ে দু'টি অফিস থেকে ফিরছে।

অলকা—জানিস ভাই, ওই লোকটা আমাকে রোজ লক্ষ্য করে। আর চোখোচোখি হবা মাত্র দৌড়ে ওই পার্কটার মধ্যে পালিয়ে যায়।

বিনতা—বদমায়েস নয় তো ?

অলকা—আমিও প্রথম প্রথম ভাবতাম বদমায়েস হবে। কিন্তু এখন আর তা মনে হয় না। লোকটা কেমন করে যেন চায়—ভারি করুণ।

বিনতা—তোর দেখি মায়া পড়ে গেছে।

অলকা—তা মন্দ বলিস নাই। আর ও তো কবে থেকে তাকিয়ে থাকে, সেই সুধীর যখন আসতো তখন থেকে।

বিনতা—বাবা সে তো আজকের কথা নয় রে! আচ্ছা সুধীর আর আসেনা?

অলকা—না। (মুখটা দুঃখিত হয়)

বিনতা—আশ্চয। কে জানতো ও এমনি করবে। আচ্ছা ও বিয়ে করবে কথা দিয়েছিল না?

অলকা—না কথা ঠিক দেয়নি। তবে রোজ অফিসে আসত, রোজ আমরা একসঙ্গে ফিরতাম।

বিনতা—সে আর জানি না। কত ঠাট্টা করতাম আমরা তোকে। পাঁচটার একমিনিট পরে আর তোকে ধরে রাখা যেত না।

অলকা—কোনদিন লেকে যেতাম, কোনদিন বেড়াতাম গঙ্গার ধারে। বাড়ী যেতে কতো রাত হয়ে যেত এক একদিন।

বিনতা—তোর মা রাগ করতেন না?

অলকা—করতেন না আবার। তবে জানিস তো কোন কালের মায়েরাই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পেরে ওঠেন নি।

বিনতা—ও তো তোদের বাড়ীতেও যেত।

অলকা—সত্যি কথা বলতে কি, ও আমাদের বাড়ীতে যাবার পর থেকেই আমি স্বপ্ন দেখা স্বুরু করি। (ম্লান হাসে) কত আলোচনা, কত গবেষণা তখন দু'জনে মিলে। আমরা দু'জনে যা মাইনে পাই তাতে কতখানি ভালোভাবে থাকা যাবে—কতদিন সিনেমা দেখা যাবে।

বিনতা—আচ্ছা—ও তাহলে তোকে ছেড়ে চলে গেল কেন?

অলকা—এমনি।

বিনতা—যাঃ এমনি কেউ কাউকে ছেড়ে চলে যায়।

অলকা—আগে জানতাম না। কিন্তু এখন জানি, যায়।

বিনতা—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব অলকা? কিছু মনে করিস না।

অলকা—কর না।

বিনতা—ছেলেরা মেয়েদের ছেড়ে চলে যাবার একটা বড় কারণ জানিস, তাদের আশা মিটে যায়—এমন কিছু ঘটেছিল যাতে—যাতে—
(বলতে বাধে কথাটা)

অলকা—না, বিনতা এমন কিছু ঘটেনি। তোর বলতে লজ্জা হচ্ছে। কিন্তু আমার লজ্জা নাই। ও আমাকে পায় নাই বিনতা।

বিনতা—তবে ?

অলকা—(আবার বলে) ও আমাকে পায় নাই। দেহেও না, মনেও না। নাই তো ও চলে যাবার পর দুঃখ পেয়েছিলাম। ব্যথিত হই নাই।

বিনতা—আশ্চয। এতদিনের পরিচয় কোন কারণ ছাড়া কি মুছে দেওয়া যায় ?

অলকা—যায়। যখন নিজের মনের কাছে নিজের ফাঁকি বেরিয়ে পড়ে তখন তো টেনে চলবার আর কিছুই থাকে না।

বিনতা—তার মানে ?

অলকা—তুই জানিস, সুধীর একজন সাধারণ লোক ছিল। আমি সেটা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু ও যেদিন বুঝল যে আমিও সাধারণ—সেদিন আর তার আমার কাছে মুখ দেখাবার রাস্তা থাকল না।

(বিনতা দুঃখিত হল। প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চায়)

বিনতা—ওই দেখ, লোকটা কি রকম একদৃষ্টে তোর দিকে তাকিয়ে আছে।

অলকা—রোজ অমনি করে তাকায়।

বিনতা—কাছে আসে না ?

অলকা—না।

বিনতা—কখনও কিছু বলে না ?

অলকা—(মাথা নাড়ে) শুধু দূর থেকে দেখে।

বিনতা—ও বোধহয় তোকে ভালোবাসে।

অলকা—কি জানি।

বিনতা—সত্যি, দেখ তো কিরকম করুণ ভাবে তাকিয়ে আছে।

অলকা—একদিন ভেবেছিলাম ডেকে জিজ্ঞেস করব ও কি চায়।

বিনতা—তারপর ?

অলকা—কাছে যেতেই ও দৌড়ে পালিয়ে গেল। বোধ হয় ভেবেছিল আমি ওকে খুব বকব।

বিনতা—তুই কি বলতে গিয়েছিলি ?

অলকা—জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলাম শুধু ও কি চায়।

বিনতা—ও কি চায় তা কি আজো বুঝতে পারিস নি ? ও চায় তোর ভালোবাসা। দেখ না, চোখ দেখলেই বুঝতে পারা যায় ও লোকটা বদমায়েস নয়।

অলকা—বিনতা।

বিনতা—কি ?

অলকা—তোর মনে হচ্ছে ওই লোকটা আমাকে ভালোবাসে ?

বিনতা—তাই তো মনে হচ্ছে।

অলকা—দেখ, তোকে আজ কেন নিয়ে এসেছি জানিস ?

বিনতা—কেন ?

অলকা—আমি আর নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। অভাবে অভাবে মনটা আমার দেউলিয়া হয়ে গেছে। এ জীবনে কি চেয়েছি ? কেবল একটু শান্তি—তাও কি পাব না ?

বিনতা—পাবি অলকা। এত মুষড়ে পড়লে কি চলে ? এই তো, ওই লোকটিকে দেখ তো, ও তো তোকে শ্রদ্ধা করে। আমি

যে প্রথম আজ ওকে ভালো। করে লক্ষ্য করছি, আমার চোখেও তা' স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অলকা।—জানিস বিনতা, এখান দিয়ে যখন যাই রোজ ওকে দেখি। ভাল লাগে, মনে হয় আমিও মানুষ। স্নেহ, মমতা, মায়ার গণ্ডী আজও পার হয়ে যাইনি। তারপর বাড়ী গিয়ে আয়নায় মুখ দেখি। আমার সব আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়।

বিনতা—ভাবিস কেন? বিয়ে হয়ে গেলে ও সব ঠিক হয়ে যাবে। এই বয়সে ও রকম সবারই মনে হয়।

অলকা।— এটা কি রকম জানিস? দুঃখ নয়, ব্যথা নয়—কেমন যেন হতাশ্বাস। ভবিষ্যৎটা যেন সামনে থেকে কে মুছে দিয়েছে। পড়ে আছে প্রতিদিনের কাজের ছাই—আর তাকালেই দেখতে পাই ওই ছাইরঙা আকাশ। কি আছে আমাদের জীবনে বল দেখি?

বিনতা—ও লোকটিকে ডাকি?

অলকা—না। ছিঃ।

বিনতা—দেখতে তো ভদ্রলোকের ছেলের মত। অবস্থা হয় তো খারাপ—যা জামা কাপড়ের অবস্থা।

অলকা—হয় তো বেকার। আমাদের শাসনতন্ত্রের অঙ্গ

বিনতা—ডাকি, কি বল?

অলকা—না। হয় তো চাকরী-বাকরী নাই, ডাকলে লজ্জা পাবে।

বিনতা—কথা বলতে দোষ কি?

অলকা—হয় তো শিক্ষিত। ওদের লজ্জা তো আরো বেশী।

বিনতা—শোন, ডেকে কথা বললে ওই ভদ্রলোকেরও সম্ভবতঃ উপকার হতে পারে। উনিও হয় তো তোর মত হতাশ হয়েছেন।

অলকা—(আস্তে আস্তে হাসে) ভাব দেখি বিনতা, সেটা কিরকম একটা মজার ব্যাপার হবে। আমি আর ও দু'জনে একই কথা ভাবছি

—একই দুঃখ পাচ্ছি, অথচ কেউ কারুর কাছে মুখ খুলতে পারছি না। ও হয় তো দিনের পর দিন আমাকে দেখছে আর ভাবছে আমি হৃদয়হীনা।

বিনতা—তোর যত পাগলামো।

অলকা—আচ্ছা মনে কর না, মনে কর না। আমি আমার কোন বন্ধুর বিয়েতে গেছি। বর এল, হৈ চৈ লেগে গেল—সবাই বর দেখতে ছুটল। আমি কনের কাছে বসে—বর দেখা হল না। তারপর ছাঁদনা তলায় বর যেই কনের গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছে —বর দেখতে গিয়ে দেখি—এ যে সেই পার্কের ভদ্রলোক। বর কনের গলায় মালা দিল—কিন্তু শুভদৃষ্টি হল আমার সঙ্গে। আমি বাড়ী ফিরে কাঁদতে বসলাম।

বিনতা—নে বাড়ী যাবি তো চ'। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না।

অলকা—দাঁড়া না, দাঁড়া না। আচ্ছা এমন যদি হয় ও বেকার নয়, গরীব নয়। সিনেমায় তো কত দেখায়।

বিনতা—ও খালি সিনেমাতেই হয়। নে বাড়ী চল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর স্বপ্ন দেখতে হবে না।

অলকা—বিনতা, ওকে ডাক।

বিনতা—ডাকব……কিন্তু অপরিচিত লোককে কেমন করে ডাকব?

অলকা—হাতছানি দিয়ে ডাক।

বিনতা—অন্য কিছু যদি ভাবে?

অলকা—না না তুই ডাক না। ডাক না ভাই।

বিনতা—(ডাকে) ও মশাই, এদিকে শুনুন। ঐ দেখ, পালিয়ে যাচ্ছে।

অলকা—পালাতে দিসনে বিনতা—আমায় ভবিষ্যৎ খালি পালিয়ে যায়!

বিনতা—কিন্তু—

অলকা—আজ যেমন করে হোক একটা কিছু হোক। দৈনিকের একঘেয়েমী আর বইতে পারি না।

বিনতা—শুনুন, ও মশাই। শুনছেন— (প্রস্থান)

(অলকা একা দাঁড়িয়ে থাকল। তার চোখে হতাশা। ক্রমে তা বদলে যেতে লাগল। বিনতা যে লোকটাকে নিয়ে আসছে তা অলকার মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

অলকা কাপড় চোপড় ঠিক করে নিল। মাথার চুলে কয়েকবার হাত বুলোল। বিনতা এল।)

বিনতা—বাবাঃ কি লাজুক ভদ্রলোক। চোখ রাঙিয়ে নিয়ে আসতে হল। আর সব থেকে মজা কি জানিস, একটা কথাও বলেনি আমার সঙ্গে।

অলকা—তুইও আচ্ছা একটা মদ্দানী হয়েছিস্।

বিনতা—ওই যে এসেছে।

(লোকটি ঢুকে একপাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।)

—দেখেছিস?

অলকা—আঃ চুপ কর না।

(একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা সকলে অনুভব করে)

বিনতা—কি হল সবাই যে চুপচাপ! আপনি—আপনি—দূর ছাই আমিই বা কি বলি। আপনি বুঝি এই পথ দিয়ে যান? আপনার সঙ্গে অলকার প্রায়ই দেখা হয়। আপনি মানে—তুই কিছু বল না অলকা।

অলকা—আমি আবার কি বলব। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে না? আপনার—আপনার শীত করছে না?

বিনতা—কোন কথার জবাব দেয় না—এ কেমন লোক?

অলকা—আপনাকে—। আমি মানে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি আপনি ও পার্কে রোজ দাঁড়িয়ে থাকেন ?

বিনতা—হাঁরে পাগল নয় তো ?

অলকা—পাগল ? না না।

(লোকটা হঠাৎ দৌড়ে এসে অলকার পায়ের কাছে বসে পড়ল—তার দু'চোখে জলের ধারা। গরম অশ্রু টপ্ টপ করে অলকার পায়ের ওপর পড়তে লাগল।)

বিনতা—অমন করছে কেন রে ?

অলকা—(তার চোখও সজল হয়ে উঠেছে) ও—ও-কাঁদছে। ওর জীবনের সমস্ত বিফলতাকে ও আমার কাছে এনেছে। ওর মুখ দিয়ে ভাষা সরেনি—কিন্তু চোখের জলে বাঁধ দেবে কে ? ওরে বিনতা, আমার জীবনটা আজ সার্থক হয়ে গেল রে ! আমার জন্যে আমার পায়ের ওপর কেউ কাঁদবে—এ—এ আমি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবি নাই, স্বপ্নেও কোনদিন ভাবি নাই।

বিনতা—আমার কাছে সব কি রকম অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

অলকা—জানিস বিনতা, ওর ভালবাসা পৃথিবীর কাদায় পড়ে কলুষিত হয় নাই। দূর থেকে ও দিয়েছে, আমি নিয়েছি। ও প্রতিদানে কিছু চায়নি—কেবল দিয়েছে। মন দিয়ে ও আমার মনকে ডেকেছে—আমি শুনতে পেয়েছি, ওকে পেয়েছি। এবার আমার যা আছে উজাড় করে ঢেলে দেব—উজাড় করে দিয়ে যাব। ও আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, বিনতা ও আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে।

(ধীরে ধীরে লোকটির মাথার ওপর দুটি হাত রাখে)

—তুমি ভয় পেও না। তুমি যাই হও আমি তোমাকে গ্রহণ করব। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ—আমার হারিয়ে ফেলা

আত্মবিশ্বাসকে ফিরিয়ে দিয়েছ—আমি আবার মানুষ হয়েছি—মানুষ হবার সুযোগ পেয়েছি।

বিনতা—অলকা বাড়ী চল। কি হচ্ছে এই রাস্তার মাঝে।

অলকা—জানিস ও এত কেঁদেছে যে আমার পা দুটো একেবারে ভিজে গিয়েছে। কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জানিস। মনে হচ্ছে কে যেন শান্তিজল দিয়ে আমাকে পবিত্র করে দিল। আমার মনের সব গ্লানি ধুয়ে দিয়ে আমাকে নির্মল করে দিল।

বিনতা—(লোকটিকে) শুনছেন, উঠুন। আমাদের বাড়ী যেতে হবে।

অলকা—এমন ভালবাসা কোথাও দেখেছিস বিনতা, শুনেছিস কখনও? দেহটা সবস্ব হয় নি, কিন্তু দু'জনার প্রাণের তারে তারে ঘা লেগে ঠিক সুরটি বেজে উঠেছে—ঠিক গান ধ্বনিত হয়েছে।

বিনতা—(লোকটিকে) শুনছেন। উঠুন, কাণ্ডজ্ঞানও লোপ হয়েছে।

অলকা—আঃ বিনতা, চুপ কর।

বিনতা—চুপ করব কি রে? রাস্তার মাঝে রাজ্যের লোকের সামনে একটা পুরুষ মানুষ পায়ের ওপর পড়ে থাকবে, আমি কিছু বলব না? উঠুন বলছি।

(লোকটি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়)

—কি নাম আপনার, বাড়ী কোথায়? কি চুপ করে আছেন যে? বলুন।

অলকা—বিনতা কি করছিস, ছিঃ। তোকে সঙ্গে নিয়ে আসাই আমার ভুল হয়েছে।

বিনতা—নাম বলুন—বলুন কি নাম আপনার?—

(লোকটি কিছু বলতে চেষ্টা করে কিন্তু ওর গলা দিয়ে কোন কথা বার হয় না। বার হয় কেবল খানিকটা অদ্ভুত আওয়াজ। মেয়ে দু'টি ভয় পায়।)

বিনতা—কি!

অলকা—কি নাম বললেন?

(লোকটি আবার আওয়াজ করে এবার আরও জোরে। সে বোবা, তার প্রাণের কথাকে ভাষা দিতে পাবে না। অব্যক্ত বেদনায় বার বার পাশব চিৎকার করে)

বিনতা—অলকা, ও বোবা!

অলকা—বোবা!!

(বোবার কাছ থেকে দূরে পালায়। বিনতাকে জড়িয়ে ধরে। তারপর প্রাণপণে চিৎকার করে। তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল—সে যে সাধারণ হয়ে গেল! চারিদিক থেকে পুরুষরা দৌড়ে আসতে থাকে রমণীকণ্ঠে চিৎকাব শুনে। বোবা সবাইকে ছুটে আসতে দেখে ঘুরে পালাতে থাকে।)

পুরুষগণ—কি হল, কি হয়েছে?

—চিৎকার শুনলাম। আপনাদের কোন বিপদ হয়নি তো?

—ওই যে একটা লোক পালিয়ে যাচ্ছে।

—কিছু নিয়ে পালায় নি তো?

অলকা—ওই লোকটা আমার সর্বস্ব নিয়ে পালিয়েছে!

বিনতা—কি বলছিস পাগলের মত?

অলকা—ওই লোকটা আমার সব নিয়ে গেছে।

পুরুষগণ—ধর বেটাকে। চল চল। (একদল দৌড়ে গেল)

—এখনও অন্ধকার হয় নি, তবু কি সাহস!

—আমি প্রায় দেখি লোকটা এখানে ঘোরাঘুরি করে।

—কালে কালে হল কি মশাই?

—ধর ধর। বেটাকে জেলে দাও। সমাজের কলঙ্ক।

—গোটা দেশটাকে কলুষিত করছে।

—বেটা খুব পালাচ্ছে।

—আর বেশী দূর যেতে হবে না।

—এ্যাই ধরেছে। মারতে মারতে এখানে নিয়ে এস।

বিনতা—কি করছিস অলকা, বাড়ী চল।

অলকা—না আমি দেখব।

বিনতা—এবার যা বিশ্রী কাণ্ড শুরু হবে। চল। দেখেছিস ওকে কি রকম মারছে।

অলকা—ঠিক করছে, ঠিক করছে। পারলে আমিও এক চড় মারি। বদমায়েস কোথাকার।

পুরুষগণ—ভাবনা কি মা, আপনার কাছেই ও শালাকে ক্ষমা চাওযাব। ব্যাটা আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলে তবে ছাড়া পাবে।

—ওই যে ওকে ধরে এনেছে।

—এই দিকে নিয়ে এস, এই দিকে।

(বোবাকে ধরে নিয়ে এল একদল লোক। পথে আসতে প্রচুর মার খেয়েছে। তার পরিচ্ছদ ছিন্ন, চুলে ও চেহারায় পীড়নের চিহ্ন স্পষ্ট।)

—চা বেটা ক্ষমা চা, পায়ে ধরে ক্ষমা চা।

—তখন থেকে ব্যাটার মুখে আওয়াজ নাই।

—মার খাওয়া অভ্যাস আছে কি না।

—বল বেটা 'ক্ষমা করুন'। যা বল। পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলি যে ?

—যা, নয় তো মার খাবি। যা।

—বেটা একগুঁয়ে আছে তো রে !

—যা বল—

অলকা—ও কথা বলবে কি, ও যে বোবা !

বিনতা—অলকা ছিঃ !

পুরুষগণ—তুই বোবা নাকি রে ?

—তুই সত্যি করে বোবা নাকি ?

—বোবা তাই এত বজ্জাত।

—বোবারা বেজায় পাজি।

—যা পায়ে মাথা ঠেকিয়ে আয়।

—হ্যাঁ, কথা তো আর বলতে পারবি না। যা।

—যা ওঁর পায়ের ওপর মাথাটা রাখ। ওকে ক্ষমা করুন দিদি, ব্যাটা বোবা কি না তাই জানোয়ারের মত।

—কি রে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি যে, যা।

—দেখ, ব্যাটা দোষ করেছে, কিন্তু ক্ষমা চাহিবার ইচ্ছা নাই।

—পুলিশে দিয়ে দাও। ব্যাটা বোবা !

(দু'চারজন ইতিমধ্যে একটি পুলিস সার্জেণ্টকে ডেকে এনেছে—পথ দেখিয়ে তারা নিয়ে এল)

—এই দিকে, এই দিকে।

সার্জেণ্ট—কি হয়েছে, কি হয়েছে ?

পুরুষগণ—এই যে এই মহিলাটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, ওই বোবাটা এসে—। তারপর উনি চিৎকার করে ওঠেন, আমরা দৌড়ে আসি, আমাদের দেখেই বোবাটা পালায়। এখন বলছি ক্ষমা চাইতে, তা কি রকম শক্ত হয়ে দাড়িয়ে আছে দেখুন।

সার্জেণ্ট—(অলকাকে) কি হয়েছে বলুন দেখি—

বিনতা—অলকা বাড়ী চল।

অলকা—(তার ভবিষ্যত ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে, তার প্রতিদিনের জীবন

ছাড়া আর কিছু নাই। এতবড় ক্ষতি কে বুঝবে—তাই বলে ওঠে) ও আমাকে শেষ করে দিয়েছে।

সার্জেন্ট—ও। আচ্ছা আচ্ছা। আর কিছু বলতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি। কটার সময় ?

পুরুষগণ—এই তো মিনিট পনের বিশ আগে।

—ভদ্রমহিলার চিৎকার শুনে আমি ফিরে তাকাই, দেখি বোবা ব্যাটা দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

—আমি অমনি ছুটে গিয়ে ব্যাটাকে ধরে নিয়ে এলাম।

—রাস্তার মাঝে দিনের বেলায়, উঃ ব্যাটার কি সাহস !

সার্জেন্ট—আপনারা একটু সাহায্য করলে বড ভাল হয।

পুরুষগণ—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়, বলুন কি করতে হবে।

—আপনি যা বলবেন তাই করব, শুধু দেখবেন বোবাটা যেন শাস্তি পায।

—এই রকম জানোয়ারগুলো পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ালে রাস্তা চলাই তো দায় হবে মশাই !

—যা বলেছেন দাদা—একটা আস্ত জানোয়ার।

—ছি ছি ছি দিনের বেলায, রাস্তার মাঝে !

সার্জেন্ট—ওই জানোয়ারটাকে থানায নিয়ে চলুন। আমি এঁদের নাম ঠিকানা নিয়ে আসছি।

বিনতা—থানায কেন ?

সার্জেন্ট—এই সব লোক শাস্তি না পেলে বেজায় বেড়ে যাবে।

অলকা—ওর শাস্তি পাওযাই দরকার, ওর শাস্তি হোক।

পুরুষগণ—(বোবাকে) চল মক্কেল। (টানাটানি করতে লাগল।)

—চল শ্বশুরবাড়ী চল।

—ব্যাটাকে চিড়িয়াখানায় দিলেই ঠিক হয়। হতভাগা !

(বোবা যাবে না। সে বুঝতে পেরেছে তাকে শাস্তি দিতে নিয়ে যাচ্ছে। তার গলা দিয়ে অদ্ভুত জৈবিক আওয়াজ বের হতে লাগল। কিন্তু এটা প্রতিবাদের স্বর, বিদ্রোহের সুর। সে যাবে না। তার যত লাঞ্ছনা তার দেবীর সামনে হোক। সে যাবে না।)

পুরুষগণ—শালা বোবা !

—জানোয়ার !!

(অফিস-ফেরৎ এক জনস্রোত এসে তাদের সবাইকে ঢেকে দিল।)

পিরানদেল্লোর মতো

পিরানদেল্লোব মতো নাটকটি বঙ্গীয় নাট্যসংসদের পঞ্চম একাঙ্ক নাট্যোৎসবে প্রথম অভিনীত হয় ১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ (২৮শে নভেম্বর ১৯৫৯)। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীষোড়শীকুমার মজুমদাব। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন ঃ

নাট্যকার—	শ্রীসোমেন নন্দী
হেনা দেবী—	” মিনতি গুপ্ত
চাকর—	” পাঁচু মুখোপাধ্যায়

পিরানদেল্লোর মতো

একটি সুষ্ঠু বসার ঘর। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সাজাবার চেষ্টায় অতি সাধারণ দেখাচ্ছে। সকাল বেলাকার অবসাদ আসবাবপত্রে বোঝা যায়।

একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন, দাম্ভিক ও চিন্তান্বিত—হাতে মস্ত ব্যাগ। তাঁর পেছনে যিনি এলেন ফতুয়া আর পাকা গোঁফে তার পরিচয় স্পষ্ট। তিনি থিয়েটারি চাকর। মুখে তার বিরক্তি। কারু থেকে তিনি ছোট নন সেটা তার চলনে-বলনে বোঝা যায়।

চাকর—বসুন।

লোক—তুমি তাহলে হেনা দেবীকে খবর দাও।

চাকর—তিনি তো বাড়ী নাই।

লোক—ও (উঠে দাঁড়ায়) কিন্তু উনি তো এই সময় আসতে বলেছিলেন, সকাল এগারোটা। বরঞ্চ আমি দশমিনিট আগে এসে গেছি। কোথাও বেরিয়েছেন বুঝি ?

চাকর—হবে।

লোক—হবে কি ! হয় তিনি বাড়ী আছেন কিম্বা নাই।

চাকর—তা হতে পারে।

লোক—কি বাড়ী আছেন ?

চাকর—তিনি তো বাড়ী নাই !

লোক—কি বিপদ। এই বললে আছেন।

চাকর—(সচকিত) কখন বললাম ? (হাই তুলে লোকটির পাশে বসে)।

লোক—বাপু হে আমার একটু উপকার করবে ?

চাকর—কি বিক্রী করতে এসেছেন ?

লোক—কিছু বিক্রী করতে তো আসি নাই।

চাকর—তা হলে অতবড় ব্যাগে কি আছে ?

লোক—লেখা।

চাকর—লেখা ? লেখা সে আবার কি ?

লোক—লেখা। মানে আমার লেখা, আমি লিখি কি না। মানে আমি লিখি—কাগজের ওপর কলম দিয়ে। এই যে কলম।

চাকর—লেখেন ?

লোক—হ্যাঁ। আমি যে নাট্যকার—অর্থাৎ নাটক লিখি। যদিও এখনও ছাপা বা অভিনয় হয় নাই। তাই ভাবছিলাম নিজেকে নাট্যকাব বললে ব্যাকরণে বাধবে কি না।

চাকর—সেটা আবার কি ?

লোক—নাটক জান না ? কি মুস্কিল ! ওই যে অভিনয় হয় ; থিয়েটার হয়। তোমার দিদিমণি, মানে হেনা দেবী অভিনয় করেন।

চাকর—দিদিমণি তো প্লে করে।

নাট্যকার—মানে তোমার দিদিমণি যা বলেন, তা আমরা, মানে আমি নই, বড় বড় নাট্যকাররা সেটা লেখেন। তোমার দিদিমণি সেটা শিখে নিয়ে স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে বলেন।

চাকর—কি, দিদিমণি শেখানো কথা বলে ! যাও, তিনি বাড়ী নাই।

নাট্যকার—না না সেকথা নয়। বাপু তুমি একটু গিয়ে বল যে শ্রীকণ্ঠবাবু এসেছেন।

চাকর—ব্যাগে কি আছে ?

নাট্যকার—কি বিপদ ! বললাম তো নাটক আছে। এ বাড়ীতে কোন নাট্যকার কি কখনও আসেন না নাকি ?

চাকর—না।

নাট্যকার—কেন সঙ্কর্ষণবাবু, ষড়াননবাবু, ব্রহ্মাবাবু এঁরা আসেন না?

চাকর—ওঁরা আসবেন না কেন। কিন্তু আপনার মত—কি যেন বললেন, নাট্যকার কেউ আসে না।

নাট্যকার—এঁরাও তো নাটক লেখেন। এঁদের খুব নামডাক। বাড়ী করলেন নাটক লিখে। কেন ওই যে 'কলুব বলদ' বিদিশা থিয়েটারে ৫০০ রাত চলল—সিনেমা হল—হেনা দেবী অভিনয় করলেন তুই জায়গায়—ওটা তো ব্রহ্মাবাবুর লেখা।

চাকর—তা হবে, কিন্তু ওরা তোমার মত নাট্যকার নয়।

নাট্যকার—সেটা ঠিক বলেছ। আমি ওঁদের মত নই।

চাকর—ঠিক বলেছি না? তবে?

নাট্যকার—তোমার ভাই খুব বুদ্ধি!

চাকর—দিদিমণিও তাই বলে। আগে বুঝে নিবি, যে দেখা করতে এসেছে তার মতলব কি?

নাট্যকার—আমাকে তোমার দিদিমণিই আসতে বলেছিলেন।

চাকর—অমন ও অনেক লোককে বলে। শেষে তাদের তাড়াতে আমার প্রাণ যায়।

নাট্যকার—ভাই দেখা করিয়ে তোমায় দিতেই হবে।

চাকর—তু'টো টাকা আছে? দাও দেখি!

নাট্যকার—(টাকা দিল) বাড়ী আছেন? কেমন?

চাকর—বাড়ী থাকবে না তো যাবে কোথায়? এগারোটা পর্যন্ত তো ঘুমই ভাঙ্গে না।

নাট্যকার—আমি ভাই ওঁর দোষ দিই না। অতবড একজন শিল্পী অথচ কি রকম খাটতে হয়। তিনদিন সপ্তাহে থিয়েটার। তারপর সারারাত সিনেমার স্যুটিং—

চাকর—তারপর আজ এ বাবুর সঙ্গে হাওয়া খাওয়া, কাল ও বাবুর সঙ্গে হাওয়া খাওয়া।

নাট্যকার—না না যাঃ। তুমি ঠাট্টা করছ। আমি ওঁকে বড শ্রদ্ধা করি। কত বড় artist.

চাকর—তোমাকে সত্যি আসতে বলেছে, বলছ ?

নাট্যকার—সত্যি বলছি!

চাকর—তিন সত্যি কর।

নাট্যকার—সত্যি, সত্যি, সত্যি। (চাকর যেতে গিয়ে আবার ফিরে আসে।)

চাকর—তোমার অতবড ব্যাগে লেখা ছাডা আর কিছু নাই বলছ ?

নাট্যকার—না।

চাকর—দেখি। (নাট্যকার ব্যাগ খুলে মস্ত একতাডা কাগজ বের করে)
—ও বাবা তুমি দেখি মস্ত বড মিথ্যেবাদী।

নাট্যকার—কেন ? এই তো আমার লেখা। আমার নাটক।

চাকর—তুমি মিথ্যে মিথ্যে অত কথা লিখেছ ? আমার দেখেই তাই মনে হয়েছিল তুমি রামুর শালা।

নাট্যকার—রামু কে ?

চাকর—ও বাবা তাও জান না—রামু হোল রামচাঁদ। আমাদের গোয়ালা। রোজ দুধে জল দেবে আর জিজ্ঞাসা করলে বলবে—দিইনি তো! ভয়ানক মিথ্যে কথা বলে।

নাট্যকার—আমি কিন্তু সেরকম নই।

চাকর—নও মানে ? এই তো কতো মিথ্যে কথা লিখেছ! এ সব কি সত্যি ? তুমিই বল না।

নাট্যকার—দেখ আমরা হলাম realistic নাট্যকার। ও realistic মানে বুঝলে না। অর্থাৎ যা কিছু সত্যি, যা কিছু অবজ্ঞাত আমি আমার নাটকে তাদের কথা লিখি।

চাকর—যেমন ?

নাট্যকার—যেমন ধর না, এই নাটকে আমি দুঃস্থ নাট্যকারদের কথা লিখেছি। যাদের কথা কেউ ভাবেনা—যারা মাটির সঙ্গে মিশে থাকে, অথচ—যারা জানে সামান্যতম সুযোগ পেলে তারাই হবে মহীর থেকে মহীয়ান!

চাকর—ওই দুঃখেই তো সিনেমা থিয়েটার দেখা ছেড়ে দিয়েছি। মিথ্যে কথার ছড়াছড়ি আর যত সব অদ্ভুত অসম্ভব কাণ্ড।

নাট্যকার—অসম্ভব কাণ্ড?

চাকর—অসম্ভব নয়? ধর কেউ কাউকে টেলিফোন করছে। তোমার নাটকে টেলিফোন করা আছে ?

নাট্যকার—হ্যাঁ আছে, মানে নায়িকার সঙ্গে নায়কের ভুল বোঝাবুঝি হবে আর কি তখন—

চাকর—কে কাকে টেলিফোন করছে ?

নাট্যকার—প্রথমবার নায়ক করছে নায়িকাকে। এই রকম—

(টেলিফোনের কাছে গিয়ে টেলিফোন তুলে বলে—)

—কাল এগারোটায়, নিশ্চয় যাব। ওই ডাকে সাড়া দেবার জন্যে আমার মন আকুল হয়ে উঠেছে। আমি—

চাকর—দাঁড়াও দাঁড়াও। লাইন এন্‌গেজ্‌ড্‌ হোল না কেন ?

নাট্যকার—Line engaged ?

চাকর—হ্যাঁ, ভুল নম্বরও তো হতে পারত কিম্বা ফোন খারাপ। কক্ষন হয় না। এত সিনেমা থিয়েটার দেখলাম, পুট্‌ করে ফোন তুলে এক-ঝুড়ি কথা বলছে—যেন সত্যি ওই রকম হয়।

নাট্যকার—যা বোঝনা তা নিয়ে কথা বলতে আস কেন ?

চাকর—আমি কেন যাব? তুমিই তো 'সত্যি সত্যি' করে মাথা ধরিয়ে দিলে।

নাট্যকার—(রাগটা সামলে নেয়) আচ্ছা আর বলব না। এবার একটু হেনা দেবীকে খবর দেবে?

চাকর—না।

নাট্যকার—তার মানে?

চাকর—তুমি কি বেচতে এসেছ না বোঝা পর্যন্ত আমি দিদিমণিকে খবর দিতে পারব না। তোমার মত নাট্যকার নই যে সাজিয়ে গুছিয়ে গাদা গাদা মিছে কথা বলব।

নাট্যকার—আচ্ছা আচ্ছা আমি বেচতেই এসেছি।

চাকর—আমি আগেই জানতাম। কি?

নাট্যকার—এ নাটকটা। মানে উনি শুনে কোন পরিচালককে বলে দিলে সে সিনেমা টিনেমা করবে—কিংবা থিয়েটার করবে।

চাকর—ওইটা থিয়েটার হবে। ও বাবা! আর দু'টো টাকা দাও দেখি।

নাট্যকার—কি?

চাকর—দু'টো টাকা দাও। হ্যাঁ। থিয়েটার হলে তো আর তোমার টিকি দেখা যাবে না। তাই এখনই নিয়ে নি।

নাট্যকার—(খুসী) থিয়েটার হবে এ নাটক। অ্যাঁ, তুমি বলছ?

চাকর—দিদিমণি বলে দিলে হবে। (নাট্যকার টাকা দিল)

নাট্যকার—আমাকেও সবাই তাই বলে দিল। তোমার দিদিমণিকে কোনরকমে রাজী করাতে পারলেই ব্যস—আর আমায় পায় কে!

চাকর—নাটকে কি আছে?

নাট্যকার—কি আছে মানে?

চাকর—মানে ভোজ আছে? খাওয়া-দাওয়া আছে?

নাট্যকার—খালি চা খাওয়া আছে।

চাকর—দ্যাৎ্। আর কি আছে ?

(নাট্যকার খুব রঙীন করে উত্তর দিতে যায়—)

—বুঝেছি প্রেম আছে। আচ্ছা নতুন ধরনের কিছু লিখতে পার না। খালি প্রেম প্রেম, প্যাম-প্যাম, প্যান্-প্যান্ ··। উঃ ঘেন্না ধরে গেল। আগুন লাগিয়ে দাও বুঝেছ। তোমার ঐ কাগজের পাহাড়কে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দাও।

নাট্যকার—না না তুমি ভুল করছ, আমরা ঐ রকম প্যান-প্যানানি প্রেমের নাটক লিখিনা। আমরা হলাম Neo-theorist. আমরা যখন নাটকের মধ্যে প্রেমকে আনি, তখন সেটা একটা বিপ্লবের রূপে আসে। প্রেম খালি একটা passionate exposition করতে সাহায্য করে। কেবল—

চাকর—হয়েছে হয়েছে। অপরাধ হয়েছে। আর বলব না।

নাট্যকার—শুনবে গল্পটা শুনবে ? তাহলেই বুঝতে পারবে এটা একটা সাধারণ চল্‌তি হাল্কা প্রেমের গল্প নয়।

(অপেক্ষা না করে বলে যেতে লাগল)

নাট্যকার—···পট উঠলে দেখা গেল বাড়ীর পুরোনো বুড়ো চাকর নায়ককে বসার ঘরে নিয়ে এসে বসাল। বুড়ো চাকরটা খুব বকতে পারে······(খেয়াল হয় বলা উচিত হয় নাই) মানে খুব নয়, কখন সখন একটু কথা বলতে ভালোবাসে। মানে বেশ ইয়ে social, বুঝলেনা ? নায়ককে চেয়ারে বসায়, নিজেও বসে—

চাকর—নায়কটা কে ? আর কার কাছে এসেছে ?

নাট্যকার—দেখেছ, আসল কথাই বলা হয়নি। আমার নায়ক হচ্ছে একজন দুঃস্থ নাট্যকার, একজন neo-theorist. এসেছে নায়িকার বাড়ী। নায়িকা একজন মস্ত অভিনেত্রী, খুব নাম-ডাক-যশ-প্রভাব-প্রতিপত্তি—

চাকর—দিদিমণির মত ?

নাট্যকার—হ্যাঁ ঠিক বলেছ, ঠিক তোমার দিদিমণির মত। (চাকর চোখ পাকিয়ে মারমুখী হয়।) তবে কিনা জান ওঁর থেকে একটু কম। মানে ওঁর থেকে অনেক একটু কম।...(প্রসঙ্গ পালটাতে চায়)

—আমি কি চাই জান, আমি চাই অভিনয়ে একটা নতুন ধারার চলন করতে। যেমন ধর, বড বড বক্তৃতা আজকাল উঠে গেছে। আমি সেটাকে খুব চালু করেছি।

চাকর—তা হলে আরো একটা জিনিষ চালু কব না কেন ?

নাট্যকার—কি ?

চাকর—সিটি দেওয়া।

নাট্যকার—সিটি দেওযা ?

চাকর—হ্যাঁ গো। তোমরা বল শিষ দেওযা। কারু যেই স্টেজে আসবাব সময় হবে অমনি কসে সিটি দেবে এই রকম।

(পেছনে গিয়ে দাঁডাল তারপব মুখের মধ্যে আঙ্গুল দিযে জোর সিটি দিল।

সেই সিটির শব্দেই যেন, হেনা দেবী একটা অপূর্ব শাড়ী পরে প্রায় এক দৌডে বেরিয়ে এলেন। আঁচল লুটোচ্ছে। নাট্যকার তাড়তাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন, হেনা দেবী ততক্ষণে এসে ওর দুহাত ধরলেন।)

(হেনা দেবী প্রবেশের সাথে সাথে সব আলো লাল রংএর এবং পরিবেশ স্বপ্নময় হবে।)

হেনা—আমার দেরী হয়ে গেল ভাই। কি মনে কিছু করেন নাই তো ? যদি ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যেত কিংবা গাড়ী খারাপ হয়ে যেত তা'

হলেও আমার লজ্জা ঢাকার উপায় থাকত। এ যেন রবি ঠাকুরের গানের মতো হল, "যামিনী না যেতে জাগালে না কেন বেলা হল মরি লাজে!" তাই বলে ভাববেন না যেন এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম। লজ্জার মাথা খেয়ে না বল্লেও তো দোষ কমবে না। হাজার হোক আমরা মেয়ে ছেলে তো, সাজতে বসলে দু'ঘণ্টাতেও হয় না। দেখুন আপনাকে বসিয়ে রেখে দিয়েছি—কতক্ষণ, আধঘণ্টা না একঘণ্টা। অথচ কার জন্যে সজ্জা, সবই তো আপনার জন্যে! দেখছেন, বসে বসে গল্প করছি, আপনাকে চা দেব তাও খেয়াল নেই! সত্যি, আপনি আমার সম্বন্ধে না জানি সাংঘাতিক কত কি ভাবছেন। আপনাকে ডেকে এনে কেবল কষ্টই দিচ্ছি সকাল থেকে।

(কথা বলতে বলতে একপাশে চলে যান। একহাতে চায়ের কাপ আর অন্যহাতে মিষ্টির থালা নিয়ে ফেরেন)

—এতক্ষণে তবু একটু প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ পেয়েছি। একটাও ফেলে রাখলে কিন্তু দারুণ রাগ করব। শরৎচন্দ্র বলে গেছেন, "হৃদয়ের দরজার সোজা রাস্তা পেটের মধ্যে দিয়ে।" যদিও জানি আপনার হৃদয়রাজ্যে দেবী বীণাপাণির একচ্ছত্র সাম্রাজ্য তবু একটু আধটু জায়গা পেতে কার না ইচ্ছে হয়। আপনি একে জ্ঞানী তায় নাট্যকার। আপনার জায়গা সবার ওপরে। আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন এই সৌভাগ্যই আমার আমৃত্যু মনে থাকবে। আপনি দু'দিন পরে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হবেন—দেশে-বিদেশে আপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে, তখন আজকের দিনের কথা মনে থাকবে কি?

(টেলিফোন বেজে উঠল)

—হ্যালো! কে, প্রিন্স সুদর্শন? না ভাই আজ আর আপনার সঙ্গে যেতে পারব না। আজ আমার এখানে একজন মস্ত লোক এসেছেন। নাম? একদিন জান্‌তে পারবেন বৈকি! কাল? এখন বলতে পারছিনা। না। উনি যদি একঘণ্টা আমার কাছে থাকেন তা' হলেই ধন্য হয়ে যাব। পরশু? টেলিফোন করবেন, তখন বলব। আচ্ছা ভাই, ছেড়ে দি।

(ফোন রেখে দিল)

কই আপনার নাটক এনেছেন? পড়ুন। কি নাম দিয়েছেন?

নাট্যকার—সত্যের সত্য।

হেনা—কি বললেন? 'সতীর সত্য'—সেই তুগ্গার গল্প নাকি?

নাট্যকার—না সত্যের সত্য। অর্থাৎ সত্যের থেকেও যা সত্য।

হেনা—সে আবার কি, নামটা তো খুব ভালো হয় নাই।

নাট্যকার—মানে সত্যি ঘটনার সঙ্গে নাটককে খিচুড়ি করা হয়েছে কিনা। তাই ওই রকম নাম দিয়েছি।

হেনা—না না নামটা পাল্টান। নামের জন্যে নাটকটা মার খাবে।

নাট্যকার—তাই তো কি নাম দেওয়া যায়? (চিন্তান্বিত)

হেনা—জীবনে-নাটকে মেলা মেশা করে তো পিরানদেল্লো লিখেছেন?

নাট্যকার—আপনি পিরানদেল্লো পড়েছেন? (গদগদ)

হেনা—অশিক্ষিত পুঁটিদের দিন চলে গেছে। আমরা হলাম এ যুগের Aspasia. বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন না, 'মেয়েরা জানে না তো কি পুরুষরা জানে?'

নাট্যকার—(মুগ্ধ) বলুন কি নাম দেব?

হেনা—আমি বলি কি এমন নাম দিন যাতে সব সন্দেহ মিটে যায়। তা না হলে বেচারা সমালোচকদের আবার পিরানদেল্লোর লেখার

বিবরণ খুঁজতে যেতে হবে। অহেতুক ভদ্রলোকদের পরিশ্রম করান ভালো হবে না।

নাট্যকার—আপনি যে নাম বলবেন তাই আমি দেব। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এমন একজন বাক্‌দেবীর কাছে এসেছি। বলুন। (কলম খুলে বাগিযে ধরে)

হেনা—আমি বলি, আপনি নাম দেন 'পিরানদেল্লোর মতো'।

নাট্যকার—যদি বলি 'নাটক লেখার নাটক'।

হেনা—লোকে ভাববে, ব্যাপারটা কি ? ভাববে রীতিমত নাটকের শেষাংশ।

নাট্যক।র—ন ।ামটা লোকে বুঝতে পারবে না বলছেন ?

হেনা—মোটেই না। নাটকের নাম এমন হতে হবে যা বোঝা যাবে—অথচ সবটা নয। অনেকটা Beethoven এর বাজনার মত। বোঝা যাচ্ছে অথচ যাচ্ছে না। যেন মেঘে ঢাকা চাঁদ। এই দেখা যাচ্ছে, এই ঢেকে গেল। বুদ্ধদেব বাবু বলেছেন না, 'চেহারাটা কিছু নয, চেহারা যেটাকে প্রকাশ করছে সেই চরিত্রটাই আসল। সেটাই রূপ'।

নাট্যকার—তাহলে বলছেন নাম দেব 'পিবা'নদেল্লোর ম৻ো' ? কিন্তু জানেন ঠিক পিরানদেল্লোর মত হয় নাই। অ৻েক এদিক সেদিক আছে।

হেনা—তা'তে ক্ষতি নাই।

নাট্যকার—আচ্ছা তা' হলে নামটা ওই থাকল। (নামটা লিখল)

হেনা—বাঃ লক্ষ্মীছেলে। আপনার নাটকের আমি নাম দিলাম। ওঃ আমার এত গর্ব হচ্ছে। এবার পড়ুন শুনি।

(আরাম করে বসলেন)

নাট্যকার—(খাতা খুলে পড়তে শুরু করে : 'প্রথম দৃশ্য। একটি পুষ্ট বসার ঘর।' পুষ্ট মানে, টেবিল চেয়ারগুলো বেশ গদি আঁটা।

'অত্যন্ত সাজাবার চেষ্টায় অতি সাধারণ দেখাচ্ছে।' (হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে হয়ে খাতা থেকে মুখ তুলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল এই ঘরেরই বর্ণনা দিচ্ছে।) হুঁ, 'তার পর একজন ভদ্রলোক এলেন, তার পেছনে আর একজন এল।'—মানে বাড়ীর চাকর নায়ককে বসার ঘরে বসাল। ওদের দু'জনের একটু কথা বার্তা হল। এটা মানে দিয়েছি যারা একটু দেরী করে আসবে তারা যাতে আসল গল্পে ফাঁকি না পড়ে সেই জন্যে। অথচ যারা সময়ে আসবে তাদের আনন্দ লাভ হবে।······এইবার আসল জায়গাটা পড়ি। 'এমন সময় নায়িকা বাইরে এলেন।'

হেনা—নায়িকা মানে আমি ?

নাট্যকার—হ্যাঁ, আপনি। আপনার জন্যে বিশেষ করে ও পার্টটা লেখা।

হেনা—বিশেষ করে ? সত্যি ? পড়ুন।

নাট্যকার—'নায়িকা যেন এক দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। আঁচল লুটোচ্ছে। একটা জামদানী রংএর হালকা বেনারসী। পূর্ণিমা রংএর জামার ওপর দুলছে মুক্তোর মালা, কানে মুক্তোর ঝুমকো। পায়ের চটিটা পর্যন্ত মিল করে পরা। অপূর্ব সুন্দরী, কিন্তু নিজেতে সম্পূর্ণ সমাহিত, নিজের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল। ঠোঁটে মৃদু হাসি, চোখে চপলতা। সব মিলে একটা অপূর্ব ছলনা যেন—(হঠাৎ চুপ করে যায়। অনুভব করে সে এতক্ষণ হেনাকে বর্ণনা করছিল। হেনা হাসে)—যাক্‌গে। তার পর 'নায়িকা এসে নায়কের দু'হাত ধরে বল্‌লেন—'

হেনা—···আমার দেরী হয়ে গেল ভাই। কিছু মনে করেন নি তো ?

নাট্যকার—হ্যাঁ।

হেনা—হ্যাঁ মানে ?

নাট্যকাব—আমাব নাটকেও তাই লেখা আছে।

হেনা—তাবপব ?

নাট্যকাব—(পড়ে) ..'যদি ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যেত কিংবা গাড়ী খাবাপ হয়ে যেত—'

হেনা— ..'তা' হলেও আমাব লজ্জা ঢাকাব উপায় থাকত।'

নাট্যকাব—তাব মানে ?

হেনা—বল তাব মানে ?

নাট্যকাব—তুমি সব জান। তুমি আমায় ভালোবাস।

হেনা—আমি আমায় ভালোবাসি ?

নাট্যকাব—কেন এমন হয়, বল হেনা, কেন এমন হয় ? আমি একজন কপদকহীন Neo-theorist নাট্যকাব—আব তুমি—।

হেনা—এমনই তো হয়, তা না হলে নাটক জমবে কেন ?

নাট্যকাব—তাব মানে তুমি আমায় সত্যি ভালোবাস না, কেবল নাটকেব জন্যে ভালোবাস ?

হেনা—আমি যে অভিনেত্রী, আমাব কাছে নাটক জীবন এক হয়ে গেছে।

নাট্যকাব—না না জট ছাড়াতে হবে, নইলে এই ত্রিশঙ্কুব অবস্থায় আমি বাঁচব কি কবে ? বল বল তুমি আমায় সত্যি ভালোবাস ?

হেনা—ভালোবাসি।

নাট্যকাব—(তাড়াতাড়ি খাতা দেখে) উঃ খাতাতেও যে তাই লেখা আছে। —নিজেব কথা কিছু বলনা। (খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয)।

হেনা—সবই তো আমাব নিজেব কথা। শেখান কথা আমাব আসেনা বুঝলে। তুমি ছাড়া এমন অপমান বোধহয় কেউ আমাকে কবতে পাবত না। পবিচালকবাও না।

নাট্যকাব—দেখ কিছু মনে কোবনা। আমি এমন একটা ভুলেব মধ্যে পড়ে গিয়েছি যে নিজেব ওপব বিশ্বাস হাবিয়েছি।

হেনা—আমি কিন্তু তোমাব ওপব বিশ্বাস হাবাইনি।

নাট্যকাব—বেশ তা' হলে এখন থেকে আমাব ইচ্ছে মতো কাজ কব।

হেনা—তাই তো কবছি।

নাট্যকাব—বেশ তাহলে এখন থেকে প্রিন্স সুদর্শনেব সঙ্গে আব মিশনা।

হেনা—তা কি কবে হবে ? সেও যে থিয়েটাবেব লোক, নাটকেব অংশ।

নাট্যকাব—হেনা, আমি তোমাব জন্যে আমাব জীবনেব সব কিছু দিতে পাবি। সে কি পাবে ?

হেনা—টাকা।

নাট্যকাব—তুচ্ছ টাকাব জন্যে তুমি জীবনটাকে বেচে দিচ্ছ হেনা। তুমি তাব হাতে খেলাব পুতুল সাজছ।

হেনা—পুতুলকেও তো সাজাতে হয়।

নাট্যকাব—তুমি কি হেনা, তুমি কি ?

হেনা—তুমি তো ভালোই জান, আমি অভিনেত্রী।

নাট্যকাব—অভিনেত্রী। সহবেব অন্যতমা অভিনেত্রী। বেশ তোমাব সঙ্গে অভিনযই কবব। অন্ততঃ আজকেব দু'টো ঘণ্টা তুমি আমাকে দাও।

হেনা—বল কি কবতে হবে।

নাট্যকাব—এই বাজসিক সাজ ছেড়ে এস। তাব পব তোমাব সেই লাল পাড গবদটা পবে এস—সেই যে যেটা পবে 'বিবাজ বৌ' হয়েছিলে। তাব পব চল দু'জনে বেবিয়ে পডি পাযে হেঁটে—কোন অখ্যাত বেস্তোঁবাতে তোমাকে নিয়ে যাই। তোমায খাওযাব আমাব যা সম্বল আছে তাই দিযে। তাবপব দুদিন যদি খাওযা না জোটে আজকেব দিনেব স্মৃতি আমাব মন ভবিয়ে বাখবে। আব কথা নয—যাও লক্ষ্মীটি।

হেনা—তাতেই যদি তুমি খুসী হও তাই করব। আমার কিন্তু কাপড় ছাড়্তে দেরী হবে। হাঁক ডাক লাগিয়ে দিও না।

(একপাক ঘুরে সুন্দরভাবে নাচের ছন্দে চলে গেল।)

নাট্যকার—উঃ। যদি আমার টাকা থাকত!

(হেনা দেবীর আসার পূর্বমুহূর্তে ঠিক যেমনভাবে বসেছিল—সেইভাবে বসে। আলো ও পরিবেশ সাধারণ হয়। যেন হেনা দেবীর আসাটা সত্যি স্বপ্ন।)

(চাকর এগিয়ে এল।)

চাকর—বড্ড বঙচঙে ছবি। একেবারে বাজে আর মিথ্যে। দশ বছরের ছেলেকেও ভোলাতে পারবেন।

নাট্যকার—তার মানে?

চাকর—মানে অসম্ভব, আজগুবি আর আবোল-তাবোল।

নাট্যকার—সবটাই তো সত্যের মত।

চাকর—তোমার তাই মনে হবে, তুমি যে ওটা লিখেছ।

নাট্যকার—তা' হলে সত্যিটা কি?

চাকর—প্রথম, দিদিমণি অমন ধড়ফড় করে একগাদা কথা বলতে পারে না। হ্যাঁ, সিনেমায়, থিয়েটারে প্লে করার সময় বলে—কিন্তু এমনিতে মুখে কথাই আসে না। আর যেদিন মদে চুর হয়ে বাড়ী ফেরে, সেদিন খালি খালি গান গায়।

নাট্যকার—কি মুস্কিল। তোমাকে এখন নাটকের theory বোঝাতে বসলে দু'দিন কেটে যাবে। সহজ করে বলি। নাটক তো জীবন নয়, জীবনের photographও নয়। নাটক হল জীবনের থেকেও বড়। জীবনকে সেখানে magnify করে, মানে একশ' গুণ বড় করে দেখাতে হয়। পার্থিব সত্যকে—তুমি দৈনন্দিন জীবনে

সীমাবদ্ধ রাখতে চাও—বোঝনা সত্যটা জীবনের থেকে কত বড়।

চাকর—বাড়িয়ে বাড়িয়ে মিথ্যেবলা আর যা-তা বলা একই কথা।

নাট্যকার—দেখ বাপু, বাড়িয়ে কে বলছে তার ওপর বাড়িয়ে-বলা কথা বিশ্বাস করা না করা নির্ভর করে। ধর যদি কোন রাজনৈতিক বাড়িয়ে বলে, সেটা বিশ্বাস করা চলবেনা। কারণ বাড়িয়ে বলা তাদের নেশা। কিন্তু নাট্যকার একটু বাড়িয়ে বললে বিশ্বাস করতে হবে—কারণ সেটা তাদের পেশা।

চাকর—পেশাদার মিথ্যেবাদী! তোমার অন্ততঃ দশটা ভুল আমি এখনই দেখিয়ে দিতে পারি। ওই শাড়ীটা দিদিমণি কেন পরে আসবে? বিশেষ এই এগারটার সময়? আর ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে অত সাজবারই বা সময় পাবে কখন? তার পর এসেই তোমার হাত ধরবে কেন?

নাট্যকার—দেখ, হয় তো নাটকটা কারু কারু বুদ্ধির পক্ষে দুর্বোধ্য হয়েছে কিন্তু—

চাকর—বেশ ধরে নিলাম হাত ধরাটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে—তার পর দুপুর বেলায় বাড়ীর বাইরে যেতে রাজী হওয়াটা? তাও আবার কি সাদা গরদ পরে। স্পষ্ট কথা বলি মশাই—দিদিমণি সাদা রং পছন্দ করে না। ওই 'বিরাজ-বৌ' এর কাপড়খানা Studio থেকে দিয়েছিল।

নাট্যকার—তুমি কিছুই বোঝনি। দু'ঘণ্টা ধরে সাজছে একথা তার মুখ দিয়ে বলিয়ে আমি তার চরিত্র প্রকাশ করেছি। সে যে নিজেকে পছন্দ করে, নিজেকে সাজাতে ভালোবাসে, সুন্দর দেখতে ভালোবাসে—ওই এক লাইনেই তা' বোঝান হয়ে গেল। তার পর সে এসে নায়কের হাত ধরল। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ

গেল তার সাহসিকতা, তার মনের মাদকতা, তার মাধুরী, তার লোকাপবাদকে তুচ্ছ করে দেবার ক্ষমতা। কাজেই বুঝতে পারছ যা' ঘটেছে তার কিছুই মিথ্যে নয়।

চাকর—বেশ দিদিমণির কথা না হয় বাদ দিলাম। চাকরটাকে ধর। হতে পারে থিয়েটারি চাকর। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাকে বক বক করে যেতে হবে? পাঁচ-মিনিট পর থেকেই অজানা ভদ্রলোককে 'তুমি-তুমি' বলে ডাকতে হবে? সম্পূর্ণ মিথ্যে। চাকর কি বলে? বড় জোর 'আজ্ঞে হ্যাঁ' বা 'আজ্ঞে না' কিংবা 'আচ্ছা' বা 'করছি'—এক কথার জবাব।

নাট্যকার—কি মুস্কিল। এখানে যে আমি চাকরকে দিয়ে বাড়ীর অবস্থাটা সকলকে জানাচ্ছি। 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে সেটা করা যায় নাকি?

চাকর—কি অবস্থাটা জানালে?—দিদিমণির বাড়ীর চাকর ভয়ে জড় সড়। যতই পুরোনো হোক না কেন মুখে তার কথা নাই আর এই রকম করে তার চেয়ারে বসে আছি দেখা দূরে থাক—শুনলে দিদিমণি চড়িয়ে লম্বা করে দেবে না! দিদিমণির মুখে কথা না বেরোলে কি হবে—হাত চলে খুব। আমি ছাড়া আর কেউ পনের দিনের বেশী টিকতে পারে না এক সঙ্গে।

(চেয়ার ঝাড়তে থাকে।)

নাট্যকার—থিয়েটারে স্টেজে ঢোকাটা মস্ত বড় আর্ট। ভালো একটা entrance যদি না দেওয়া যায় অভিনয়ের অর্দ্ধেক মাটি। আর নাটক মাটি হলে অন্যের কি—নাট্যকারের দুর্নাম। তাই তো সব সময় আমাদের একটা ভালো 'প্রবেশ' দিতে হয়। অভিনয় যারা করবে তারা তো আর আমার নাটক নিয়ে ভাবতে বসবে না।

চাকর—আর তোমার সত্য?

নাট্যকার—একটা ব্যবহারিক সত্য তো থাকবেই।

চাকর—কি করে থাকবে ? ধর আমার দিদিমণি, সে অমনি করে প্রায় অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ করে না। যদি মেজাজ খুব ভালো থাকে, বলবে,—"দেরী হয়ে গেল, ঘড়িটা slow ছিল।" তুমি তার উত্তরে উঠে বলবে, "না না আপনার দেরী হয় নাই, আমিই আগে এসে গেছি।"

নাট্যকার—ওরে বাবা তোমাকে কেমন করে বোঝাব যে তোমার দিদিমণিকে আমি যেমন ভেবেছি তেমনি এঁকেছি।

চাকর—ও ভেবেছ। তবে এতক্ষণ 'সত্যি সত্যি' বলে চেঁচাচ্ছিলে কেন ? দিদিমণি চা নিয়ে আসবে নিজের হাতে, তাও আবার মিষ্টি শুদ্ধ ! আমার তো এত বয়েস হয়ে গেল—এখন পর্যন্ত দেখিনি।

নাট্যকার—উঃ ! তোমার কাছে আমি হার মানছি। তোমাকে বোঝাতে আমি পারব না। (নবোদ্যমে) শোন, সঙ্কল্প বোঝ, ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা ? বা যা ঘটতে পারত, কিংবা ঘটা উচিৎ ছিল, এটা হল সেই সত্য। বুঝলে ?

চাকর—বুঝলাম। এটা হল মিছে কথার সত্যি যার মানে সবটাই মিথ্যে। তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল তুমি এই রকম লোক হবে। খালি মিথ্যের মধ্যে গড়াগড়ি দাও—সত্যিকে মানতে ভয় পাও। তাই খেলাঘর বানিয়ে তার রাজা সেজে খুব আনন্দ পাচ্ছ।

নাট্যকার—তা তো তুমি বলবেই। আমি আমার সত্যের জন্য সারা জীবন লাঞ্ছনা, দুঃখ মেনে নিলাম। কারু কাছে মাথা নোয়ালাম না, আর তুমি আমাকে বলছ 'খেলাঘরের রাজা'। তোমাকে আমি ভাই মনে করে, বন্ধু মনে করে—মনের সব কথা অকপটে বলেছি।

চাকব—বিশ্বাস হচ্ছে না? প্রমাণ করে দেব? (চটিব আওযাজ হয।)

—ও বাবা দিদিমণি আসছেন। (তাডাতাডি পেছনে চলে যায)

(হেনা দেবী ঢুকলেন। পবণে একটা লাট হয়ে যাওয়া সাধাবণ বঙিন শাডী। হয তো ওটা পবেই বিছানায গডাগডি দিয়েছেন। চুল উসকো খুস্কো, স্নানাদি হয নাই। বাতে মুখেব ব° তুলে শুয়েছিলেন, সেই অবস্থাই বয়েছে। ব°এব অভাবে বয়েসটা বেশী লাগছে। একটা পুবানো চটি পবে পা টান্তে টানতে এলেন। গত বাতেব মাদকতা নাই—কিন্তু তাব স্থায়ী depression মনট ছেয়ে আছে।

হেনা দেবী এসে সোজা টেলিফোনেব কাছে গেলেন। কেউ যে ঘবে আছে লক্ষ্যই কবলেন না। ডাযাল কবলেন। engaged হল আবাব ঘোবালেন—আবাব। টেলিফোনটা ঠম্ কবে বেখে দিলেন। আবাব তুললেন, তখনও engaged এবাব টেলিফোন আফিসে ডাযাল কবলেন।)

হেনা—দেখুন আমি কিছুতেই ৮৫-৩৩৭২ পাচ্ছি না। Line out of order। সত্য, আপনাবা— (টেলিফোন বেখে দিলেন)

—আচ্ছা মুস্কিল হল, প্রিন্স সুদর্শন ভাববে আমি ইচ্ছা কবে ফোন কবি নাই।

নাট্যকাব—নমস্কাব।

হেনা—(চাকবেব দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায) আপনি?

নাট্যকাব—পবশু নন্দন Studioতে আপনি বললেন, আজ দেখা কবতে আপনাব সঙ্গে। আমি হলাম সেই যে—সেই নাট্যকাব ভদ্রলোক। আপনি বললেন আমাব নাটক শুনবেন—সময দিলেন আজ এগাবটা।

হেনা—বলেছিলাম বুঝি?

নাট্যকার—সেই যে সঙ্কর্ষণ বাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রিন্স সুদর্শন আমাকে lucky dog বলে ঠাট্টা করলেন।

হেনা—(চাকরকে) তুমি তৈরী হও। প্রিন্স সুদর্শনের কাছে একটা চিঠি নিয়ে যেতে হবে।

চাকর—আচ্ছা।

হেনা—(নাট্যকারকে) দেখা হল, বেশ আনন্দ পেলাম। নমস্কার।

নাট্যকার—নমস্কার ? মানে আমার নাটকটা শুনবেন না ?

(হেনা হাই তুলে আড়িমুড়ি ভাঙে।)

—যদি অনুমতি করেন নাটকটা রেখেও যেতে পারি।

হেনা—ওরে বাবা, সময় কোথায় ? আসুন, - নমস্কার।

নাট্যকার—দেখুন এই নাটকটা বিশেষ করে আপনার জন্যে লেখা। আপনি যদি—

(চাকর এসে সামনে দাঁড়ায়। হেনা আবার টেলিফোন করছে।)

চাকর—চলুন। (নাট্যকার দুঃখিত মনে কাগজপত্র ব্যাগে ভরে।)

নাট্যকার—(যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়) তোমার জন্যে কেবল তোমার জন্যে এই রকমটা হল। এমন জমাট করে নাটকটা সুরু হল—খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সটাকে নষ্ট না করলে ঘুম হচ্ছিলনা। আমি নাহয় না খেয়ে মরব। সেটাকে আমি ভয় করি না। কিন্তু কত বড় সম্ভাবনাকে তোমরা সুরুতেই নষ্ট করে দিলে, বুদ্ধি থাকলে ভেবে দেখো। (বেগে প্রস্থান)

চাকর—এই সব আজকালকার ছেলে।

হেনা—চলে গেল কিন্তু বেশ। এরকম একটা Exit পেলে—হ্যালো। প্রিন্স সুদর্শন আছেন—